জান্তব

ভদ্রেশ্বর মন্ডল

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

ইস্কুলের গণ্ডি পেরোতে-না-পেরোতে যাঁর উৎসাহ আর প্রেরণায়
গল্প লেখার ভূত মাথায় ঢুকেছিল কিশোর সাহিত্যের সেই
কিংবদন্তী লেখক-শিল্পী ময়ূখ চৌধুরী তথা প্রসাদ রায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

জা ন্ত ব

শুরুর আগে

শিকার ও বন্যজীবনের গল্প লেখা শুরু করেছিলাম যখন বয়েস বছর পনেরো। আসলে ওই বয়সে শিকার-কাহিনির টানটান রোমাঞ্চ সারা শরীর-মন জুড়ে রাজত্ব করত, কাহিনি শেষ করার পরও কল্পনার জগৎ জুড়ে থাকত আফ্রিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দক্ষিণ আমেরিকার ঘন জঙ্গল, ভারতবর্ষের বিচিত্র বন্যপ্রাণীর দল, আরও কত কি...তার প্রভাব ওই বয়সের লেখায় পড়েছে, সন্দেহ নেই। পরপর তিন-চারটি সংকলনে ওই লেখাগুলো প্রকাশিত হয়। এ সংকলনের প্রথম লেখা অবশ্য ছাপা হয়েছিল ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেদিনের ডাকসাইটে কিশোর-পত্রিকা 'কিশোর ভারতী'-র পাতায়। একটা সম্মান-দক্ষিণাও জুটেছিল বলে মনে পড়ে। সে আনন্দ ভোলবার নয়।

তখন দূরদর্শনের যুগ নয়। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, ডিসকভারি বা অ্যানিমেল প্ল্যানেটের প্রায় অলৌকিক ছবিগুলো আমাদের ভাগ্যে জোটেনি, কম্প্যুটার বা ইন্টারনেট তখন চাঁদে জমি কিনে বাড়ি করার মতোই দুঃসাধ্য কল্পনাবিলাস। রোমাঞ্চ, রহস্য, শিহরণ বলতে প্রায় সবটা জুড়েই বইপত্র আর একেবারেই কখনো সখনো দু-চারটে ইংরেজি ছবি *হাটারি*, অ্যাফ্রিকান সাফারি অথবা জনি ওয়েসমূলরের *টার্জান*।

কিশোর মনের সম্রাট তখন হেমেন্দ্রকুমার। তাঁর *যখের ধন* রক্তে দোলা লাগায়, রাতে ঘুম আসে না *পদ্মরাগ বুদ্ধ* অথবা *ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতেব* পাতায় আটকে থেকে। *চাঁদের পাহাড়, চিত্রগ্রীব* পড়ার বয়স পেরিয়ে এসেই বিজ্ঞান, পুরাণের নিজস্ব ব্যাখ্যা এবং পৃথিবী বিস্তারের যাবতীয় তথ্য নিয়ে এসে গেলেন ঘনাদা। এর মধ্যে *পাগলা দাশু, রাজকাহিনির* মতো কত মণিমাণিক্যে খচিত সিংহদরজা পেরিয়েছি তার হিসাব করা বড় কঠিন।

সেই বয়স পেরিয়ে এলাম প্রায় চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু শিকার কাহিনির রোমাঞ্চ থেকেই গেল।

আজ অরণ্য সংরক্ষণের প্রবল তাগিদ অনুভব করছি আমরা সবাই। অনেক কারণেই করছি তার মধ্যে বাঁচার তাগিদ সবচেয়ে বেশি সন্দেহ নেই। যন্ত্র-সভ্যতা পৃথিবীকে দূষিত করছে। আলো-বাতাসে বাড়ছে বিষের ধোঁয়া আর ধুলোর মাত্রা সাংঘাতিক পরিমাণে। বিশ্বের সব রাষ্ট্রনেতারা ছুটছেন বালিদ্বীপ থেকে কোপেনহেগেনে সমাধানের খোঁজে। উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বরফ গলছে অনর্গল, এই বিষক্রিয়ায়।

একটু জায়গার খোঁজে পালাতে পালাতে মেরুভালুকের দল মাত্র কয়েক বছরে অর্ধেক হয়ে গেছে। জলা-জঙ্গল, বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর জনহীন তুষারক্ষেত্র সবই দখল করেছে মানুষ।

বিলুপ্তির কারণ বিভিন্ন আর বিচিত্র। প্রথম কারণ অবশ্যই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এই নিয়মের নাম ক্রমবিকাশ। ক্রমবিকাশের পথে একটি প্রজাতি লুপ্ত হয়ে জায়গা করে দেয় আর এক প্রজাতির। জলবায়ুর পরিবর্তন, খাবারে টান পড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শিকার এবং শিকারি জীবজন্তুর মধ্যে সংখ্যার তারতম্য ঘটে যাওয়ার কারণে বিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন যে কমবেশি ১ কোটি বছরের মধ্যে একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদিও ব্যতিক্রম আছে বেশ কিছু সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, অন্য প্রজাতির ক্ষেত্রেও। জীববিজ্ঞানীদের হিসাবে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের প্রকাশ হওয়ার পর যত প্রজাতির জীবজন্তু এসেছে তার ৯৯ শতাংশই আজ বিলুপ্ত। তার মধ্যে হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই ঢালাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে বেশ কিছু জীবজন্তু। এই গণবিলুপ্তি বা Mass Extinction-এর বড় উদাহরণ ডাইনোসরদের উধাও হয়ে যাওয়া। কারণ ভয়ংকর উল্কাপাত। আধুনিক সময়কে (Holocene epoch) সেই গণবিলুপ্তির যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানীরা এবং তার প্রধান কারণ হল মানুষেরই 'অগ্রগতি'। সভ্যতার চলার পথে এ এক আশ্চর্য-সমস্যা, সংকটও বটে। একদিকে যে মানুষ জয় করেছে মহাকাশ, সমাধান করছে সৃষ্টিরহস্যের— অন্যদিকে তারই বাসভূমি ক্রমে পরিণত হচ্ছে কাঁটা ঝোপ ভরা পোড়ো জমিতে।

শিকারের অস্ত্র তৈরির উপর নির্ভর করেছে প্রাচীন মানুষের মগজের উন্নতি। কৃষি এসেছে তাঁর অনেক অনেক পরে। প্রাচীন প্রস্তর যুগে কুড়িয়ে পাওয়া ভারী পাথরকেই সে ব্যবহার করেছে শিকারকে ঘায়েল করতে, গাছের মোটা ডাল ভেঙে তৈরি হয়েছে লাঠি। সেই লাঠির মাথায় পশুর চামড়া দিয়ে ভারী পাথর বেঁধে তৈরি করেছে মুগুরের মতো কুড়ুল। নবপ্রস্তরে সে পাথরকে শানিত করেছে ফলা খসিয়ে এনে, তৈরি করেছে ভালো জাতের কুড়ুল, ছুরি, শত্রুকে ঘায়েল করার তীক্ষ্ণ ফলার মারণাস্ত্র, শিকারের মাংস কাটার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি।

সুইজারল্যান্ডের আল্পস্ পর্বতের উপর প্রায় চার হাজার ফুট উপরে এক গুহা খুঁজে পেলেন জার্মান নৃতাত্ত্বিকের দল। নেআনডার্থাল মানুষের বাস ছিল সে গুহায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। পাথরের সিন্দুকে তারা জমিয়ে রেখেছে গুহাভালুকের খুলি, বেশ কয়েকটা। ১৯২৩ সালের এই আবিষ্কার এবং পরপর অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের গুহা-কন্দর খুঁজে বিজ্ঞানীরা যেসব হাড়গুলো পেলেন তার ভিত্তিতে আমরা শুনেছি প্রাচীন মানুষের সেই রোমহর্ষক শিকার কাহিনি।

ভয়ংকর সেই গুহাভালুক আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত। লেজের শেষ প্রান্ত থেকে নাকের ডগা অবধি সে ভালুকের মাপ ছিল প্রায় সাড়ে ছ'ফুট, নিখুঁত মাপ ২ মিটার ৭৫ সেমি। পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠলে সেই আদিম ঋক্ষরাজের উচ্চতা হতো আড়াই মিটার, ওজন প্রায় ৬৮০ কিলোগ্রাম।

অতিকায় ওই গুহাভালুককে সরাসরি আক্রমণ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নেআনডার্থাল মানুষ এ সোজা কথা তার পুরোনো অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝেছিল। গুহাভালুকের ভয়ংকর থাবার একটিমাত্র আঘাতেই তাদের গোষ্ঠীর দুর্ধর্ষ যোদ্ধার মৃত্যু ঘটতে দেখেছে তারা তৎক্ষণাৎ; মৃতদেহের সব হাড়গুলো ভেঙে গেছে পাটকাঠির মতো, ধড় থেকে মুণ্ডু ছিটকে পড়েছে ওই একটি চাপড়ে। সুতরাং, আগে থেকে দলের লোকেরা সতর্ক চোখে লক্ষ্য রেখেছে ভালুকের বাসার উপর। সব গুহায় ভালুক থাকে না। পায়ের ছাপ যেখানে গুহার ভিতরে মিলিয়ে গেছে, সেই সব গুহা বেছে নিয়ে প্রথমে বাইরে থেকে জ্বলন্ত গাছের ডাল বা পাথরের টুকরো ছুড়ে মেরেছে সে। হঠাৎ কোনো গুহার ভেতর থেকে বিরক্তির গর্জন ভেসে আসতে শুনে সে নিশ্চিত হয়েছে বাড়ির মালিক সম্পর্কে।

তবে, সব গুহার মালিক তার পছন্দের শিকার নয়। বাদ দিতে হয়েছে সিংহ, হায়না বা বাঘদের। ওদের গতি বড় বেশি, আক্রমণ সামলানো যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন পিছনে তাড়া করে ধরা। আবার ছোট বাচ্চা নিয়ে মেয়ে ভালুকের খোঁজ পেলেও তারা ঘাঁটাতে চায়নি। এখানে বোধকরি 'মনুষ্যত্ব' বাধা দিয়েছে। শেষমেষ পাওয়া গেছে একক পুরুষ ভালুকের খোঁজ। গুহাটাকে ভালো মতো চিনে নিয়ে নেমে গেছে তারা দলকে খোঁজ দিতে।

প্রাচীন পৃথিবীর দুর্গম শীত আর তুষার ঢাকা গিরিপথ বেয়ে এরপর দুপুর নাগাদ সার বেঁধে উঠে এসেছে শক্তিশালী যোদ্ধার দল। সঙ্গে এনেছে ছাই দিয়ে চাপা আগুন আর গাছের ডালের শক্ত বল্লম। ভারী পাথর সংগ্রহ করে ঠিক গুহার মাথার উপর গুঁড়ি মেরে বসেছে জনাকয়েক শিকারি, বাকি দলটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গুহার মুখটাকে ঘিরে জায়গা নিয়েছে গাছপালা বা ছোট পাথরের আড়ালে।

প্রথমে গাছের ডাল ভেঙে ছাই-এর তলার আগুন খুঁচিয়ে সেই জ্বলন্ত ডাল গুহার ভিতরে ছোঁড়া শুরু হল। প্রথমে আগুনের ছ্যাঁকা, তারপর কাঁচা ডালের ধোঁয়া। কিছুক্ষণ রাগী গর্জনে প্রতিবাদ জানাবার পর গুহার বাইরে বেরিয়ে এল গুহাভালুক। সঙ্গে-সঙ্গে তার মাথায় পড়ল ভারী পাথরের চাঁই। চারদিক থেকে ছুটে আসতে লাগল বর্শা। শীতের ঘুম, খানিকটা অনশন ভালুককে কিছুটা দুর্বল করেছিল ঠিকই, তার উপর গুহার অন্ধকার থেকে হঠাৎ বাইরের আলো তার চোখকেও ধাঁধিয়ে দিয়ে থাকবে, আর মাথায় পাথরের বর্শায় সে মাটিতে পড়ে গেল। এবার সতর্ক পায়ে আড়াল ছেড়ে বর্শা হাতে এগিয়ে এল শিকারির দল। আর সেটাই হল মারাত্মক ভুল। আর একটু ধৈর্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওদিকে তুষারের বুকে লাল আবির ছড়িয়ে সূর্য পাটে বসেছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই শিকার নিয়ে ফিরে যেতে হবে আস্তানায়। রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর বিপজ্জনক হয়ে উঠবে পর্বতের প্রতিটি পাথর আর গিরিখাত। সেই কারণেই অধীর হয়ে উঠেছিল শিকারিরা। আর সেখানেই ভুল হল।

মুহূর্তে দু-পায়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল সাক্ষাৎ মৃত্যু! লোহার কাঁটাওয়ালা

মুগুরের মতো বিদ্যুদ্বেগে চলল দুটো বিশাল থাবা। দেশলাই কাঠির মতো ভাঙতে লাগল শিকারিদের বল্লমগুলো। দুটি তরুণ যোদ্ধা একটু বেশি সাহসে কাছে গিয়ে পড়েছিল। একজন ছিটকে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে অতলস্পর্শী খাদে, অন্যজনের হাত আর কাঁধ ভেঙে গেল একটি মারণ চপেটাঘাতে। থাবা আর দাঁতের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে চটপট পিছিয়ে গেল শিকারির দল। সঙ্গীদের হতাহত দেহের দিকে এই মুহূর্তে নজর দেওয়ার সময় নেই—পিছনে সূর্য ডুবছে, গোধূলির সোনা রং ছড়াচ্ছে আল্পসের পাহাড়, ঝর্ণা, গিরিখাত আর তুষারের গায়ে। এরপরই নেমে আসবে অন্ধকারের হালকা নীল, ক্রমে গাঢ় নীল ওড়না। চাঁদ উঠে পড়বে আকাশে। কিন্তু ওই চাঁদের স্বপ্ন দেখা রূপো গলা জোছনা আর হাতের মশালের আগুনে ভর করে অন্ধকারের মতো সর্বগ্রাসী দানবের সঙ্গে লড়াই চালানোর চেয়ে এই ভয়ংকর গুহাভালুকের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শতগুণে সোজা। প্রথম রাউন্ডে জিতেছে শিকারির দল, দ্বিতীয় রাউন্ডে ভালুক, তৃতীয় রাউন্ড ক্রমেই চলে যাবে ভালুকের পক্ষে। কারণ ওই রাত নেমে আসা। রাতে শ্বাপদ ভয়ংকর, মানুষ শঙ্কিত। কিন্তু এবার কপাল ভালো মানুষের, লড়াই বেশিদূর এগোল না। অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেও জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে একেবারে ভাল্লুকের মৃত্যু আলিঙ্গনের আওতায় ঢুকে পড়ে যে যোদ্ধাটি বর্শা চালাল, এবার সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। দানবের কণ্ঠনালি ভেদ করে ঢুকে গেল তার বল্লম। সাড়ে আট ফুট উঁচু বিশাল শরীর ছিটকে পড়ল শিলাতলে। লড়াই শেষ।

ভালুকের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটে এরপর গোটা দলটা ফিরেছে আস্তানায়। নিহত সঙ্গীদের কবর দিয়েছে এসেছে তুষারের তলায়, সঙ্গে দিয়েছে দুটো ফুল, হয়তো বা একটা বর্শার ফলা। নৃতাত্ত্বিক চুপ করলেন। খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সুদূর অতীতের ওপার থেকে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক আদিম জনজাতির নিত্যদিনের জীবনযাত্রা। এক বিচিত্র রূপকথা।

এইভাবেই সেদিনের মানুষ শিকার করেছে ম্যামথ হাতি, বাইসন আর ষাঁড়। কিন্তু মানুষ তো শুধু শিকার করেই ক্ষান্ত হয় না। সে বেঁচে থাকে তার বিচিত্র সৃষ্টিবৈচিত্র্যে। তাই বোধহয় ক্রোমানীয় মানুষ স্পেনের আলতামিরা থেকে ফ্রান্সের পেরিগরের গুহায় বিপুল উদ্যমে এঁকে রেখে গেছে অতিকায় বাইসন, ঘোড়া, শুয়োর অথবা নেকড়ের ছবি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার নিদর্শন। সিসটাইন চ্যাপেলের ছাতের ফ্রেসকো আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে বটে, কিন্তু লাসকো গুহাচিত্রে এবড়ো-খেবড়ো গুহার ছাতকে ছবি আঁকার কাজে লাগিয়েছেন মাইকেলএঞ্জেলোর যে সুদূর পূর্বপুরুষ, তাঁর শিল্পচিন্তা বিজ্ঞানীদের আরও অনেক বেশি বিস্মিত করেছে। ছাতের উঁচু-নীচু অসমতলকে কাজে লাগিয়ে সেই মহান শিল্পী যে ছবি এঁকেছেন, সেটি হয়ে উঠেছে ত্রি-মাত্রিক। জন্তুর শিং-গুলো উঠে এসেছে, পাঁজর বা নিতম্বের গোল আকৃতি পাথরের স্বাভাবিক আকারকে আশ্রয় করে ত্রি-মাত্রিক রূপ পেয়েছে। শিকারের পাশাপাশি এই সযত্ন ভালোবাসাই মানুষের

সভ্যতার ইতিহাস জুড়ে ছড়িয়ে আসে, ছড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসে—আধুনিক পৃথিবীর অরণ্যপ্রেমিক শিকারি তার কোনো ব্যতিক্রম নন।

পৃথিবী জুড়ে অহল্যা অরণ্যে মানুষের পায়ের ছাপ পড়তে শুরু করেছে আদিকাল থেকে, কিন্তু অসীম ক্ষিদেয় গোটা জঙ্গল গিলে খাবার পালা শুরু হয়েছে মাত্র শ'দুয়েক বছরের কাছাকাছি। লাঙ্গল, কুড়ুল আর বাসভূমির চাপে জঙ্গল ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর জঙ্গলের অধিবাসী বণ্যপ্রাণ প্রথমে উদ্বাস্তু, পরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষের সঙ্গে তাদের অসম লড়াই-এ। রুদ্রপ্রয়াগ, কুমায়ূণ এর পাহাড়ি জঙ্গল, রাজপুতানার করদ রাজ্য, পূর্ণিয়ায় নীলকর সাহেবের কুঠি থেকে সুদূর মোম্বাসায় রেলপথ বসাবার সময়ও বারবার এই সংঘাত আমরা দেখেছি। জয় সবসময় মানুষের হয়েছে এমন নয়। দাঁত-নখ-শিং জিতেছে বহুবার। তবু বিজ্ঞানীরা জোর দিয়েই অভিযোগের আঙুল তুলছেন—প্রায় দশ হাজার বছর আগে তুষারযুগের পর যে হলোসিন অধিযুগ (Holocene epoch) শুরু হয়েছে তার একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবী জুড়ে যে বিরাট সংখ্যায় জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ আর গাছপালার বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে তার জন্য দায়ী মানুষ, আর কেউ নয়। মানুষের হাতে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ—জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি, গত তিনশো বছরে যন্ত্র সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর অবশ্যই মানুষের লোভ। এর ফলে চিড় ধরেছে মহাকাশের ওজোনের (O_3) স্তরে, পৃথিবীর প্রায় ১৪ মাইল উপরের ওজোন স্তরের রক্ষাপাঁচিল ভেঙে ঢুকছে সূর্যের আগুনে দৃষ্টি। কুমেরুবৃত্ত বা দক্ষিণ মেরুর উপরে এই ওজোন স্তর আস্তে আস্তে হালকা হয়ে আসছে সেই ১৯১০ সাল থেকে। ফলে বাড়ছে গরম, গলছে বরফ, উঠে আসছে সমুদ্রের জলস্তর। ওজোন স্তরের এই বড় ক্ষতি করছে নাকি ক্লোরোফ্লুরোকার্বন গ্যাস। পৃথিবীর যত কারখানা থেকে এখন তাই বিদায় করা হচ্ছে এইসব দূষিত গ্যাস আর তার উপাদান। কিন্তু সে আর কতটুকু। শেষপর্যন্ত পৃথিবী ধ্বংসের মূল কারণ যে 'কার্বন', তাকে জব্দ করার ফন্দিটাই খুঁজে বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই কালকূটকে কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে একমাত্র নীলকণ্ঠ অরণ্যভূমি। একটি মাত্র গাছ তৈরি করে পাঁচজন মানুষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, ত্রিশটি গাছ শুষে নেয় আমাদের এক-একজনের সারা বছরের কার্বনের বিষভাণ্ড। তাই দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অরণ্য সম্পদ আমাদের বাঁচাতে হবে, বাড়াতে হবে।

ভারতবর্ষে ১৯১২ সালে পাশ হয়েছে শিকার নিষিদ্ধ করার আইন। শুধুমাত্র শিকারের আনন্দের জন্য অথবা শৌখিন মানুষের ড্রয়িংরুমের শোভা বাড়াতে শিকার করা আজ বেআইনি শুধু নয়, জেল-জরিমানাসহ বড়সড় দণ্ড পাওয়ার অপরাধ। কেবল নরখাদক পশু অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত জন্তু বা নির্দিষ্ট কোনো গবেষণা কাজের জন্য বন্দুকের ব্যবহার চলতে পারে, ধরা যেতে পারে পশু পাখিদের। কিন্তু তারও অনুমতি দেবেন চিফ ওয়ার্ডেন। তবু কি বন্ধ

হয়েছে চোরাশিকারিদের উৎপাত? না, হয়নি। কিন্তু খানিকটা যে থমকে দাঁড়িয়েছে, এটাও সত্যি। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর বহু দেশেই এখনও শিকার নিষিদ্ধ হয়নি।

একদিকে অরণ্য. অন্যদিকে বণ্যপ্রাণ—রক্ষা করতে হবে দুটিকেই। মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য নয়, বোধহয় নিজের বাঁচার তাগিদেই। আজ অন্তত তাই বোধ হয়। আড়াই হাজার বছর আগে হিন্দু বা বৌদ্ধ-জৈন লিপিতে যা উৎকীর্ণ ছিল তার বীজ ছিল উপলব্ধিতে, দর্শনে। আজ সেই উপলব্ধি ক্রমে আত্মরক্ষার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সংকলনের কাহিনিগুলো লেখার সময় এতসব তথ্য মাথায় ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

কিশোর বয়সে চিতা, লেপার্ড, জাগুয়ার বা প্যান্থারের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ খুঁজে পেতাম না। সবই যেন ফোঁটাকাটা বাঘ, চলতি কথায় গুলে বাঘ। ইংরেজ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এমনই এক গুলে বাঘ শিকার করেছিলেন হাতির পিঠে চড়ে। জায়গাটা ছিল বোধহয় আজকের কলকাতার রবীন্দ্র-সদনের পাশেই। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্টের পছন্দের শিকার ছিল আফ্রিকার অতিকায় হাতি। এই আফ্রিকা আর ভারতের হাতির মধ্যেও বিশেষ তফাত বুঝতাম না। আজকের ছেলেমেয়েরা এই ফারাক অনেকটাই জানে। তবু আমার সেই ছোটবেলার (বোধ হয় এখনো!) কথা ভেবেই সংকলনের পনেরোটি কাহিনির নায়ক নায়িকা প্রায় আঠারোটি জীবজন্তু সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সুযোগ পেলেই গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এমনটা বোধ হতে পারে।

যেমন ইন্দোনেশিয়ার ছোট সুন্দা দ্বীপপুঞ্জের লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে যে দানব গোসাপের দল বাস করে এসেছে, আশ্চর্যের বিষয় হল, মাত্র একশো বছর আগেও সাধারণ মানুষ তার খবর জানত না। ওইটুকু দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা মাত্র দ্বীপ—কোমোডো, গিলা মোতাঙ, রিংকা বা ফ্লোরস্ হল এই দানব সরীসৃপের আস্তানা। সংখ্যায় নেহাত কম নয়—প্রায় চার-পাঁচ হাজার অতিকায় গোসাপের দল, যাদের এক-একজন লম্বায় প্রায় দশ ফুট করে, ওজন দেড়শো কিলোগ্রামের মতো, তাদের চোখে না পড়লে অবাক হওয়ারই কথা। স্বভাব চরিত্রেও নেহাত লাজুক নয় এই কোমোডো ড্রাগনের দল, বরং ভয়ংকর হিংস্র। হরিণ, শুয়োর, ছোট গোসাপ, বনের মোষ এমনকী মানুষও তাদের খাদ্য তালিকায় আছে। বাঘের মতো চার পায়ের থাবা, প্রচণ্ড শক্তিশালী লেজ আর কুমিরের মতো জাঁতাকলের কামড় এই ড্রাগনের অস্ত্র। আক্রমণের সময় এই দৈত্যাকার গিরগিটি ঘণ্টায় প্রায় ১৮ থেকে ২০ কিমি বেগে দৌড়তে পারে। আর কোমোডো ড্রাগনের কামড় ছাড়িয়ে পালালেও রক্ষা নেই, মারাত্মক বিষাক্ত জীবাণুর আক্রমণে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হবে শিকারের।

এই সংকলন জীববিজ্ঞানীর ডায়েরি নয়। তাই অনধিকার চর্চায় আর না এগোনোই ভালো।

এই সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে প্রসাদ রায়ের অনবদ্য ছবি। তিনি প্রয়াত হওয়ার পর এই ধারার ইলাস্ট্রেশন বাংলা প্রকাশনায় প্রায়-বিলুপ্তির পথে। তাঁর ছবির নাটকীয়তা ও গতি, কাহিনি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকাকে আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের 'কিশোর ভারতী' খুঁজে এই ছবির অনেকগুলো বের করেছেন যিনি, পত্র ভারতীর কর্ণধার এবং 'অলৌকিক' লেখনীর মালিক সেই ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর এই বিশেষ নজর আজ সর্বজনবিদিত। এই সংকলন যদি পাঠকের ভালোলাগে, তা হলে ভবিষ্যতে বন্ধুবর ত্রিদিবকুমারের প্রশ্রয়ে আর একটু সাহসী হওয়া যেতে পারে।

খুনির বয়স তিন

আপাতত যে খুনিটির কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি তার বয়স হল তিন বছর। ওই তিনবছর বয়সে সে মোটমাট স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে তেষট্টি জন মানুষকে খুন করেছিল আর মালয়দেশের বিস্তীর্ণ রবারক্ষেত জুড়ে সৃষ্টি করেছিল ত্রাসের রাজত্ব। গোটা অঞ্চলে ওই তিনবছরের শিশু হয়ে উঠেছিল একক বিভীষিকা।

কিন্তু বৃত্তান্ত শোনার আগে প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে জাগে তা হল, 'আর পাঁচজন শিশুর মতো ছোটখাটো দুষ্টুমি করার বদলে মাত্র তিন বছর বয়সেই সে কেন হয়ে উঠল একেবারে পাকা খুনি?'

সুতরাং গোড়াতে সেই উত্তরটা একবার খোঁজার চেষ্টা করা যাক—

ভদ্রলোকের পয়সা ছিল বিস্তর ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি ছিল কি? থাকলেও নিশ্চয়ই দুর্বুদ্ধি। নইলে কেউ কখনো ছেলের আবদার মেটাতে বাঘ কেনে? আর যদি বা কেনে তাহলে এমন অসতর্ক কি হয়, যার মাশুল গুনতে নয় নয় করে বলি হতে হয় তেষট্টিটা তাজা মানুষকে? ঘটনাটা ঘটেছিল এইরকম—

"এই অঞ্চলেরই এক 'সুলতান' তাঁর ছেলের বায়নাক্কা সামলাতে আর কিছুটা নিজেকে জাহির করার জন্যও বটে, একটি বাঘের বাচ্চা কিনে ফেলেন। তাঁর হয়তো স্থির ধারণা ছিল যে বাঘটি তাঁর মতো একজন পুরুষসিংহের আশেপাশে ক'দিন ঘুরলেই ক্রমে ক্রমে নেহাতই একটা পুষি বেড়ালে পরিণত হবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় বাঘের বাচ্চাটার সেরকম কোনো নিরীহ ধারণা ছিল না। ফলে শান্তশিষ্ট হয়ে দুধ-ভাত খাবার বদলে সে একদিন সুযোগ-সুবিধা বুঝে তার প্রভুপুত্রকেই খানিক আদর-আপ্যায়ন করে শেষে চম্পট দেয়।

বাঘের আদর বলে কথা। সে আদরের ধাক্কা সামলানো সহজ নয়। ছেলেটি অবশ্য তার বাপের পয়সা আর নিজের রক্তের জোরে শেষপর্যন্ত সামলে উঠল, কিন্তু শখের জন্তুটার এমন বেয়াদবিতে সুলতান গেলেন ভীষণরকম চটে। কয়েকজন স্থানীয় শিকারিকে তিনি নিযুক্ত করলেন বাঘটাকে মারার জন্য। কিন্তু বাঘ-শিকারি সবাই হয় না। ওই শিকারিদেরই একজন তাই বাঘটার নাগাল পেয়ে যে গুলি ছোঁড়ে সেটা জন্তুটার কাঁধ ছুঁয়ে চলে যায়। বাঘ আহত অবস্থায় পালায়।

আহত বাঘের মতো সাংঘাতিক প্রাণী আর নেই। এই ঘটনার পরেই মালয়ের রবারক্ষেতে মূর্তিমান শয়তানের মতো হানা দিতে শুরু করে আহত জন্তুটা। তখন তার বয়স মাত্র তিন বছর!

মানুষের সংস্পর্শে বেশ কিছু সময় কাটাবার জন্যই হোক কি নিজের বন্য অনুভূতির জোরেই হোক, বাঘটা কিন্তু মানুষের গতিবিধি সম্বন্ধে প্রায় সবকিছুই জানে। মোটামুটি এই ভাবেই সে এখনো এই অঞ্চলে একটানা হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।"—এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে থামল জ্যাক ক্রডেন।

টেবিলের অপর প্রান্তে বসে যে মানুষটি এতক্ষণ একমনে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল, তাঁর নাম উইলসন মেনার্ড। শিকারই তাঁর পেশা, নেশাও বটে। ক্রডেনের কথা শেষ হতে মেনার্ড তার পাশে রাখা রাইফেলটায় একবার হাত বুলিয়ে নিল। তারপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করল—'বাঘটা পুরুষ না স্ত্রী, সে বিষয়ে কিছু জানেন?'

—'পুরুষ।'

হয়তো আরো কিছু প্রশ্ন ছিল মেনার্ডের, কিন্তু করা হয়ে উঠল না।

তাঁবুর পরদা সরিয়ে ক্রুডেনের কাফ্রী অনুচরটি ঢুকে খবর দিল— 'আয়োজন সম্পূর্ণ; এখন হুজুররা মর্জি করলেই বেরোতে পারেন।' দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারি নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিজের নিজের বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল। গন্তব্যস্থল 'কামপঙ' গ্রাম।

পরের ঘটনা বরং মেনার্ডের মুখেই শোনা যাক—

"কেলান গ্রাম থেকে রওনা হবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা কামপঙে এসে পৌঁছুই। এই গ্রামটিতেই বাঘ তার শেষ শিকার মেরেছে। গ্রামটা মালয়ের আর পাঁচটা প্রতিবেশী গ্রামগুলোর মতোই। সরু একটা নদী গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, অন্য দিকে গ্রামের সীমানা পার হলেই ঘাসঝোপে ভরা রবারবনের শুরু।

গ্রামে ঢোকার আগে থেকেই কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছিল। আমরা আসার মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগেই বাঘটা এখানে একজন স্ত্রীলোককে মেরেছে। সমস্ত গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া, সেই সঙ্গে গ্রামবাসীদের চোখেমুখে চাপা আতঙ্কের ছাপও স্পষ্ট। আমরা গিয়ে পৌঁছতেই সবাই এসে ঘিরে ধরল। মোড়লের মুখে শুনলাম স্ত্রীলোকটি যখন কাপড় কাচতে নদীর ঘাটে এসেছিল, বাঘ তখনই তাকে মারে।

সময় নষ্ট না করে আমি আর ক্রুডেন দুজনেই একমত হয়ে ঠিক করলাম যে এখুনি হত্যাকাণ্ডের জায়গাটা একবার দেখে আসা দরকার।

গ্রামের কয়েকজন যুবক আর ওই অঞ্চলেরই এক অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে নদীর দিকে এগোলাম। গ্রামের লোকজনের কথামতো পাড় ধরে ফার্লং-টাক এগিয়ে চোখে পড়ল স্ত্রীলোকটির দেহাবশেষ। কাছাকাছি মাটির উপর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বাঘের পায়ের ছাপ। মড়ি আর পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে কয়েকটা খবর জোগাড় করা গেল—

প্রথমত, সামনের ডান পায়ের থাবার ছাপটা যেরকম অস্পষ্ট, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সেটা অন্য পায়ের তুলনায় কমজোরি, সম্ভবত কোনোরকম আঘাত পাওয়ার জন্যই। 'মড়ি' পরীক্ষা করে বুঝলাম বাঘটার একটা কষের দাঁত ভাঙা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল তার আকার—সামনের পায়ের সঙ্গে পিছনের পায়ের ছাপের ব্যবধানটুকু মেপে যা বুঝলাম, তাতে বাঘটা অন্তত সাড়ে আট থেকে

ন'ফুটের মাপে তো হবেই। প্রকাণ্ড বাঘ। পছন্দ বটে সুলতানের।

জায়গাটার চারপাশে অনেকগুলো ছোট-বড় রবার গাছ ঘিরে রয়েছে। তার মধ্যে মজবুত দেখে গাছ বেছে নিয়ে মাচা বাঁধবার ব্যবস্থা করতে বললাম। গ্রামে ফিরে 'টোপ'-এর জন্য একটা ছাগলও জোগাড় হয়ে গেল।

দুপুরের মধ্যে বাকি আয়োজনটুকু সেরে ফেলে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যখন আবার নদীর পাড়ে গিয়ে দুজনে উপস্থিত হলাম সন্ধ্যা হতে তখনও কিছু দেরি আছে। আমি সঙ্গে নিয়েছি পয়েন্ট ফোর জিরো ফোরের রাইফেল, ক্রুডেনরটা সম্ভবত পয়েন্ট ফাইভ জিরো জিরো। দুটোই ভারী বন্দুক। আলাদা করে আলো নেবার দরকার হয়নি, দুটো বন্দুকেই আঁটা আছে একটা করে জোরালো টর্চ। ছাগলটাকে গাছে বেঁধে দুজনে মাচায় গিয়ে উঠলাম।

অন্ধকার নামছে ঘন হয়ে। আরও ঘন মনে হচ্ছে কারণ আকাশে চাঁদ ওঠেনি। আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে নদীর পাড়, দূরের গাছগুলো, নীচের ঘাসঝোপ। আর সেইসঙ্গে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে রাতের অরণ্যের ভাষা। নাম-না-জানা রাত-জাগা পাখিরা অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে; শুকনো পাতা খসে পড়ার শব্দে চমকে উঠি—ওই বুঝি বাঘ এল! চোখ যেখানে বিকল, কান সেখানে বড় বেশি খোলা রাখতে হয়, সমস্ত মন যেন গিয়ে জড়ো হয়েছে কানে। সময় আর কাটে না।

বেশিক্ষণ চুপচাপ এইভাবে বসে থাকলে একটা ঘোরের মতো এসে যায়। কতক্ষণ সেভাবে কেটেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা কর্কশ চিৎকারে চমকে উঠলাম। ছাগলটা ডাকছে!

পলকে তন্দ্রা উধাও, সমস্ত শরীর টানটান। ক্রুডেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেও উঠে বসেছে; রাইফেলের 'সেফটি ক্যাচ'-এ চেপে বসেছে বুড়ো আঙুল। আশ্চর্যের কিছু নেই, জঙ্গলের যাদের অন্তত কিছুদিনের চেনা পরিচয় তারা এই ইঙ্গিতগুলো জানে, বোঝে। জঙ্গল কখনো মানুষকে ফাঁকি দেয় না, তার ভাষায় সে একবার হলেও সাবধান করে দেয়। তাই জঙ্গলে চলাফেলা করতে হলে এই ভাষা শেখা বড় প্রয়োজন।

তারস্বরে ডেকে চলেছে ছাগলটা, দড়ি ছেঁড়বার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, আর আমরা দুজনে প্রায় নিশ্বাস চেপে সেই অন্ধকারের মধ্যে যতদূর সাধ্য চোখদুটোকে মেলে ধরবার চেষ্টা করছি ঘাসঝোপ আর রবার গাছগুলোর আশেপাশে। সময় কাটছে, যেন প্রতি পল এক-একটা যুগ।

তবু সেই ভাবেই সময় কেটে গেল। ঘাসঝোপগুলো চোখের সামনে ঝাপসা থেকে একটু ফিকে-স্পষ্ট হয়ে আসতে মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশে তখন ধূসর-শ্লেটের রং ধরেছে। একটু পরেই পুব আকাশে রং-এর ছোঁয়া লাগল।

মাচা থেকে নেমে এসে ছাগলটাকে খুলে নিলাম। তারপর আশেপাশে একটু চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়েই অবাক হলাম বেশি। কাল রাতে বাঘ এসেছিল। আর শুধু এসেছিল বললে ভুল হবে, আমাদের গাছটাকে বেড় দিয়ে, ছাগলটাকে বেশ ভালো করে দেখেশুনে সে চলে গেছে, অথচ ছোঁয়ার চেষ্টাও করেনি। তখনই বুঝলাম, এ বাঘ ভোগাবে।

ভোগালোও বটে—একদিন নয়, দুদিন নয়, পরপর পাঁচ দিন গাছের নীচে 'টোপ' বেঁধে মাচায় বসে আমরা বন্দুক হাতে সারারাত দু-চোখের পাতা টানটান করে অপেক্ষা করেছি, আর রাত শেষ হলে যথারীতি গাছ থেকে নেমে ছাগলটাকে খুলে নিয়ে ক্লান্ত শরীর কোনোরকমে

টানতে টানতে গ্রামের কুটীরে ফিরেছি। বাঘ ভুলেও আর আসেনি, অথচ যেন আশেপাশে থেকেই মজা দেখেছে। সেইরকমই অন্তত মনে হয়েছে আমাদের।

শেষে ছ'দিনের দিন মরিয়া হয়েই মতলব ভেঁজেছি আমি আর ক্রডেন মিলে। সাঙঘাতিক মতলব! শিকারের নিয়ম না মেনে, প্রায় আত্মহত্যার ঝুঁকিই একরকম নিতে হয়েছে আমাদের। মনে শুধু এইটুকু ভেবে সাহস এনেছি যে, যে বাঘ নিজে নিয়মকানুন মেনে চলে না, তাকে মারতে গেলে অত ব্যাকরণের ধার ধারলে চলবে না। একটু বেপরোয়া হতেই হবে। তাই ছাগলের টোপে যখন বাঘ আসছে না, তখন ঠিক করেছি আমরাই টোপ হব পালা করে।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার—মনে রাখতে হবে যে শিকারের যত ক'টা চালু নিয়ম আছে তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে বিপজ্জনক হল মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকার করা। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বিপদ তার চেয়ে ঢের বেশি, কারণ জমিতে দাঁড়িয়ে বা জানোয়ারের পিছনে ধাওয়া করে শিকারি সাধারণত শিকার করে দিনের বেলায়, আমাদের বেলায় সেটা অন্ধকার রাত। দু-নম্বর কারণ, বাঘটা একটা অসাধারণ ধূর্ত মানুষখেকো, আর সবচেয়ে বড় কথা, যে লোকটা মাটিতে ঘুরে বেড়াবে তাঁর কাছে কোনো অস্ত্র থাকবে না, থাকবে মাচার উপর বসে যে তাঁকে পাহারা দেবে তাঁর কাছে, কারণ বন্দুক হাতে থাকলে বাঘটা যে আর ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না, এ ব্যাপারে আমরা তখন নিশ্চিত।

'টস'-এ হেরে আমি প্রথম মানুষ-টোপ হিসাবে নির্বাচিত হলাম। বন্দুক আর টর্চ সম্বন্ধে বন্ধু ক্রডেনকে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হতে বলে গাছ বেয়ে নীচে নেমে গেলাম। পেশাদার শিকারির জীবন বেছে নেওয়ার পর অনেকবার বিপদের মুখোমুখি হয়েছি আমি, মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি বহুবার, কিন্তু জীবনে এত ভয় আমি কোনোদিন পাইনি। এ ভয়, অসহায় মানুষের ভয়। জানি, মাচার উপর থেকে পলকহীন সতর্ক চোখে চেয়ে আমায় পাহারা দিচ্ছে ক্রডেন; এও জানি যে তার চোখের পাহারা আর বন্দুকের নিশানা এড়িয়ে আমার কাছে এগোতে পারবে না কোনো জন্তুই, কিন্তু তবু মাটিতে পা দেওয়ার সাথে সাথে বড্ড অসহায় বোধ করছি নিজেকে—কারণ, আমি জানি বাঘ

বলতে কি বোঝায়।

ঝাপসা অন্ধকারের মধ্যে নদীর ধার দিয়ে পায়চারি করতে করতে এই কথাগুলোই মনে আসছিল বারবার। মিনিটে-মিনিটে ঘড়ি দেখছি, একঘণ্টা সময় যেন আর কাটতেই চায় না।

একসময় অবশ্য কাটল—পালা শেষ করে উঠে এলাম মাচার উপরে। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, কি স্বস্তি যে পেলাম তা বলে বোঝানো যাবে না। ক্রুডেন ভাবলেশহীন মুখে গাছ বেয়ে ততক্ষণে নীচে নেমে গেছে—এবার ওর পালা। টর্চ আর বন্দুক পরীক্ষা করে নিয়ে আমিও পাহারায় বসলাম সতর্ক হয়ে। ক্রমে পরের ঘণ্টাটাও কেটে গেল একসময়—ক্রুডেন উঠে এল গাছে, কিন্তু কোথায় বাঘ? একটা বন-বেড়ালের লেজও চোখে পড়ল না।

একে ওই দু-আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড মানসিক চাপ, তার উপর হতাশা। ভোরের অপেক্ষা করতে করতে দু-চোখ আমার কখন ঘুমে জড়িয়ে এসেছে বুঝতেও পারিনি। বুঝলাম পাঁজরে ক্রুডেনের কনুই-এর গুঁতো খেয়ে—'দেখ, দেখ, ওই দেখ!'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম উধাও। রাইফেল হাতে নিয়ে ক্রুডেনের আঙুল বরাবর তাকিয়ে কিন্তু প্রথমে কিছুই নজরে এল না। বোধহয় ঘুম-চোখ বলেই। একটু সয়ে যেতে অবশ্য চোখে পড়ল—না, বাঘ নয়; একটি মেয়ে, একটি মালয়ী তরুণী।

এই দৃশ্য দেখব ভাবিনি। মানুষখেকোর ভয়ে যেখানে দিনমানে লোকে একলা পথ চলে না, সন্ধের আগে দরজা-কপাট পড়ে যায়, গ্রাম খাঁ-খাঁ করে, সেখানে শেষরাতে একা একটি মেয়ে চলেছে বনের পথ দিয়ে? বুঝলাম, নিতান্ত কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই পথে বেরোতে হয়েছে তাঁকে।

মেয়েটি আসছে আমাদের গাছের দিকেই—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার তাড়ায় কোনোদিকে নজর নেই তাঁর। বোধহয় 'কামপঙ' গ্রামেরই বাসিন্দা।

প্রায় গজ পঁচিশের মধ্যে সে এসে পড়েছে আমাদের গাছটার, এমন সময়ে তাঁর পিছনে খানিকটা দূরের ঘাসঝোপ হঠাৎ নড়ে উঠল। তারপর ঝোপের উপরে জেগে উঠল প্রকাণ্ড একটা গোল মাথা—

বাঘ! মালয়ের নরখাদক শিকারের পিছু নিয়েছে।

নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল মেয়েটাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, ক্রডেনের হাতের চাপে কোনোরকমে সেটা সামলানো গেল। শিকারি জীবনের একটা মস্ত বড় ভুল করে বসতে যাচ্ছিলাম, হয়তো যার জন্য সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করে কাটাতে হত।

মেয়েটি ততক্ষণে আমাদের গাছের প্রায় দশ-পনেরো গজের মধ্যে এসে গেছে; হঠাৎ তাঁর অনুভূতি যেন বিপদ সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করে দিল। মেয়েটি পিছনে ঘুরে তাকাল। তারপরই আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে সে চিৎকার করে ছুটল প্রাণপণে।

বাঘ শিকার হাতছাড়া করতে রাজি নয়। ঘাসঝোপের আড়াল ছেড়ে চাপা গর্জন করে সে তাড়া করল। কয়েকটা মাত্র লাফের ব্যাপার। কিন্তু তার আগেই গর্জন করে উঠল আমার আর ক্রডেনের বন্দুক। পরপর দুটো গুলি বিদ্ধ করল মানুষখেকোটাকে। মাটির উপর ছিটকে পড়ল ডোরাকাটা বিরাট দেহ।

কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। অসাধারণ জীবনীশক্তির জোরে আবার উঠে দাঁড়াল বাঘটা, তারপর মরণ-কামড় বসাতে ঝাঁপ দিল মেয়েটার দিকে। আরও চারটে গুলি! গড়াতে গড়াতে বাঘের দেহ গিয়ে থামল মালয়ী মেয়েটার প্রায় পায়ের কাছে। এবার স্পন্দনহীন নিশ্চল। মেয়েটি অবশ্য তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে।

বন্দুকের শব্দ শুনে গ্রামবাসীরা ততক্ষণে এসে পড়েছে। গাছ থেকে নেমে এলাম। তেষট্টিটা খুনের নায়ক কুখ্যাত নরখাদক শেষ অবধি মারা পড়েছে। গ্রামবাসীরা আনন্দে আত্মহারা। আমরা অবশ্য সেই আনন্দে পুরোপুরি যোগ দিতে পারলাম না, শরীর তখন আর বইছে না।

পরে বাঘটার মাপ নেওয়া হয়েছিল—পাক্কা আট ফুট ন'ইঞ্চি। আমার জীবনে এত বড় বাঘ আমি আর দেখিনি।
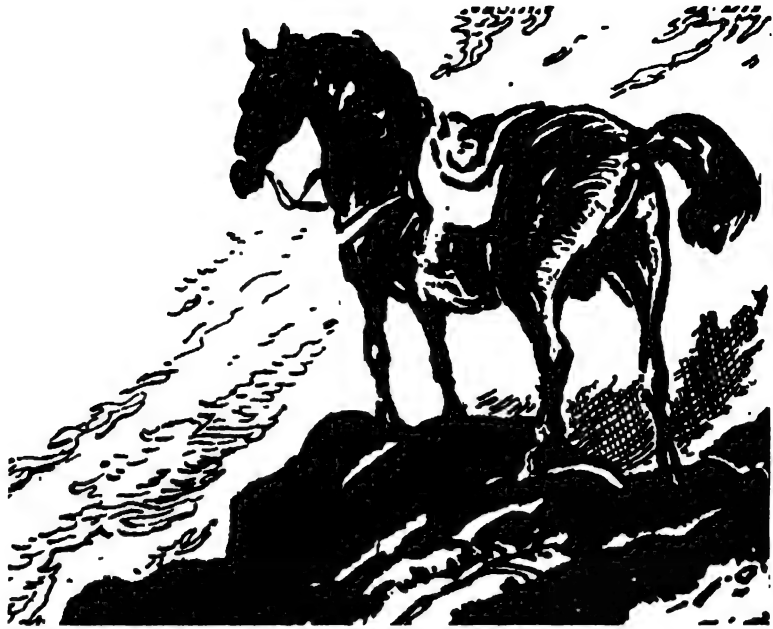
নীল পাহাড়ের আতঙ্ক

'নীল পাহাড়!'
'ব্লু মাউন্টেন!'

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের এই ব্লু মাউন্টেনের পেটের মধ্যে রয়েছে মন্টানা প্রদেশের সবচেয়ে বড় তামার খনি। আমাদের কাহিনি গড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ওই নীল পাহাড়েরই খনির মধ্যে। সৃষ্টিছাড়া এই অদ্ভুত কাহিনির বিবরণ আমরা পাই এক খনিশ্রমিকের কাছ থেকে যে কি না আগাগোড়া জড়িয়ে ছিল ওই ঘটনার সঙ্গে। শ্রমিকটির নাম এডওয়ার্ড কেনেডি।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে আশেপাশের আরো দু-চারটে খনির সঙ্গে এই খনিটাও একসময় খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো একজন শ্রমিকের হাতে-ধরা জ্বলন্ত মশালের আগুন অসাবধানে খনির ভিতরে স্তূপ করে রাখা কাঠের তক্তা,

পরিত্যক্ত ধাতুমল আর দড়াদড়িতে লেগে গিয়েই ওই বিরাট আগুনের সৃষ্টি। সতর্ক হওয়ার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা এলাকা জুড়ে এবং অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত সেটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। তার জন্য বেশ কিছু দিন খনির কাজও বন্ধ রাখতে হয়েছিল। খনির আর নীচের দিকের সুড়ঙ্গগুলো এমন গরম হয়ে উঠেছিল তখন, যে সেই উত্তাপে মানুষের পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। এমনকী বেশ কয়েক মাস বাদে কাজ পুরোদমে শুরু হওয়ার পরেও কয়েকটা সুড়ঙ্গে গরমের জন্য ঢোকাই যেত না।

অগ্নিকাণ্ডের পর খনির নিরাপত্তা-ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হল বটে কিন্তু আলোর অসুবিধা থেকেই গেল। খনির ভিতরে তখন বিজলী বাতির ব্যবস্থা ছিল না, জ্বলত মোমবাতি। ধাতুর আকর স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থাটাও ছিল সাবেকি ধরনের—ঘোড়া আর খচ্চরে টানা ইস্পাতে তৈরি গাড়ি ব্যবহার করা হত সেজন্য। খনির ভিতরেই ছিল আস্তাবল, জন্তুগুলোর থাকা-খাওয়ার পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

আমাদের এই কাহিনির নায়ক বব-ও ওই আস্তাবলেই থাকত। ববের ঘোড়ার কৌলিন্য ছিল না, সে ছিল নেহাতই ছোটখাটো একটা খচ্চর। আর পাঁচটা জানোয়ারের মতো সেও ছিল বেশ শান্তশিষ্ট। দানাপানি খাওয়ার সময় বা প্রায়োজনমতো রক্ষকের হুকুম তামিল করার ব্যাপারে কখনোই কোনো বেয়াদবি করতে তাকে দেখা যায়নি—তার রক্ষক স্যাম বার্টল-এরও কোনো অভিযোগ ছিল না তাকে নিয়ে এতদিন। অথচ সেই ছোটখাটো নিরীহ খচ্চরটাই একদিন হয়ে উঠল নীল পাহাড়ের আতঙ্ক। খনির কাজ পর্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছিল তার অত্যাচারে, ভয়ে তটস্থ হয়ে। শান্ত জানোয়ার হয়ে উঠেছিল উন্মত্ত নরঘাতক!

আশ্চর্য সেই ঘটনা শোনার আগে খচ্চরটা হঠাৎ কেন উন্মত্ত হয়ে উঠল সে সম্পর্কে দুয়েকটা কথা জানা দরকার—

যারা নিজের চোখে ঘটনা দেখেছে তাদের কারোর কারোর মতে খচ্চরটার পাগল হওয়ার কারণ খনির নীচের প্রচণ্ড উত্তাপ। কথাটা যুক্তিছাড়া নয় কারণ, খনির একেবারে নীচের স্তরে অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ থেকে ১৮০০ ফুট তলায় সুড়ঙ্গে যে ভীষণ গরম আবহাওয়া, সেখানে

সারাক্ষণ মাল বইলে মাথার গোলমাল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এডওয়ার্ড কেনেডি আর তাঁর কয়েকজন সঙ্গীর মত অবশ্য আলাদা। তাঁরা বলেছে, খনির নীচে ডিনামাইট ফাটানোর সময় খুব কাছাকাছি থাকার ফলে প্রচণ্ড শব্দের ধাক্কাতেই ববের মগজ বিকৃত হয়েছিল। আমাদের কাছে দুটো মতেরই গুরুত্ব সমান, সুতরাং কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক সে বিচারে না গিয়ে এবার মূল কাহিনিটাই বরং শোনা যেতে পারে।

১৯১৫ সাল—

খনির প্রায় ১৮০০ ফুট নীচে সেদিন একটা সুড়ঙ্গে ছোটখাটো বিস্ফোরণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তার আগে জন্তুগুলোকে কাছাকাছি অঞ্চল থেকে সরিয়ে আনবার সময়েই ববের আচার-আচরণের মধ্যে বেশ অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে। স্যাম বার্টল গিয়ে দেখে যে খচ্চরটা একটা থামের আড়ালে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ইস্পাতের গাড়িটা পড়ে আছে আর এক দিকে। যে দড়িটা দিয়ে জন্তুটাকে গাড়িতে জোতা হয়েছিল সেটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে কামড়ে। স্যাম কাছাকাছি যেতে নাকের পাটা ফুলিয়ে আর মাটিতে পা ঠুকে বিরক্তি দেখিয়েছিল বব। তবে সেদিন বেশিক্ষণ ভুগতে হয়নি; গাড়ির সঙ্গে বব-কে আবার জুতে দিয়েছিল স্যাম। সেই শুরু।

বাকি ঘটনা এবার এডওয়ার্ড কেনেডির মুখ থেকে শোনা যাক—

"সেই রাতটার কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি। নীল পাহাড়ের উপর অন্ধকার নেমে এসেছে। এখানে-ওখানে দুয়েকটা যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। আমার কাজ সেদিন খনির নীচে। যথারীতি বেল্ট বেঁধে মোমবাতি আর টিফিন কেরিয়ার সঙ্গে নিয়ে কাজে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছি। ১৮০০ ফুট নীচে যাদের কাজ, তারা প্রথমে নেমে গেল। স্যামকে দেখছি না। ও বোধহয় আস্তাবলের কাজে আগেই নীচে চলে গেছে। আমরা তিন-চারজন উঠে পড়লাম। বেশি নীচের স্তরে আজ আমাদের কাজ নেই। কাজেই আস্তে আস্তে হাঁটছি। মোমবাতি জ্বালিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সবে একটা বাঁক পেরিয়েছি, হঠাৎ দেখি স্যাম বার্টল ছুটে আসছে উর্ধ্বশ্বাসে। ভয়ে মুখ কাগজের মতো সাদা, চোখ দুটো ঠিকরে বেরোচ্ছে। আমাদের

সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, স্যাম। মুখে কথা জোগাচ্ছে না আতঙ্কে।

মিনিট দুই বাদে কথা বলল সে, 'বব্! খচ্চরটা! ওটাকে শয়তানে ভর করেছে! আমাকে তাড়া করেছিল, কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি!' একনিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল স্যাম, তারপর খানিকটা দম নিয়ে ঘটনার যে বিবরণ দিল তা ভয়ানক—

অন্য দিনের মতো আজকেও আস্তাবলের কাজে নেমে জন্তুগুলোর তদারক করতে গিয়ে তার খেয়াল হয় ববকে পাওয়া যাচ্ছে না; তার দড়িটাও ছেঁড়া। আশেপাশে কোথাও আছে, এই ভেবে খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে যখন পাওয়া গেল না, তখন স্যাম পশ্চিমের সুড়ঙ্গে নেমে যায়। পশ্চিম সুড়ঙ্গের খানিকটা গিয়েই উত্তপ্ত 'হট বক্স মাইন'; ভীষণ গরম। ওই উত্তাপে কোনো জন্তুর পক্ষে সেখানে ঘোরাফেরা করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়, তাই খানিকটা খোঁজাখুঁজি করেই স্যাম ফিরে আসছিল, এমন সময় একটা তীব্র চিৎকার তার কানে আসে। খচ্চরের ডাক চিনতে তাঁর ভুল হয়নি, কিন্তু চিৎকারটা যেন কেমন অস্বাভাবিক ঠেকে তাঁর কাছে। ডাকটা আসছে ওই উত্তপ্ত অঞ্চল থেকে। মনে মনে অবাক হয়েই স্যাম এগিয়ে যায় বটে সেদিকে, কিন্তু একটু গিয়েই তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়—সুড়ঙ্গের আবছা-আলো আবছা-অন্ধকারের মাঝখানে উন্মত্ত খচ্চরের চেহারাটা চোখে পড়তেই সে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়।

জন্তুটা আবার একটা ভয়ঙ্কর চিৎকাব করে ওঠে, তারপর আক্রমণ করতে ছুটে আসে স্যামকে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দৌড় মারা অসম্ভব। নেহাত ভাগ্য ভালো, সামনে ছিল একটা মই। পড়ি-কি-মরি করে কোনোমতে সেটায় চড়ে উপরের স্তরে উঠে যায় স্যাম। সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটার কামড়ে আর খুরের আঘাতে মইটা ভেঙে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে। আর একমুহূর্ত দেরি হলে রক্ষা ছিল না।

পালাতে গিয়ে স্যামের হাত থেকে বাতিটা পড়ে নিভে গিয়েছিল; পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে তাই জ্বালিয়ে শেষ পর্যন্ত পথ দেখে এখানে এসে পৌঁছেছে সে।

এর মধ্যে দশ-বারোজন শ্রমিক এসে গিয়েছিল। স্যামের কথা শেষ

হতে তাদের মধ্যে অনেকেই ব্যাপারটাকে বেশ মজার রসিকতা মনে করে হেসে উড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু আমরা কয়েকজন অত সহজে ওড়াতে পারলাম না।

কয়েকটা স্তর নেমে এসে স্যামের কথামতো ভাঙা মইটা চোখে পড়ল। টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে সেটা। মুখে কিছু না বললেও মনে মনে সর্তক হলাম সবাই।

সামনের দিকে কয়েক পা কেবল এগিয়েছি, হঠাৎ খনির ভেতর জেগে উঠল রক্তজলকরা চিৎকার। চিৎকারের উৎস চোখে না দেখলেও অজানা এক ভয়ে আমার শরীর বেয়ে যেন একটা ঠান্ডা স্রোত নেমে গেল, গায়ে কাঁটা ফুটে উঠল। শুধু আমার একার নয়, তাকিয়ে দেখি সবার চোখেমুখেই ভয়ের ছায়া। এমন বীভৎস চিৎকার

কোনো খচ্চরের হতে পারে ভাবা যায় না।

মনে জোর এনে মোমবাতিগুলো উঁচু করে ধরে সবাই মিলে আস্তে আস্তে আবার এগোলাম। সামনে 'হট বক্স মাইন', এখান থেকেই সমস্ত গা যেন ঝলসে দিয়ে যাচ্ছে। জন্তুটাকে এখানেই প্রথম দেখেছিল স্যাম।

'এটা কি হচ্ছে জানতে পারি?' হঠাৎ পিছন থেকে একটা রূঢ় গলা পেয়ে চমকে উঠলাম সবাই। চেয়ে দেখি এডরিক।

এড আমাদের 'শিফট বস'—শ্রমিকরা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তাঁর উপর দেখাশোনার ভার। বলিষ্ঠ চেহারা, ভারীগোছের একটা ব্যক্তিত্বও আছে তার কিন্তু স্বভাবটা বড় রূঢ়, কথাবার্তাও সেইরকম। কখন যে আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি; তাই প্রথমে হকচকিয়ে গেছিলাম।

'কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবার জায়গা নয় এটা, বুঝলে,' এডের গলায় স্পষ্ট বিরক্তি। আমরা সবাই মিলে তখন ওকে ববের ঘটনাটা খুলে বললাম, সবার আগে স্যাম।

কিন্তু এড আমাদের কথা বিশ্বাসই করল না, উলটে স্যামকে বেশ কড়া গলায় দু-কথা শুনিয়ে দিল, 'দেখ ওসব বুজরুকি ছাড়। যদি তুমি খচ্চরটার দেখাশুনা না করতে পারো, তবে সে দায়িত্ব অন্য কাউকে দেওয়া হবে। কিন্তু গল্প ফেঁদে কাজে ফাঁকি মারা চলবে না, বুঝলে।'

স্যাম বেচারি চুপ করে রইল। আমরাও মুখ বুজে চলে এলাম।

ব্যাপারটা কিন্তু চাপা রইল না। ববের খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা খনি এলাকা জুড়ে।

পরের দিন রাতে গিয়ে শুনি, সকালের শিফটে যারা ১৮০০ ফুটের সুড়ঙ্গে কাজ করতে গিয়েছিল, খচ্চরটার আক্রমণে নাজেহাল হয়ে তারা পালিয়ে এসেছে, গোটা শিফটে কোনো কাজ হয়নি। শ্রমিকদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট, চাপা গলায় ফিসফিসানি চলছে, নীচে নামতে কারোর ভরসা নেই।

খানিকক্ষণ পরে এসে উপস্থিত হল এড। আজ সকালের ঘটনা ওকে বেশ বিচলিত করেছে বলেই মনে হল। সে এসে প্রথমে আজকের ব্যাপারটার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়ে গেল। তারপর বলল, 'আমি ভাবছি দরকার পড়লে খচ্চরটাকে মেরে দিতে হবে। এখন তোমাদের

মধ্যে যদি কারোর ইচ্ছা থাকে তো আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

আগে খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন লক্ষ্য করলাম এড একেবারে রণসাজে সেজে এসেছে। ডান হাতে একটা ভারী গাঁইতি আর বাঁ-হাতে ঝুলছে একগাছা দড়ির ফাঁস। সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা যেতে পারি।'

অর্থাৎ, একা কেউ মৃত্যুপুরীর সুড়ঙ্গে নামতে রাজি নয়।

এড সব দেখেশুনে আর আপত্তি করল না।

মিনিট পনেরো বাদে আমরা পৌঁছলাম ১৮০০ ফুটের স্তরে। সামনেই 'হট বক্স মাইন'-এর সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সেহ বাঁকটা পড়ল, যেখান থেকে জন্তুটা এর আগে দু-দুবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাঁকের মুখে এসে গোটা দলটা যেন কলের পুতুলের মতো হঠাৎ থেমে গেল। যেন একটা অজানা ভয় পায়ে বেড়ি এঁটে দিয়েছে সবার। এড ছিল সামনে। তাঁকে দেখে কিন্তু ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। প্রায় নিঃশব্দে সে বাঁকের মুখ ধরে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ এডের মশালের আলোয় খানিক দূরে একটা কিছু নড়ে-চড়ে উঠল। আমরা দেখলাম, অন্ধকারের মধ্যে থেকে আর একটা জমাট-বাঁধা অন্ধকার যেন হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠছে। শিকারি বেড়ালের মতো নিঃশব্দে জন্তুটা কখন যে এত কাছে এসে পড়েছে কেউই বুঝতে পারিনি। ভয়ে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তৈরি হওয়ার সুযোগ পেলাম না, তার আগেই জন্তুটা আক্রমণ করল; শুধু লক্ষ্য করলাম একই সঙ্গে মশালের আলোয় ঝলসে উঠতে এডের গাঁইতিটাকে।

কিন্তু গাঁইতি খচ্চরের নাগাল পেল না, বরং পরমুহূর্তে উদ্যত খুরের আঘাতে ছিটকে পড়ল এডরিক। হাতে ধরা মশালটা এক দিকে ছিটকে পড়ে নিভে গেল।

তারপরই সুড়ঙ্গের বাঁক থেকে ভেসে এল এলোপাথারি খুরের শব্দ আর এডরিকের আর্তনাদ।

আমরা তখন মরিয়া। এডরিকের আর্তনাদ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম সামনের দিকে। কয়েকটা মশালের আলোয় খনিগহ্বর আলোকিত হয়ে

উঠতে দেখলাম, একটু দূরেই পড়ে আছে এডের রক্তাক্ত দেহ আর শয়তান জানোয়ারটা পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

দল বেঁধে ছুটে গেলাম আমরা। ভেবেছিলাম, এতজনে মিলে জানোয়ারটাকে কাবু করতে পারব, কিন্তু তখন শয়তান ভর করেছে তার উপর। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছুটে এল আমাদের দিকে। খুরের বিষাক্ত ছোবলে কয়েকজন শ্রমিক ছিটকে পড়ল আহত হয়ে। তারপর আমাদের চোখের সামনে আবার ফিরে গিয়ে এডের আধমরা দেহটাকে খুর আর দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল জন্তুটা।

বীভৎস দৃশ্য!

তিনজন আহত সঙ্গীকে নিয়ে পিছু হটে এলাম। কয়েকজন ছুটে উপরে গেল বন্দুক নিয়ে আসতে। আহত তিন সঙ্গীর মধ্যে দুজনের জ্ঞান নেই, তৃতীয়জনের কব্জির হাড় ভেঙেছে।

এর মধ্যে প্রায় একশো গজ দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে এডরিকের গোঙানি আর খচ্চরটার চিৎকার। গোঙানি ধীরে ধীরে কমে এল, শেষে একসময় হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, বেচারি এডের জীবনদীপটুকু ক্ষীণ হতে হতে নিভে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে কয়েকজন শ্রমিক রাইফেল নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটা পিস্তলও নিয়ে এসেছে একজন। মশালের আলোয় পথ দেখে এবার এগোলাম আমরা। কিন্তু জন্তুটা কই? শুধু এডের মৃতদেহটা পড়ে আছে। কাজ শেষ করে হিংস্র শ্বাপদের মতোই গা-ঢাকা দিয়েছে জন্তুটা।

তবে পালিয়ে সে যাবে কোথায়? সুড়ঙ্গপথ সোজা চলে গেছে উত্তপ্ত খনির গর্ভে। কিছুদূর এগিয়ে কিন্তু অবাক হলাম আমরা। প্রচণ্ড উত্তাপে সারা শরীর ঝলসে যাচ্ছে আমাদের, আর এগোনো অসম্ভব। তবু সেখান থেকে মশালের আলোয় যতখানি দেখা যায় তার আওতায় খচ্চরটার কোনো চিহ্ন নেই। আরও ভিতরে কোনো ঘোড়া বা খচ্চরের পক্ষে টিকে থাকার কথাই ওঠে না। এটা কোনো সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার?

বাধ্য হয়ে ফিরতে হল উপরে। সঙ্গে বয়ে আনা এডরিকের মৃতদেহ দেখা মাত্রই শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য উঠল, ভূগর্ভে কাজে নামতে আর কেউই রাজি নয়।”

এডওয়ার্ডের বিবরণ এতক্ষণ আমরা শুনলাম। এবার দেখা যাক, কী ঘটল তারপর।

খনির পরিচালকরা স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিচলিত হয়ে উঠল। স্থানীয় নিরাপত্তা শিবিরের দুজন শ্রেষ্ঠ বন্দুকবাজকে তারা নিযুক্ত করল জন্তুটাকে মারার জন্য।

নীল পাহাড়ের গর্ভে শুরু হল দ্বিতীয় অভিযান।

কয়েকজন সাহসী শ্রমিককে সঙ্গে করে দুই বন্দুকধারী নামল খনির নীচে। ১৮০০ ফুটের স্তরে এসে যখন তারা পৌঁছল তখনো গত যুদ্ধের চিহ্ন পথের মাঝে মাঝে রয়ে গেছে। ছোটবড় রক্তের ছাপ।

উত্তপ্ত অঞ্চলের দুশো গজ দূরে এসে দলটা দাঁড়াল। বন্দুক দুটো আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে শিকারি দুজন সাবধানে এগোল সামনের দিকে।

উত্তাপ সবে প্রখর হতে শুরু করেছে, হঠাৎ সামনের আলো-আঁধারির মাঝে একটা জীবন্ত দেহ দুলে উঠল। মাঝখানে হিংস্র দুটো লাল চোখ!

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেল। তীক্ষ্ণ একটা জান্তব চিৎকার জেগে উঠল খনিগুহা কাঁপিয়ে, তারপরই বন্দুকের আওয়াজ আর আগুনের ঝলক উপেক্ষা করে জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়ল গোটা দলটার উপর। খুরের আঘাতে ছিটকে পড়ল কয়েকজন। ছিটকে পড়ল মশালগুলো।

আক্রমণের প্রথম ধাক্কাটা সামলে ওঠার পর জ্বলে-থাকা একটামাত্র মশালের ক্ষীণ আলোয় দেখা গেল খচ্চরটা অদৃশ্য হয়েছে। রক্তের একটা সরু রেখা সুড়ঙ্গপথ ধরে অদৃশ্য হয়েছে 'হট বক্স মাইনের' দিকে। জন্তুটা আহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মারাত্মকভাবে নয়।

দলটা ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল আহত কিছু মানুষ আর আতঙ্কের স্মৃতি।

পরপর দুটো অভিযান এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় মুষড়ে পড়ল তামার খনির কর্তৃপক্ষ।

তাহলে কী উপায় হবে এই বিরাট লোকসানের? শুধু একটা খচ্চরের জন্য কাজ বন্ধ করে দিনের পর দিন গুনতে হবে হাজার হাজার ডলারের ক্ষতি?

ভাবতে ভাবতে যখন তাদের মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা, তখনই

এক প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল এডওয়ার্ড।—'হ্যাঁ, জন্তুটাকে মারা যেতে পারে বটে, কিন্তু তার জন্য ছত্রিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখতে হবে খনির কাজ।'

'ছত্রিশ ঘণ্টা, মোটে?' হাতে যেন চাঁদ পেল কর্তৃপক্ষ। যেখানে কাজ একেবারেই বন্ধ হওয়ার উপক্রম, সেখানে ছত্রিশ ঘণ্টা তো কিছু না।

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবে বন্ধ ছত্রিশ ঘণ্টা। মোটে তো দেড়টা দিন। কাজে হাত লাগাও এখুনি। আমরা রাজি।'

অনুমতি পেয়েই কাজ শুরু করে দিল এডওয়ার্ড।

প্রথমে সে জোগাড় করল খান-দুই বালক্‌হেড। তারপর কয়েকজন শ্রমিককে সঙ্গে নিয়ে নেমে গেল খনিতে। এক একটা বালক্‌হেড বসানো হল সুড়ঙ্গের এক এক মুখে। ফলে দু-মুখ আটকানো সুড়ঙ্গের ভিতরের প্রচণ্ড উত্তাপ আর আবদ্ধ বাতাসে আটকা পড়ে গেল জানোয়ারটা।

এইবার আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসতে লাগল বালক্‌হেড-এর মাঝের সীমানা। ছোট থেকে আরও ছোট জায়গার মধ্যে আটকে পড়তে লাগল জন্তুটা। তারপর একসময় সেই সচল পাঁচিলের গায়ে জেগে উঠল ভারী খুরের আওয়াজ। কিন্তু শক্ত পাঁচিল সে আঘাতে এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত।

কেটে গেল পুরো দেড় দিন। ছত্রিশ ঘণ্টা। এবার সাবধানে পাঁচিল সরিয়ে ফেলতে দেখা গেল, পড়ে আছে খচ্চরটার মৃতদেহ। বদ্ধ বাতাস আর প্রচণ্ড গরমে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে মরেছে জন্তুটা।

খনির ভিতর থেকে উপরে নিয়ে আসা হল ববের মৃতদেহ। শ্রমিকদের উল্লাস তখন দেখবার মতো।

এডওর্য়াড পুরস্কৃত হয়েছিল ভালোমতোই।

এখন সে আর খনিশ্রমিক নয়, খনিপরিচালক।

মাত্র আধ ইঞ্চির জন্য

আধ-ইঞ্চি! হ্যাঁ, মাত্র আধ-ইঞ্চি।

আর ওই আধ-ইঞ্চির জন্যই মৃত্যু-বরণ করতে হল শ্বেতাঙ্গ শিকারি রবিনসনকে। যদিও তাঁর মৃত্যুর জন্য তাঁর নিজের গোয়ার্তুমিও অনেকাংশে দায়ী, তবু মাত্র আধ-ইঞ্চির লক্ষ্যভ্রষ্টতার জন্য বন্ধুর শোচনীয় মৃত্যুর কথা চিন্তা করেই উইলসনের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

প্রকৃত ঘটনার শুরু ব্রহ্মদেশের এক কাঠের গুদামে জনৈক ব্যক্তির একটা সামান্য ভুলকে কেন্দ্র করে, কিন্তু বর্তমানে আমরা ব্রহ্মদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি 'ক্লাব'-এর পটভূমি থেকেই আমাদের কাহিনি শুরু করব।

"বোহ্‌মিওর স্টেশন ক্লাব"—

বার্মা বা ব্রহ্মদেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এই ক্লাবটিতে সেদিন বেশ জনসমাগম হয়েছিল একটি পার্টি উপলক্ষ্যে। ওই পার্টিতে অন্যান্য অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী মিঃ

উইলসন এবং প্রতিবেশী একটি কাঠের গুঁড়ির গুদামের মালিক মিঃ রবিনসন। ব্রহ্মদেশে কাঠের গুঁড়ির ব্যবসা বহুল প্রচলিত এবং লাভজনক। কিন্তু রবিনসন শুধু ব্যবসাদার ছিলেন না, একজন আদৃত শিকারি হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক ছিল।

পার্টি চলাকালীন জনৈক তরুণ সামরিক অফিসার, শিকারে ঠিক কোন শ্রেণির রাইফেল বা বন্দুক ব্যবহার করা শ্রেয় সে সম্পর্কে ওই দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত জানবার জন্য খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। স্বভাবতই, নবীন অফিসারটির শিকারের সখ ছিল প্রবল। শ্বেতাঙ্গ মিঃ রবিনসনকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে অনুরোধ করা হলে, তিনি যে মত প্রকাশ করলেন তার সারমর্ম দাঁড়ায়, নিজের স্নায়ুযন্ত্র ও লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকলে শিকারে সবসময়েই হালকা রাইফেল ব্যবহার করা উচিত। প্রসঙ্গক্রমে রবিনসন .৩০৩ বোরের রাইফেল ব্যবহারের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করলেন। .৩০৩ আগ্নেয়াস্ত্র বড় জন্তু শিকারের পক্ষে অবশ্যই খুব হালকা যদিও ব্যবহারের পক্ষে যে কোনো ভারী রাইফেলের থেকে অনেক সুবিধাজনক।

অপর শ্বেতাঙ্গ মিঃ উইলসন কিন্তু বন্ধুর এই মতে সায় দিলেন না। তাঁর মতে, অধিকাংশ নবীন শিকারি বড় জন্তু শিকারের ক্ষেত্রে নিজেদের স্নায়ুকে আয়ত্তে রাখতে পারেন না, অন্তত সম্পূর্ণভাবে তো নয়ই, ফলে সেসব ক্ষেত্রে হালকা রাইফেল ব্যবহারের ঝুঁকি যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কারণ, হালকা আগ্নেয়াস্ত্র থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি শিকারের মর্মস্থানে আঘাত না করলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই শিকারিকে নিজের প্রাণ দিয়ে তাঁর সেই লক্ষ্যভ্রষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। পক্ষান্তরে ভারী রাইফেলে—ব্যবহারের পক্ষে ততটা সুবিধাজনক না হলেও, শিকারি তার ভুল সংশোধন করার মতো অন্তত আরেকটি সুযোগ পান, কারণ ভারী বন্দুকের গুলি শিকারের মর্মস্থানে আঘাত না করলেও সাময়িক ভাবে তার আক্রমণকে অথবা আক্রমণের গতিকে স্তব্ধ করে দেয়। সেই সময়েই শিকারি তাঁর সংশোধনের সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে যুক্তিযুক্ত কারণেই উইলসনের বক্তব্যে ভারী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার কথা সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হল।

—"স্নায়ুকে বশে এনে গুলি চালাতে না পারলে তাকে তো শিকারি

বলে স্বীকার করাই কঠিন।' রবিনসনের ভারী গলায় উত্তেজনার ছোঁয়া। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, উইলসনের কথা তাঁর ভালো লাগেনি।

—'কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল শিক্ষানবিশদের ক্ষেত্রে; তাদের সম্পর্কেও কি তোমার একই মত?' ঠান্ডা নিরুত্তাপ গলায় উইলসনের প্রশ্ন ভেসে এল টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে।

ততক্ষণে এই দুই অভিজ্ঞ শিকারিকে ঘিরে বেশ কয়েকজন উৎসুক ও কৌতূহলী ব্যক্তির ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। সঙ্গত কারণেই, তাদের অধিকাংশের মতো গেল উইলসনের বক্তব্যের স্বপক্ষে, কিন্তু তার ফলে রবিনসনের মেজাজ চড়ে গেল সপ্তমে। ফলে, প্রাসঙ্গিক মত বিনিময়ের এখানেই সমাপ্তি ঘটল, এবং মিঃ রবিনসন তাঁর বন্ধুবরকে অনুরোধ জানালেন যে তাঁকে প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ওই হালকা রাইফেলের সাহায্যেই সম্প্রতি 'গুণ্ডা' হয়ে যাওয়া হাতিটাকে শিকার করে তাঁর বক্তব্যের বাস্তব সত্যতা প্রমাণ করতে আগ্রহী। উইলসন বন্ধুর এই প্রস্তাবে সাগ্রহে তাঁর অনুমতি প্রদান করলেন কিন্তু রবিনসনের পরবর্তী কথাগুলোর জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

পার্টিতে আমন্ত্রিত অন্যান্য যেসব কৌতূহলী ব্যক্তি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের মতামতও সুবিধামতো ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য করে রবিনসন এবার বলে উঠলেন—'আশা করি এবার আমি আমার চিন্তাধারার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণ করতে সক্ষম হব। মাত্র .৩০৩ বোরের রাইফেলের সাহায্যেই আমি "গুণ্ডা" হাতিটাকে শিকার করব। আমার সাফল্য সম্পর্কে যদি কেউ সন্দিহান হন তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি একশো টাকা পর্যন্ত বাজি ফেলতে রাজি আছি।' রবিনসনের বক্তব্যে প্রচ্ছন্ন দম্ভের স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল, ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েকজন তাঁর ওই বাজির চ্যালেঞ্জ সানন্দে গ্রহণ করলেন।

চমকে উঠলেন উইলসন।

সর্বনাশ! এ কী ধরনের বাজি ধরছেন রবিনসন। .৩০৩ বোরের রাইফেল সম্বল করে হাতি শিকার করতে যাওয়া তো একরকমের আত্মহত্যারই নামান্তর। বন্ধুকে এই সাংঘাতিক ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য

বারবার অনুরোধ করলেন তিনি। কিন্তু রবিনসন অটল। শিকার সম্পর্কে ধারণাহীন এই লোকগুলোর আনাড়ি মন্তব্যের উপযুক্ত জবাব দিতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে, কয়েকবার অনুরোধ করার পর নিজের সম্মানার্থে উইলসন বিরত হলেন।

ক্লাবের মধ্যে তখনকার মতো চুপ করে গেলেও উইলসনের সেদিন সারারাত দুশ্চিন্তায় কাটল। হাজার হলেও রবিনসন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সেই কারণে, পর দিন সকালেই উইলসন বন্ধুবরের মতো পরিবর্তন করার জন্য তাঁর বাসগৃহের উদ্দেশ্যে চললেন। শেষবারের মতো একবার চেষ্টা করতে দোষ কি? বলা যায় না, হয়তো ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে রবিনসন তাঁর মতো পালটালেও পালটাতে পারেন।

কিন্তু গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বন্ধুবরের দেখা মিলল না। পরিবর্তে হস্তগত হল একটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য সরল। রবিনসন একজন মাত্র সঙ্গীকে নিয়ে ইতিমধ্যেই হাতির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছেন। দিন সাতেকের মধ্যেই তিনি ফিরছেন। পশ্চাদ্ধাবন করা বৃথা, অতএব নিরাশ হয়েই ফিরতে হল উইলসনকে।

পাঠক-পাঠিকাকে আপাতত এইখানে রেখে আমরা পিছিয়ে যাব কয়েকটি মাসের ব্যবধানে ঘটনার গৌরচন্দ্রিকায়, কাহিনির প্রাথমিক পর্যায়ে।

মাহুত মাউঙ-সেন-এর একটা ভুলের মধ্যে দিয়েই ঘটনার সূচনা। গণ্ডগোলটা সে-ই প্রথমে বাঁধায়।

'এন্সান স্মিথ' নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গের তত্ত্বাবধানে ব্রহ্মদেশের একটি কাঠের গুঁড়ির গুদামে হস্তিচালকের কাজ করত মাউঙ-সেন। অভিজ্ঞ মাহুত মাউঙ-সেনের উপর শ্বেতাঙ্গ স্মিথেরও ছিল প্রগাঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। কারণ তার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা—তবু এই মাউঙ-সেনই ভুলটা করে বসল মারাত্মকভাবে।

ঘটনাটা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সামান্য।

সেদিন মাউঙ-সেনের মেজাজটা কোনো কারণে সপ্তমে চড়েছিল। গুদামে এসে নিত্যনৈমিত্তিক কাজে যখন সে যোগ দিল তখনও তাঁর মাথা বেশ গরম। হাতিটা সামান্য কিছু ভুল করলে বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লে সে জন্তুটার প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করছিল। এরই মধ্যে

একসময় হঠাৎ একটা কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে মাউঙ-সেন সজোরে আঘাত করে বসল জন্তুটার পায়ে নীচের দিকের নরম অংশে। হাতিটার এমন কিছু দোষ ছিল না। রাগ পড়ে যেতে মাউঙ-সেনও বুঝল যে লঘু দোষে এতটা গুরু দণ্ড দেওয়া তার পক্ষে ঠিক হয়নি। তখনকার মতো কিছু ঘটল না বটে—কিন্তু হাতির স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল অভিজ্ঞ মাহুতের বুঝতে বাকি রইল না যে, সে নিজেই নিজের কত বড় বিপদ ডেকে এনেছে। সে সাবধান হল!

মাউঙ-সেনের ধারণা যে অভ্রান্ত, মাস কয়েক পরের একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণ মিলল...

হাতিটাকে খাবার দেওয়ার সময় সেদিন মাউঙ-সেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কাজ করতে করতে যেই সে হাতিটার দিকে পিছন ফিরেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সামান্য সময়টুকু মধ্যে, জন্তুটা তার বিরাট মাথা সামনের দিকে অল্প হেলিয়ে নিয়ে এক প্রচণ্ড আঘাতে হতভাগ্য মাহুতকে তার একটা দাঁতে গেঁথে ফেলল, এবং কোনোরকমের জানাজানি হওয়ার আগেই চম্পট দিল জঙ্গলের পথ ধরে।

'স্মিথ' নামক শ্বেতাঙ্গ অত্ত্বাবধায়কটি যখন এই দুর্ঘটনার খবর পেল তখন সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে উঠে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে কয়েকটি হাতি এবং প্রায়োজনীয় লোকজন জোগাড় করে নিয়ে ধাওয়া করল খুনি হাতিটার পিছনে। স্মিথের এই সাময়িক বিহ্বলতার কারণও ছিল যথেষ্ট। প্রথমত, ওই খুনি জন্তুটা ছিল গুদামের সবচেয়ে কর্মক্ষম আর দামি হাতি এবং দ্বিতীয়ত, মাউঙ-সেনের মতো দ্বিতীয় একটি মাহুত খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর।

স্মিথের পক্ষে এই বিরাট ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া একটু কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। ফলে যতটা সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে হাতিটার খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ল একটা গোটা দল। কিন্তু কাজটা অত সহজ হল না। পলাতক হাতিটার পায়ের ছাপ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে, দাঁতে গেঁথে নেওয়া মাউঙ-সেনের মৃতদেহ বহন করে হাতিটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে এবং একটুও না থেমে। সুতরাং অনির্দিষ্ট দূরত্বের পশ্চাদ্ধাবন পালা সাঙ্গ করে বাধ্য হয়েই 'স্মিথকে' তাঁবুতে ফিরতে হল দলবল নিয়ে।

ভোর রাত্রি...

স্মিথের ঘুম ভেঙে গেল তীব্র শাঁখের আওয়াজের মতো হস্তীকণ্ঠের বৃংহণ ধ্বনিতে। সমাগত বিপদের ভয়াবহ আশঙ্কা নিয়ে স্মিথ তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসার পরমুহূর্তে উন্মত্ত হাতির সঙ্গে সংঘাতে পাটকাঠি আর কাগজের তৈরি কাঠামোর মতো তাঁবুটা ভেঙে পড়ল। ভাগ্য ভালো, সামনে একটা বড় গাছ নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন স্মিথ। গাছের উপরে এরই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল একটি ব্রহ্মদেশীয় কুলি। সাহেবকে গাছে উঠতে দেখে সে হাত বাড়িয়ে উঠতে সাহায্য করল। তার সাহায্যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাছে উঠে স্মিথ জীবনরক্ষা করলেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে ভেসে এল একটা তীব্র আর্তনাদ। সূর্যের আলো তখনও ফোটেনি। দূরের গাছপালা স্পষ্ট চোখে পড়ে না। সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে এক বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ল স্মিথ সাহেবের। অদূরবর্তী একটা গাছে উঠতে সচেষ্ট জনৈক হতভাগ্য বহু চেষ্টাতেও হাতিটার নাগালের বাইরে যেতে পারল না। ফলে...

না, বর্ণনা দেবার মতো তেমন কিছু দেখেননি স্মিথ সাহেব। শুধু দেখলেন মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে একটি মানুষকে, এক দলা মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে যেতে। জমির উপর শিকার পর্যাপ্ত সংখ্যায় পাওয়া যাচ্ছে না, এই কথাটা একটু পরেই খেয়াল হল হাতিটার এবং এবার সে নজর দিল বৃক্ষবাসী মানুষগুলোর উপর। প্রবল ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল বিশাল গাছগুলো, কিন্তু বৃক্ষারোহী মানুষগুলোর সৌভাগ্যক্রমে উন্মত্ত দানবের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘাতের পরও তারা মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে 'গুন্ডা'টা যখন জঙ্গলে ফিরে গেল, আকাশে তখন দুপুরের গনগনে সূর্য।

এই ঘটনার পরেই উপদ্রুত অঞ্চলে হাতিটা 'নরঘাতক' হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করল। বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত, বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল জায়গা জুড়ে তার কবলে প্রাণ হারাল বহু মানুষ। কিন্তু স্থানীয় শিকারিরা অথবা স্মিথ কেউ তার কোনো নাগাল পেত না। নরখাদক বাঘের মতোই জন্তুটা হয়ে উঠেছিল

অসম্ভব চালাক।

প্রায় মাস আষ্টেক পরের ঘটনা। দাঁতালটাকে মারবার জন্য তখন বেশ মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা গুদাম-মালিকদের তরফ থেকে।

সেই সময় পূর্ব-ব্রহ্মের বোহ্‌মিও স্টেশন ক্লাবে একটি পার্টিতে বেশ কিছু আমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হয়েছিল। উইলসন এবং রবিনসনও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ওই দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারির মধ্যে মত বিনিময় এবং পরবর্তী পর্যায়ে বাদানুবাদের কথা আমরা আগেই জেনেছি; এবং এখন সম্ভবত আমরা আঁচ করতে পারি যে কোন 'গুন্ডা' হাতিটার পশ্চাদ্ধাবন করে শিকার করতে বেরিয়েছিলেন রবিনসন।

সাতদিনের নোটিশ জারি করে বন্ধুকে চিঠি লিখে মিঃ রবিনসন তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন হাতির খোঁজে। নিরাশ হয়ে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন উইলসন। কীই বা এখন করণীয় আছে তাঁর একমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া।

কাটল একটি-দুটি-তিনটি দিন...

কোনো খবরই নেই রবিনসনের। অবশেষে চতুর্থ দিন সংবাদ নিয়ে এল বার্তাবাহক। উইলসন সে সময় তাঁর অফিসে কাজে ব্যস্ত। বার্তাবহনকারী ব্যক্তিটিকে চিনতেন উইলসন। রবিনসনের জনৈক সহকর্মী। অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সে এসে জানাল যে, রবিনসনের তিন ভৃত্য স্ট্রেচারে করে যে ব্যক্তিটিকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে সে লোকটিই ছিল রবিনসনের হাতিশিকারের সঙ্গী। প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর সম্পূর্ণ দেহ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। আর রবিনসন সম্ভবত নিহত হয়েছেন, যদিও ঘটনার পুরো বিবরণী তাঁর অজ্ঞাত।

উইলসনের স্নায়ুকেন্দ্রে একটা তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হল সাময়িক কালের জন্য। কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন তাঁর অভিজ্ঞ মন। বুঝলেন, মানসিক ভারসাম্য হারাবার সময় এটা নয়। ফলে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব দুই ব্যক্তি রওনা হলেন হাসপাতালের দিকে।

হাসপাতালে পৌঁছে ডাক্তারের কাছ থেকে উইলসন ও তাঁর সঙ্গী জানতে পারলেন যে, আহত ব্যক্তির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আঘাতের তীব্রতায় তাঁর দেহের নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে গেছে।

এক্ষেত্রে ব্যক্তিটিকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব। উপরন্তু, তাঁর দেহের অভ্যন্তরে বহু ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। তবে, এখনো তাঁর জ্ঞান রয়েছে—ইচ্ছা করলে তাঁরা দুজন, রুগির কাছ থেকে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ জানতে পারেন।

উইলসনকে দেখে কাতর অনুরোধ জানিয়ে রবিনসনের সঙ্গী ব্যক্তিটি ওই হাতিটাকে মারবার জন্য বারবার মিনতি করতে লাগল। কারণ, তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই হাতিটার উপর কোনো শয়তান অপদেবতা ভর করেছে। তাঁর এই বিশ্বাস প্রমাণ করতে সে যে কাহিনির বর্ণনা দিল, তা যেমন ভয়াবহ, তেমনই করুণ—

'টাটকোন' গ্রামের কাছ থেকে সে এবং রবিনসন গুন্ডাটার পায়ের ছাপ খুঁজে পায়। কিন্তু সেদিনটা তাদের পুরোই ব্যর্থতায় কাটে, অর্থাৎ হাতিটার আর কোনো হদিসই পাওয়া যায়নি। সে রাত্রিটা গ্রামে কাটিয়ে পরদিন সকালেই আবার জন্তুটার পিছনে ধাওয়া শুরু হয়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে চলে এই পশ্চাদ্ধাবন-পর্ব...

দুই শিকারি ক্রমে প্রবেশ করেন ঘন ঘাসে ঢাকা তৃণভূমির মধ্যে। চারিদিকে মানুষ সমান উঁচু ঘনসন্নিবিষ্ট 'এ্যালিফ্যান্ট গ্রাস'-এর জঙ্গল। বড়জোর দশ-বারো গজের মতো সোজা দৃষ্টি চলে; ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে এগোতে হচ্ছিল তাদের। এমন সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে পড়ল রবিনসনের চোখে। 'এ আপদ আবার কোথা থেকে জুটল এ সময়ে!' রবিনসন তাঁর সঙ্গীকে বললেন খুব তাড়াতাড়ি পোকাটাকে চোখ থেকে বার করতে। এমন সময়ে তাদের ডানদিকে একটু দূরে জেগে উঠল এক ভয়ংকর বৃংহণধ্বনি। চোখ ফেরাতেই ঘাস-জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে দৃষ্টিগোচর হল ঝড়ের বেগে ধাবমান উন্মত্ত গজরাজের ক্ষিপ্ত মূর্তি। এক ঝটকায় রাইফেল টেনে নিয়ে গুলি চালালেন রবিনসন। স্থির লক্ষ্যে শিকারির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল, ধাবমান অতিকায় জন্তুটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু, বড় দেরি হয়ে গেছিল তাঁর। পরমুহূর্তে উন্মত্ত হাতির একটা প্রকাণ্ড পায়ের তলায় পিষে গেলেন হতভাগ্য শিকারি। সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়ল প্রাণ বাঁচাবার জন্য, কিন্তু ক্ষিপ্ত হাতির শুঁড়ের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর দেহ শূন্যপথে উড়ে গিয়ে পড়ল গজ-দশেক দূরে। হত্যার উন্মাদনায় উন্মত্ত হাতিটা

আবার ফিরে গেল রবিনসনের দেহটার কাছে, তারপর প্রচণ্ড আক্রোশে শুঁড় এবং পায়ের সাহায্যে সেটাকে একটা আকারবিহীন মাংসের দলায় পরিণত করল কয়েক মিনিটের মধ্যে। তারপর ফিরে চলে গেল জঙ্গলের পথে। কাহিনি শেষ করে থামল রবিনসনের পঙ্গু সঙ্গী।

ততক্ষণে কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন উইলসন। সামরিক অফিসারটির সঙ্গে একটু পরেই তিনি রওনা হলেন ওই 'টাটকোন' গ্রামের দিকে। 'সঙ্গীর' জবানবন্দি মতো ওই গ্রামেরই অনতিদূরে খুনি হাতিটার কবলে প্রাণ হারিয়েছেন শ্বেতাঙ্গ শিকারি মিঃ রবিনসন। সুতরাং, আশা করা যায়, ধারে কাছেই 'খুনি'-টার সন্ধান মিলবে।

কিন্তু কাজটা যতটা সোজা ভেবেছিলেন উইলসন, বাস্তবে কিন্তু ঠিক ততটা সোজা হল না। দীর্ঘ সাতদিন ধরে ক্রমান্বয়ে 'গুন্ডা' হাতিটার পায়ের ছাপ ধরে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে দুই শিকারি 'খুনি'-টার সাক্ষাৎ পেলেন।

ঝড়ের মতো আক্রমণ করল নরঘাতক হাতি—কিন্তু, এবার তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে অগ্নিবর্ষণ করল দু-দুটো ভারী রাইফেল। প্রথম গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় জন্তুটার আক্রমণের গতিপথ বেঁকে গেল। দ্বিতীয় গুলি হাঁটুতে লাগল—হাতি হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দু-পায়ের উপর। তৃতীয় গুলি তার মর্মস্থান ভেদ করল। দাঁতালটার অতিকায় দেহ গড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে।

দুই শিকারি পরীক্ষা করে দেখলেন যে মাত্র আধ-ইঞ্চির জন্য রবিনসনের গুলি হাতির মর্মস্থল ভেদ করতে অসমর্থ হয়। আর সেই বুলেট ছিল .৩০৩ বোরের। অর্থাৎ, নিজের কথার খেলাপ করেননি রবিনসন!
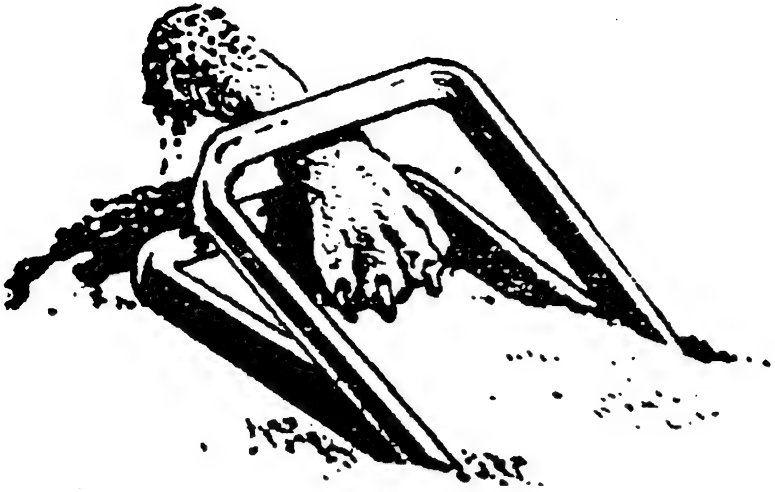
রেড কিলার

"রেড কিলার" নামে অভিহিত খুনিটার হত্যার সংখ্যা সামান্য কয়েক মাসের মধ্যেই একক, দশকের সীমারেখা ছাড়িয়ে যখন দুশো-র আওতায় গিয়ে পৌঁছল, তখন তার মাথার দাম উঠল ত্রিশ পাউন্ড।

'রেড কিলার!'

'লাল আতঙ্ক!'

মাত্র দুটি শব্দ।

কিন্তু পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি জুড়ে একদিন ওই দুটি শব্দ যে ভয়াবহ আতঙ্ক এবং ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, বাস্তব সত্য হলেও সে কাহিনি আমাদের কাছে আপাতভাবে অবিশ্বাস্য বোধ হওয়া স্বাভাবিক।

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ।

ভূগোল ও জীবতত্ত্বের বিচারে নিতান্তই নিরীহ গোছের ভূখণ্ড। পৃথিবীর এই মহাদেশটির বুকে অবাধে বিচরণ করে না ভয়ংকর মাংসাশী

অতিকায় মার্জারকুল অথবা হিংস্র তৃণভোজীর দল। বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ায় না 'কেপ-বাফেলো', গন্ডার অথবা গুন্ডা হাতির পাল—নিরীহ জেব্রার পিছনে গুঁড়ি মেরে ঝোপে-ঝাড়ে জ্বলে ওঠে না পশুরাজ সিংহ অথবা লেপার্ডের হিংস্র সবুজ চোখ। এমনকী 'আলাস্কান ব্রাউনি' অথবা 'গ্রিজলী-বীয়ার'-দের মতো অতিকায় ঋক্ষরাজরাও এখানে অনুপস্থিত।

ফলে পাঠকপাঠিকার মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—কে এই খুনি! জীবতত্ত্বের কোন গোষ্ঠিতে মিলবে এর পরিচয়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা ফিরে যাব আমাদের কাহিনির স্থান, কাল ও পরিবেশে।

পুবের আকাশে তখন সূর্যোদয়ের রক্তিম আভা। পাণ্ডুর কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে রাতজাগা তারার দল!

নিস্তব্ধ, সুন্দর ওয়ারুনা উপত্যকার বুক চিরে জেগে উঠল মেষশাবকের করুণ আর্তনাদ। অতঃপর সকালের স্নিগ্ধ পরিবেশকে কলঙ্কিত করে একাধিক মেষকণ্ঠে শুরু হল এক ভয়ার্ত চিৎকারের ঐকতান। প্রচণ্ড আতঙ্কে তারা আশ্রয় নিয়েছে খোঁয়াড়ের এক কোণে।

কিন্তু কেন এই আতঙ্ক!!!

উপত্যকার বুকে চোখ ফেরালে বোঝা যায় তার কারণ এখানে ওখানে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি ভেড়া। জীবিত নয়, মৃত। সংখ্যায় প্রায় তেইশটা। প্রত্যেকটা মৃত ভেড়ার গলার কাছে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। মাত্র চারটির বৃক্ক বা কিডনি, হত্যাকারী অথবা হত্যাকারীরা খেয়ে ফেলেছে। বাকি ভেড়াগুলোর মৃতদেহ প্রায় অক্ষত। বোঝা যায়, নিছক হত্যার আনন্দ চরিতার্থ করার খেয়ালেই খুনি এতগুলো নিরীহ পশুকে হত্যা করেছে।

উপত্যকার রক্ষক সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝলেন যে জন্তুগুলোর হত্যাকারী একটি বা দুটি বিশালাকৃতি ডিংগো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল লৌহবেষ্টনীর মধ্যবর্তী যে ছিদ্রপথ দিয়ে 'ডিংগো' তৃণভূমির মধ্যে প্রবেশ করেছে সেই ছিদ্রটি একটি ষাঁড়ের কীর্তি। হতভাগা ষাঁড়টাকে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে স্থানান্তরিত করা হল এবং ছিদ্রটিও মেরামত করা হল।

কিন্তু এই ঘটনার মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই জনৈক অশ্বারোহী

মেষরক্ষক লৌহজালিকার গায়ে অপর একটি নতুন ছিদ্র আবিষ্কার করে, এবং এবার বোঝা যায় যে সেটি কোনো অসাধারণ শক্তিশালী ডিংগোর কীর্তি। কারণ, সাধারণ কোনো ডিংগোর পক্ষে এই লোহার জাল দাঁত দিয়ে কেটে ফেলা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞ মেষপালক বুঝলেন যে, একই ডিংগো অনুরূপ পন্থায় বারবার আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ওয়ারুনা তৃণক্ষেত্রের ভেড়াগুলোর উপর। কারণ, কোনো ডিংগো একবার যেখানে শিকারের জন্য হানা দেয়, দেড় মাসের মধ্যে সেই জায়গায় সে পুনর্বার ফিরে আসবেই, এবং এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে বেষ্টনীর মধ্যবর্তী ছিদ্র মেরামত না করে, আগত রাত্রে খুনি অথবা খুনিদের অভ্যর্থনার জন্য বেড়ার সামনে পাতা হল ইস্পাতের ফাঁদ এবং মৃত ভেড়াগুলোর 'কিডনি'-তে প্রবেশ করিয়ে রাখা হল প্রচুর পরিমাণে 'স্ট্রিকনিন' বিষ। ওয়ারুনার মালিক সমস্ত আয়োজন শেষ করে নিশ্চিন্ত হলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে, তাঁর সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায়, সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মগুলিই শুধু তিনি জেনেছেন। সে নিয়ম ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না।

পরদিন প্রত্যুষে আশাভরা মন নিয়ে ছুটে এলেন পশুপালক। কিন্তু বেড়ার পাশে পাতা ইস্পাতনির্মিত ফাঁদের কাছে আসতেই চমকে উঠলেন তিনি। অবিশ্বাস্য!!!

ফাঁদে আটকে আছে লালচে-বাদামি রংয়ের কনুই পর্যন্ত কাটা একটা বাঁ-পা। সন্দেহ নেই কর্তিত পা-টির মালিক একটা ডিংগো, কিন্তু ফাঁদে আটকা পড়ে যে জন্তু, নিজের পা ছাড়াতে না পেরে, নিজে চিবিয়ে কেটে ফেলে চম্পট দেয়, সে কি ধরনের ভয়ংকর এবং নৃশংস প্রাণী!

লালচে বাদামি রঙের 'কাটা পা'-এর জন্যই উপত্যকায় ডিংগোটা পরিচিতি লাভ করল 'রেড কিলার' নামে—আক্ষরিক অর্থে যার মানে- দাঁড়ায় 'লাল খুনি'। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে 'রেড কিলার' ওয়ারুনার বুকে তার নৃশংসতার প্রথম স্বাক্ষর রাখল।

যারা এই কাহিনি পড়ছেন, আমি এইখানে তাঁদের কৌতূহল নিরসনের প্রয়োজনে 'ডিংগো' নামক প্রাণীটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানিয়ে রাখছি।

শ্বাপদবিরল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে 'ডিংগো' নামক এক ধরনের বুনো

কুকুরই একমাত্র বড়সড় শ্ব-দন্তী, মাংসাশী প্রাণী। এই হিংস্র সারমেয় বাহিনীর কবলে প্রতি বছরই প্রাণ হারায় বেশ কিছু সংখ্যক নিরীহ গৃহপালিত পশু। প্রধানত পশুপালনের উপর নির্ভর করেই যে সব পশুরক্ষক জীবন নির্বাহ করে তারাও এই স্বাভাবিক ক্ষতিটা স্বীকার করে নিয়েছিল। উপরন্তু, মাঝেমধ্যে তাদের পাতা ফাঁদে হামলাকারী দু-চারটে ডিংগো প্রায়শই ধরা পড়ত। তাই যদিও এই ছিঁচকে খুনিগুলোকে নিয়ে তাদের ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত, তবু এই বুনো কুকুরগুলো কখনোই উপত্যকায় ব্যাপক আতঙ্কের কারণ হয়নি। কিন্তু এই গতানুগতিক ধারাকে একটু পালটাতে ওয়ারুনার উপত্যকার বুকে আবির্ভূত হল ত্রাস সঞ্চারকারী বর্ণসঙ্কর একটা বিশালাকৃতি বুনো কুকুর —আমাদের কাহিনির নায়ক 'রেড কিলার'। কুকুর প্রজাতিতে, আমাদের আলোচ্য ডিংগোটা স্বভাবচরিত্রের দিক দিয়ে ছিল এক বিরাট ব্যতিক্রম। কাহিনির পরবর্তী পর্যায়ে তার আরও পরিচয় মিলবে।

দৈনন্দিন নিয়ম অনুসারে জনৈক ব্যক্তি একদিন সকালে দুধের বালতি হাতে নিয়ে গোয়ালে গিয়েছিল। কিন্তু গোয়ালের দরজা খুলতেই যে ভয়াবহ দৃশ্য তার দৃষ্টিগোচর হল তার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। গোয়ালের মধ্যে গরুটা রক্তাক্ত দেহে কোনোরকমে শ্বাস টানছিল আর তার পাশেই মাটিতে পড়ে ছিল মৃত গো-শাবকটির দেহ। প্রায় অক্ষত বাছুরটার মৃতদেহের মধ্য থেকে কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডটি হত্যাকারী উপড়ে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করেছে। শাবকটিকে হত্যাকারীর কবল থেকে বাঁচাবার চেষ্টায় গরুটিও অক্ষত নেই। গোয়ালঘরের জমি পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল যে হত্যাকারী মাত্র তিনটি পায়ের অধিকারী, অর্থাৎ আবার পুনরাবির্ভূত হয়েছে 'রেড কিলার'।

এই সময়ে অস্ট্রেলীয় সরকারও 'ডিংগো' সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কারণ ওই হতচ্ছাড়া কুকুরগুলোর জন্য প্রতি বছরই সরকারকে বেশ কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছিল। খুনি কুকুরগুলোর মাথাপিছু তাই সরকারের তরফ থেকে তিন পাউন্ড করে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সেই সঙ্গে ওয়ারুনার মালিক এবং প্রতিবেশী অপর দুই পশুপালকের ঘোষিত পুরস্কারের অঙ্ক মিলিয়ে 'রেড কিলার'-এর মাথার দাম গিয়ে উঠল পনেরো পাউন্ডে।

অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য নয়। ফলে দলে দলে পেশাদার ও অপেশাদার শিকারিরা এসে ভিড় জমাতে লাগল ওয়ারুনা উপত্যকায়, কিন্তু 'বিষাক্ত মাংসের টোপ' অথবা বিশেষভাবে পাতা ফাঁদ কোনো কিছুতেই প্রলুব্ধ হয়ে বা ভুলক্রমে ধরা পড়ল না ওই তে-ঠেঙা শয়তানটা, বরং শিকারিদের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল তার হত্যালীলা। শিকারিদের কৌশল এবং জন্তুটার সতর্কতার এই প্রতিযোগিতা এই ভাবে চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না, কিন্তু এরই মাঝে সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটিয়ে জন্তুটা হঠাৎ ওয়ারুনার বুক থেকে উধাও হল। বেশ কিছুদিন তার আর কোনো হদিস মিলল না। মেষ-পালকের দলও আস্তে আস্তে 'রেড কিলার'-এর অস্তিত্বের কথা ভুলে যেতে শুরু করেছিল, কিন্তু শয়তান ডিংগো-টা যে তার নিগ্রহের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়নি, সে কথা বুঝতে তাদের তখনও কিছু দেরি ছিল।

লাল খুনি-টার পুনরাবির্ভাবের ঘটনাটি যেমন ভয়ংকর, তেমনই চমকপ্রদ। এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে যে কুকুরটা সেই সময় হয়ে উঠেছিল সাংঘাতিক বেপরোয়া এবং অবশ্যই বিপজ্জনক।

উক্ত ঘটনার দিন জনৈক ব্যক্তি একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে ওয়ারুনা উপত্যকার একটি প্রান্তে পরিত্যক্ত ঘাসজমির আগাছা পরিষ্কার করছিল। লোকটির সাথী ছিল তার পোষা টেরিয়ার কুকুর। কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে লোকটি কুকুরটার অদ্ভুত আচরণে মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিল। একটা বিশেষ ঝোপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে টেরিয়ারটা মাঝে মাঝেই চিৎকার করে উঠছিল ভয়ার্ত স্বরে। ফলে, দু-একবার কৌতূহলী হয়ে লোকটি ঝোপের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ঠিকই কিন্তু একটা গিরগিটি ছাড়া সন্দেহজনক আর বিশেষ কিছু তাঁর চোখে পড়ল না। সুতরাং, সে সেদিকে আর বিশেষ লক্ষ্য না রেখে পুনরায় তাঁর কাজে মন দিল। একটু পরে, জমির একদিকের জঞ্জাল সাফ করা হয়ে গেলে, গাড়িটাকে জমির অন্য প্রান্তে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরতেই তাঁর চোখ পড়ল অদূরবর্তী ঝোপটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝতে পারল তাঁর পোষা কুকুরটার আতঙ্কের কারণ। ঝোপের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে লালচে বাদামি রঙের এক অতিকায় সারমেয়

দানব। হ্যাঁ কুকুর বটে, কিন্তু কোনোক্রমেই সেই কদাকার জীবটাকে চতুষ্পদের সংজ্ঞায় ফেলা যায় না, কারণ লোকটি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল যে জন্তুটার সামনের দিকের বাঁ-পা প্রায় কনুই পর্যন্ত কাটা, পক্ষান্তরে এটাকে ত্রি-পদ বলে অভিহিত করা যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। বিগতদিনের অভিজ্ঞতায় লোকটির বুঝতে দেরি হল না যে, ওটাই ওয়ারুনার জান্তব বিভীষিকা—সেই কুখ্যাত 'রেড কিলার'। জন্তুটার অবয়বে 'ডিংগো' এবং অস্ট্রেলিয়ার শিকারি কুকুর 'ক্যাঙারু-ডগ'-এর সাদৃশ্য প্রমাণ করছিল যে বিশালাকৃতি কুকুরটা একটা বর্ণসঙ্কর।

লোকটির উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ক্ষিপ্রগতিতে জন্তুটা এগিয়ে গেল টেরিয়ারটার দিকে। নিকটবর্তী হয়ে সে প্রথমে তার ঘ্রাণ গ্রহণ করল বারকয়েক, তারপরই প্রচণ্ড দংশনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুরটার কণ্ঠনালি চেপে ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে নিল। কয়েকটি করুণ মুহূর্ত। তারপরই হতভাগ্য টেরিয়ারটার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল সম্মুখবর্তী জমির উপর।

পোষা কুকুরটার এই শোচনীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে হতভম্ব মানুষটির সম্বিত ফিরে এল এতক্ষণে। হাতের সামনে অস্ত্র বলতে তাঁর ছিল একটা লোহার 'স্প্যানার' অর্থাৎ বল্টু খোলার যন্ত্র। সেটিকে হস্তগত করে সে ছুটে গেল এবং একের পর এক আঘাত হানতে লাগল আক্রমণকারী ডিংগো-টার মাথায়। 'স্প্যানার'-এর কঠিন আঘাত বুনো কুকুরটাকে বিশেষ কাবু করেছে বলে কিন্তু মনে হল না, কারণ সেই আঘাতকে

অগ্রাহ্য করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ভয়ংকর কুকুরটা টেরিয়ারের মৃতদেহটাকে পরিণত করল কয়েকটি মাংসের ফালিতে।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আক্রমণকারী মানুষটির প্রতি ডিংগোটার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার সে আততায়ীর কণ্ঠদেশ লক্ষ্য করে লাফ দিল। কোনোক্রমে নিজের বাঁ-হাত দিয়ে কুকুরটার মারাত্মক আক্রমণ প্রতিহত করে, প্রাণপণ শক্তিতে মানুষটি তার ডান হাতে ধরা ভারী স্প্যানারটা ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করে চলল 'খুনি'-টার মাথায় এবং দেহের উধর্বাংশে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধাতব আলিঙ্গনের যন্ত্রণাময় অনুভূতি থেকে পরিত্রাণ পেতে ডিংগো-টা অদূরবর্তী একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে পালাল দূরবর্তী জঙ্গলের আশ্রয়ে। শুধু তার আবির্ভাবের প্রমাণস্বরূপ পড়ে রইল বাচ্চা কুকুরটার ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিটির দেহে শ্বাপদের নখ ও দাঁতের সংস্পর্শে সৃষ্ট কয়েকটি কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের এই আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে গোটা ওয়ারুনার বুকে তীব্র উত্তেজনার সঞ্চার করে আবার গা ঢাকা দিল আমাদের কাহিনির নায়ক 'রেড কিলার'।

তবে বেশি দিনের জন্য নয়। মাত্র দিনকয়েকের মধ্যেই সে আবার হানা দিল উপত্যকার বুকে। এবার সে সঙ্গে করে জুটিয়ে এনেছিল তার এক সঙ্গিণীকে—সম্ভবত শিকারে তার এই একাকিত্ব আর ভালো লাগছিল না।

ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই সময় ভেড়াগুলোর পানীয় জল সরবরাহের জন্য একটি কূপ নির্মাণের কাজ চলছিল। কাজটির তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন মিঃ ডাউনি নামক একজন শ্বেতাঙ্গ। একদিন সকালবেলা মিঃ ডাউনি অশ্বারোহণে যখন তত্ত্বাবধানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে চারণভূমির উপর যে ভেড়াগুলো বিচরণ করছিল তাদের মধ্যে এক ধরনের ভয়ার্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেষপালের মধ্যে এই আকস্মিক চাঞ্চল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে তিনি সম্মুখস্থ চারণভূমির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। প্রথমে বিশেষ কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। কিন্তু দৃষ্টিসীমার পরিধি খানিকটা বিস্তৃত হতেই চোখে পড়ল...

দূরে, বেশ কিছুটা দূরে, তা কম করেও আধমাইলটাক তো হবেই,

দুটি সঞ্চরণশীল অবয়ব। ওই আকৃতি মিঃ ডাউনির পরিচিত। না! ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই—দুটো বিশাল আকৃতির ডিংগো। চারণভূমির সীমানা যেখানে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা তারই ধারে ঘোরাঘুরি করছে দুটো জানোয়ার। ডিংগো দুটোর মতিগতি মোটেই সুবিধার ঠেকল না ডাউনি সাহেবের। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টির বাইরে এসেই তিনি প্রাণপণে ঘোড়া ছোটালেন স্থানীয় মেষরক্ষককে খবর দিতে। প্রসঙ্গত এইখানে উল্লেখ্য যে, মিঃ ডাউনি যে পশুপালকটিকে খবর দিতে এসেছিলেন, 'তে-ঠেঙা শয়তান'-টা তাঁর চারণক্ষেত্রেই প্রথম হানা দেয়। ডিংগো দুটোর খোঁজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পশুপালক, মিঃ ডাউনিকে সঙ্গে নিয়ে একটা মোটরগাড়িতে চড়ে চারণভূমির দিকে দ্রুত রওনা হলেন। দুজনেই সঙ্গে নিলেন একটি করে রাইফেল।

চারণক্ষেত্রে পৌঁছে শ্বেতাঙ্গদ্বয় আবিষ্কার করলেন যে, ডিংগো দুটো ততক্ষণে লৌহজালের বেষ্টনী ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে এবং ইতোমধ্যেই একটা ভেড়াকে হত্যা করেছে।

অব্যর্থ লক্ষ্যে অগ্নিবর্ষণ করল মিঃ ডাউনির রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণশয্যা গ্রহণ করল তিন-পা ওয়ালা কদাকার জন্তুটা। আহত হলেও তার সে মূর্ছা ছিল সাময়িক। চকিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়েই সে তার তিন-পায়ে ভর করে অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটল লৌহবেষ্টনীর দিকে এবং অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্রাকার ছিদ্র পথ দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উধাও হয়ে গেল। আসল শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে শিকারিরা এবার নজর দিলেন দ্বিতীয় কুকুরটার দিকে। তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়ে সেটাও দৌড়ে পালাচ্ছিল। তবে লোহার জালের দিকে নয়, তার উলটোদিকে। পরপর দুটি গুলি ছুড়লেন মিঃ ডাউনি। লক্ষ্য ছিল প্রায় নির্ভুল, কিন্তু আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে এঁকেবেঁকে দৌড়ে ডিংগোটা দুটো বুলেটই এড়িয়ে গেল। চলন্ত মোটর থেকে লক্ষ্য নির্ভুল রেখে রাইফেল চালানো এক কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই, তাই যে মেষরক্ষক ভদ্রলোকটি গাড়ি চালাচ্ছিলেন. তিনি এক ভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁর খানিকক্ষণের প্রচেষ্টাতেই পরিকল্পনা সফল হল।

বাম্‌প্! বাম্‌প্!

গাড়ির পরপর দুটো চাকাই এক সময় ডিংগোটার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে ডিংগোটা শেষবারের মতো চেষ্টা করল তার আততায়ী দুজনকে আক্রমণ করার। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিকারির রাইফেলের লক্ষ্য এবার আর ব্যর্থ হল না। তপ্ত সীসার মৃত্যু দংশন কুকুরটাকে তৃণক্ষেত্রের উপর শুইয়ে দিল।

আগ্নেয়াস্ত্রের মৃত্যু আলিঙ্গন এড়িয়ে চম্পট দিল 'রেড কিলার', সঙ্গ দোষে মৃত্যুবরণ করল তার সঙ্গিণী। কিন্তু সেদিনের জন্য তিন-পা ওয়ালা খুনিটার কপালে আরও কিছু দুর্ভোগ জমা ছিল।

আহত অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে জন্তুটা যখন একটা ঝোপের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিল, সেই সময়ই সে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয়।

ঘটনার বিবরণী থেকে জানা যায় যে ওই সময়ে স্থানীয় এক কৃষক ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে শহর থেকে গ্রামের দিকে ফিরছিল। গাড়ির পাশে পাশে ছুটছিল কৃষকের পোষা ক্যাঙারু হাউন্ড—বিশালাকৃতি শিকারি কুকুর। দুর্ভাগ্যবশত ঝোপের আড়ালে বিশ্রামরত 'রেড কিলার' কৃষকের দৃষ্টিকে এড়াতে পারল না, এবং বুনো কুকুরটা দেখামাত্রই কৃষক তার পোষা শিকারি কুকুরকে লেলিয়ে দিল জন্তুটার দিকে। প্রভুর প্ররোচনায় হাউন্ডটাও ঝাঁপিয়ে পড়ল আহত, পরিশ্রান্ত তিনটি পা-ওয়ালা ডিংগো-টার উপর।

কিছুক্ষণ ধরে দুই সারমেয় দানবে লড়াই চলল, কিন্তু অবশেষে বন্য হিংস্রতা এবং রণকৌশলের কাছে পরাজিত হল শিক্ষিত কুকুর। কণ্ঠদেশে গভীর ক্ষতচিহ্ন বহন করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছিয়ে এল কৃষকের ক্যাঙারু-হাউন্ড। 'রেড কিলার' ততক্ষণে এগিয়ে চলেছে অদূরবর্তী জঙ্গলের দিকে। এই ধরনের বিরক্তিকর পরিস্থিতিকে বর্তমানে সে এড়িয়ে যেতে চায়।

কিন্তু কৃষক তাকে অত সহজে মুক্তি দিল না। গাড়িতে জোতা ঘোড়া খুলে নিয়ে সে জন্তুটার পশ্চাদ্ধাবন করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অনায়াসে অশ্বারোহী কৃষককে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গলের গভীরতর অঞ্চলে আত্মগোপন করল 'রেড-কিলার'।

পরবর্তী ক'টি মাস কাটল নির্বিঘ্নে। আঞ্চলিক অধিকাংশ মেষরক্ষকই বুঝতে পারল যে আহত অবস্থায় আত্মগোপনকালে মারা গেছে

শয়তানটা। ফলে সবাই মোটামুটি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। কিন্তু বৃথা আশা।

পূর্ব প্রথামতো 'রেড কিলারের' অজ্ঞাতবাসের সমাপ্তি ঘটল পর পর কয়েকটি দিনের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ভেড়াকে হত্যা করে। ওয়ারুনা উপত্যকার পশুপালকদের রাতের ঘুম আবার উধাও হল।

নতুন করে জন্তুটার মাথার উপর ঘোষিত হল পুরস্কারের মোটা অঙ্ক, নতুন করে উদ্ভাবিত হতে লাগল কৌশলের পর কৌশল, নতুন করে ওয়ারুনার বুকে ভিড় জমাতে লাগল পেশাদার ও অপেশাদার শিকারির দল, কিন্তু ব্যর্থতার ক্রমান্বয় পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু বাস্তব লাভ হল না।

ওয়ারুনা উপত্যকার মেষরক্ষকদের মনে তখন জমে উঠেছে হতাশার ঘন মেঘ, এমন সময় একদিন অকুস্থলে এসে হাজির হল জনৈক স্থানীয় শিকারি। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে এই শিকারিটি কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ছিল না, সে ছিল অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় আদিম অধিবাসী। উপরন্তু সে ছিল একজন বর্ণসঙ্কর।

'রেড কিলার' সম্পর্কে যাবতীয় ঘটনাবলী শুনে নিয়ে শিকারিটি তার প্রয়োজন জানাল—

—'গুড়! গুড় আছে?' ওয়ারুনার পশুপালককে প্রশ্ন করে লোকটি।

—'হ্যাঁ, তা আছে। কিন্তু...' হতভম্বের মতো উত্তর দেয় পশুপালক ভদ্রলোক।

—'তাহলে আর চিন্তা নেই', বেশ কিছুটা উৎফুল্লভাবেই বলে শিকারিটি, 'এবারে রেড কিলার নির্ঘাত মারা পড়বে।'

স্থানীয় শিকারির কৌশলটি ছিল অভিনব।

সেই দিন রাত্রে তাঁর নির্দেশমতো ভেড়াগুলোকে খোঁয়াড়ের মধ্যে না রেখে প্রান্তরের উপরই ছেড়ে রাখা হল। যদিও ওই প্রান্তরকে বেষ্টন করে ছিল সুকঠিন লৌহ-জালের প্রতিরোধ কিন্তু বিগতদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, ওই জাল কেটে চারণভূমিতে ঢুকে ভেড়া মারতে কোনোদিনই 'রেড কিলার' অসুবিধা বোধ করেনি।

শিকারির নির্দেশে বেষ্টনীকে ঘিরে আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে এইবার ছড়িয়ে দেওয়া হল ঘন তরলীকৃত গুড়, যার ফলে কোনো

ভূ-চর প্রাণীর পক্ষেই গুড়ের উপর পদাপর্ণ না করে ভেড়াগুলোর নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। গুড়ের উপর পা পড়লে চটচটে গুড় পায়ে আটকে যায় এবং কুকুর জাতীয় প্রাণীর স্বভাব অনুযায়ী তারা পায়ের থাবা চেটে চেটে ওই অস্বস্তিকর পদার্থটাকে দূর করতে চায়। গুড়ের মিষ্টি স্বাদ ভালো লাগার ফলে স্বাভাবিক কারণেই সে আরও বেশি গুড় চেটে চেটে খেতে শুরু করে। ঠিক এই পশু মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় শিকারিটি তাঁর ফাঁদ পেতেছিল।

শিকারিটির নির্দেশমতো সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে ওয়ারুনার পশুরক্ষক যখন সে দিন রাত্রে শুতে গেলেন তখন তাঁর মানসচক্ষে ভেসে উঠছিল পরদিন প্রত্যুষে চারণভূমির উপর ইতস্তত ছড়ানো আরও কতকগুলি নিরীহ ভেড়ার মৃতদেহ।

সারারাত কোনোক্রমে কাটিয়ে পর দিন খুব ভোরে অনুসন্ধান দল নিয়ে চারণক্ষেত্রে ছুটে গেলেন পশুপালক। সামান্য কিছুক্ষণের অনুসন্ধানে চোখে পড়ল একটি মৃতদেহ—লৌহজালের বেষ্টনীর ঠিক পাশে।

শিকারি তাঁর কথা রেখেছে। তীব্র বিষ 'গ্রাউন্ড সায়ানাইড' মিশ্রিত গুড়ের ফাঁদে পা দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে উপত্যকার বিভীষিকা 'রেড কিলার'।

দ্বৈরথ

সভ্যতার আদিমকাল থেকে মানুষ মানুষে শুরু হয়েছে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ, সংঘাত। কখনো তা এসেছে অধিকার রক্ষার প্রশ্নে, আবার কখনো রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সাকে চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে। কখনো এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হয়েছে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীর পন্থায়—অসিযুদ্ধে, আবার কখনো বা মহাযুদ্ধের বিস্তীর্ণ রণাঙ্গণে। মানুষের এই সংঘাতের কাহিনিকে লিপিবদ্ধ করে রচিত হয়েছে ইতিহাস।

কিন্তু মানুষই এই পৃথিবীর একমাত্র বাসিন্দা নয়। তাই পৃথিবীর এক বিরাট অংশ জুড়ে, জনপদের প্রান্তসীমায় বিস্তৃত রয়েছে যে বিশাল অরণ্য-সাম্রাজ্য, তার অধিবাসীরা সভ্যজগতের কলহ, সংঘাত অথবা রাজনীতির ধার ধারে না। ফলে, ওই রাজত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো চিরন্তন, অপরিবর্তিত। সভ্য জগতের সংশ্রবমুক্ত অরণ্য জগতের অধিবাসীরা জানে শুধু একটি কথা—"হয় মারো, নয় মরো"—শক্তিই এখানে একমাত্র যুক্তি।

আমাদের বর্তমান কাহিনিতে এই উক্তির যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে বলেই আমার ধারণা।

ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষে আগত জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারি মিঃ স্নিলকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভারতের মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত 'তক্‌তুরপানি' নামক পর্বতবেষ্টিত এক অরণ্য অঞ্চল আমাদের কাহিনির পটভূমি। উক্ত অঞ্চলের অরণ্যভূমি ছিল শ্বাপদসঙ্কুল। এই ধরনের জায়গা সাধারণত কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে খুব আরামপ্রদ এবং নিরাপদে বাসযোগ্য স্থান হিসাবে পরিগণিত হতে পারে না, ফলে ওই সময় মিঃ স্নিলক যে উক্ত অঞ্চলে নিছক ভ্রমণবিলাস বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য তাঁবু ফেলেননি, এ কথা সহজেই বোঝা যায়।

শ্বেতাঙ্গ শিকারির নিজের কথাতেই আমাদের কাহিনি শুরু করছি।

"তক্‌তুরপানিতে আমার তাঁবু ফেলার প্রধান কারণ হল, এই অঞ্চলে সম্প্রতি একটা বাঘ প্রায়ই স্থানীয় গাড়োয়ানদের উপর হানা দিয়ে ফিরছিল এবং ক্রমে সেটা একটা নরখাদকে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্য নরখাদক বাঘের মতো স্বভাবচরিত্রের এটাও ছিল প্রায় একইরকম এবং অসম্ভব ধূর্ত। আমি নিজে বহুবার জন্তুটাকে 'মোষের টোপ' দিয়ে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনোবারই সেটা ফাঁদে পা দেয়নি, অসম্ভব বুদ্ধির জোরে মৃত্যুকে এড়িয়ে গেছে। আর আশ্চর্য! বাঘটাকে কোনোদিনই জোৎস্নারাতে দেখা যেত না। চাঁদের আলোয় সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে আমার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি আর আমার পাঠান সঙ্গী নাদির খান একটা মতলব আঁটলাম।

আমরা জানতাম যে, নিকটবর্তী জলাশয়ের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি ক্ষীণস্রোতা স্রোতস্বিনী রয়েছে। সুতরাং ওই জলাশয়ের আশেপাশে কোনো জায়গায় অপেক্ষা করলে আমরা নিশ্চিত বাঘটার দেখা পাব, কারণ, জলপান করতে তাকে ওই জলাশয়ে আসতেই হবে।

আমাদের অভিপ্রায় মতো যখন আমি, নাদির খান এবং মাথু গণ্ড নামে একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক, এই তিনজনে জলাশয়ের পাড়ে এসে পৌঁছলাম তখন অরণ্যের পশ্চিমপ্রান্তে রক্তসূর্যের আভা ধীরে ধীরে

বিদায় নিচ্ছে। পরিবর্তে নেমে আসছে রাত্রির কৃষ্ণ আবরণ। আমরা আশ্রয় নিলাম চারদিক কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট্ট অথচ পরিষ্কার একখণ্ড জমির উপর। আমাদের উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে সম্মুখের বিস্তৃত জলাশয়ের পাড় পরিষ্কার দৃশ্যমান। সময় আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল গভীরতর রাত্রির অপেক্ষায়।

রাত প্রায় ন'টা...

জলাশয়ের তীরবর্তী ফাঁকা জমির উপর আত্মপ্রকাশ করল কয়েকটি সচল ছায়া। একটি—দুটি—তিনটি—চারটি, চার-চারটি অতিকায় মার্জার। বাবা, মা এবং দুটি প্রায়-প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ প্যান্থার পরিবার। দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট তরুণ-বয়স্ক প্যান্থার এবং মা-প্যান্থারের সহযোগ দলটিকে নির্দ্বিধায় বেশ একটু বিপজ্জনক বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপরন্তু, পরিবারের কর্তা পুরুষ প্যান্থারটি আকৃতিতে ছিল বিশাল। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় বসে বসে আমরা সেই অতিকায় মার্জার বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। হঠাৎ, জলপানে বিরত হয়ে পুরুষ প্যান্থারটি পাড়ের দিকে ঘাড় ফেরাল। বুঝলাম, আমাদের চোখ ও কানের অগোচরে কোনো কিছুর অবস্থিতি তাকে উৎকর্ণ করে তুলেছে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। স্বল্পকালের মধ্যেই একটি ক্ষীণ অথচ দ্রুত খুরের শব্দ আমাদের সজাগ কর্ণেন্দ্রিয়ে আঘাত করল। খুরের শব্দ ক্রমশ স্পষ্টতর হল এবং অবশেষে অরণ্যের অভ্যন্তর থেকে আত্মপ্রকাশ করল এক বিরাট বন্য বরাহ।

জলাশয়ের পাড়ে একটু দূরেই চার-চারটি চিতাবাঘের মারাত্মক সান্নিধ্য যে তাকে খুব একটা বিচলিত করেছে এমন মনে হল না, কারণ ফোঁটা-কাটা বিড়ালগুলোর দিকে না তাকিয়েই সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ! করতে করতে স্রোতস্বিনীর নিকটবর্তী হয়ে জলপানে মনোনিবেশ করল।

অন্য দিকে পুরুষ প্যান্থারটার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। রবাহুত হতচ্ছাড়া জানোয়ারটার মতিগতি সম্ভবত তার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে থাকবে। তার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এপাশে ওপাশে আন্দোলিত হয়ে অধীর আক্রোশে আছড়ে পড়ছিল মাটির উপর। যদিও দলগত শক্তির বিচারে বন্য শূকরটা ছিল দুর্বলতর প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু প্রাথমিক পর্যায়ের লড়াই-এর কথা চিন্তা করেই পুরুষ প্যান্থারটি বরাহটাকে আক্রমণ করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছিল। বোধহয় ওই ছোপওয়ালা বেড়ালগুলোকে শূকরটার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সে জলপানে বিরত হয়ে একবার অনতিদূরে দণ্ডায়মান জন্তুগুলোর দিকে মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করল। তারপর বিদ্যুৎগতিতে সোজা তেড়ে গেল গোটা দলটাকে লক্ষ্য করে।
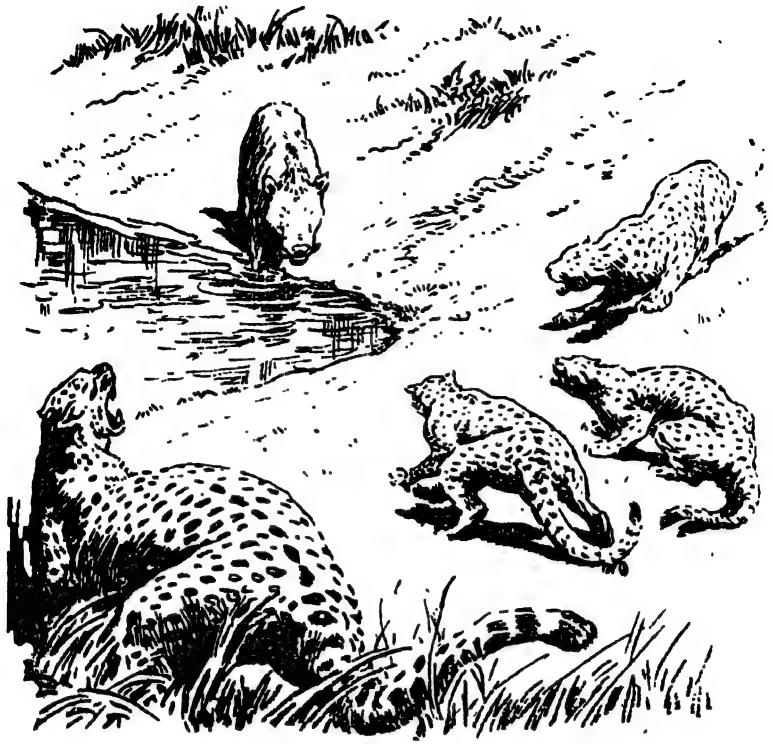
পরিণতি হল আশ্চর্য রকমের হাস্যকর।

বন্য বরাহের তীব্র গতি আক্রমণ এবং তার ওষ্ঠের প্রান্তদেশে শাণিত কিরীচের মতো ভয়ংকর দাঁত দুটির সংস্পর্শে এলে তার ফল কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে মার্জার বাহিনীর সম্যক ধারণা ছিল বলেই মনে হল। বন্যপ্রাণীর তীব্র অনুভূতি দিয়ে ততক্ষণে তারা বুঝে নিয়েছে যে এ শিকার সহজ নয়—এর মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ফলে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রণে ভঙ্গ দিল চার-চারটি জানোয়ার। আপদ বিদায় হওয়াতে নিশ্চিন্ত মনে ফিরে এল বন্য বরাহ। তারপর আবার জলপানে মনোনিবেশ করলো যথারীতি। জলপান শেষ করে এবং জলাশয়ের তীরবর্তী গাছের গায়ে গা ঘসে প্রায় আধঘণ্টা পরে সে ধীরে ধীরে স্থানত্যাগ করল...

নরখাদক বাঘটির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সামান্য তন্দ্রাভাব এসেছিল মিঃ স্নিলকের।

আচম্বিতে ভয়ংকর এক গর্জনধ্বনিতে কেঁপে উঠল স্রোতস্বিনীর তীরবর্তী অরণ্যভূমি। মিঃ স্নিলক এবং তাঁর সঙ্গীদের মনে হল যে বাঘটা বোধহয় ঠিক তাঁদের পিছনেই আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। আবার সেই প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি। একবার নয়, পর পর কয়েকবার। তারপর সেই গর্জনের সঙ্গে মিশল এক বিজাতীয় ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। ভুল ভাঙল শিকারিদের, কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না আসল ঘটনা। জলাশয়ের পাড়ে ঝোপের মধ্যে শিকারের জন্য অপেক্ষমান বাঘ মারাত্মক ভুল করেছে—বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো আক্রমণ করে বসেছে পূর্বোক্ত বন্য শুকরটিকে। মিঃ স্নিলক মনে মনে বেশ খানিকটা পুলকিতই হলেন। বাঘটা যদি তাঁর প্রার্থিত নরখাদকটা হয়ে থাকে তাহলে সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর পাল্লায় পড়েছে।

অরণ্য জীবনের এই বিরল মুহূর্তগুলো খুব কম ভাগ্যবানের জীবনেই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হিসাবে সংগৃহীত হয়, সুতরাং মিঃ স্নিলকের পক্ষেও লোভ সামলানো সম্ভব হল না। ধীরে ধীরে তাঁরা তিনজনই তাঁদের আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেলেন অকুস্থলের দিকে, যেখানে মৃত্যুপণ দ্বৈরথে অবতীর্ণ হয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—ভারতীয় অরণ্যভূমির দুই মহারথী, কেঁদো বাঘ ও বুনো শুয়োর। খানিক দূর এগিয়েই লড়াইয়ের প্রথম চিহ্নটি চোখে পড়ল। সামনের মাটিতে একখণ্ড সাদা চকচকে বস্তু। পাণ্ডুর চাঁদের আলো বস্তুটির উপর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে অন্ধকার রাত্রেও সেটি শিকারিদের দৃষ্টিগোচর হল। মিঃ স্নিলক কৌতূহলী হয়ে বস্তুটিকে তুলে নিলেন—একখণ্ড চর্বি। বরাহের রুক্ষ গাত্রচর্মের সঙ্গে সংলগ্ন চর্বিখণ্ডটি তখনও থিরথির করে কাঁপছিল।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বের ফলাফল।

রক্তের রেখা এইখান থেকে এগিয়ে চলেছে বিক্ষিপ্ত রণক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে। মিঃ স্নিলকের সঙ্গী পথপ্রদর্শক মাথু গণ্ড রক্তের রেখাকে অনুসরণ করে সর্বপ্রথমে অগ্রবর্তী হল। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন শ্বেতাঙ্গ মিঃ স্নিলক এবং তাঁর পাঠান সঙ্গী নাদির খান। অরণ্য জীবন সম্পর্কে মাথু গণ্ডের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং তীব্র অনুভূতির সাহায্যে সমগ্র ঘটনা অনুমান করতে তাঁর একটুও অসুবিধা হল না।

ক্ষুধার্ত বাঘ যখন শিকারের আশায় এবং জলপান করতে পূর্বোক্ত জলাশয়ের দিকে আসছিল, তখন বেশ কিছুটা দূর থেকেই জলাশয়ের পাড়ে বন্য বরাহের উপস্থিতি তাঁর তীব্র অনুভূতিতে ধরা পড়ে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদ শিকারের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়। সাধারণত কোনো বাঘই একটি পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় বুনো শুয়োরকে আক্রমণ করার কথা চিন্তা করে না, কিন্তু যেহেতু এই বাঘটি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল, সেই কারণেই এই ব্যতিক্রমটি ঘটে যায়। শূকরের অবস্থিতি জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘটি ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে এবং জলপান শেষ করে যখনই শূয়োরটি ফেরার পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখনই অকস্মাৎ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ হয়তো শূকরটিকে একটা গৃহপালিত গরু অথবা মোষের মতোই অনায়াসে নিহত করবে বলে চিন্তা করেছিল, কিন্তু আক্রান্ত বরাহ তার সে চিন্তায় সায় দিল না। ফলে আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বরাহ তার প্রচণ্ড শক্তিকে প্রয়োগ করে নিজেকে শত্রুর কবলমুক্ত করতে খানিকক্ষণের প্রচেষ্টায় সে সাফল্য লাভ করে এবং পরমুহূর্তে শত্রুর দেহকে সন্ধান করে বারবার শূন্যে আন্দোলিত হয় বরাহের দুটি শাণিত কিরীচ। ভয়ঙ্কর

দাঁত দুটোর মারাত্মক সান্নিধ্যে এসে, বাঘ কিছুক্ষণের মধ্যেই উপলব্ধি করে নিজের নির্বুদ্ধিতার গুরুত্ব, কিন্তু জঙ্গলের আইনে প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ খুব কমই পাওয়া যায়। ফলে বরাহের দন্তাঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত বাঘ যখন রণভূমি ছেড়ে পশ্চাদপসরণ করে তখন তার অন্তিম সময় নিকটবর্তী। কিন্তু 'বেড়ালের ন'টি প্রাণ'। সুতরাং সেই অতিকায় মার্জার মরণাহত হয়েও সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেনি। আরও কয়েকবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর টুকরো টুকরো সংঘাতে রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। গাছের গায়ে, ঝোপে-ঝাড়ে ইতস্তত চোখে পড়ল টুকরো টুকরো ঝুলে থাকা হলুদ কালো পশমী গাত্রচর্মের ফালি। আর একটু এগোতেই দ্বৈরথ যুদ্ধের অন্যতম নায়কের দেখা মিলল। শাণিত কিরীচের মতো দাঁতের নিষ্ঠুর সঞ্চালনে ছিন্ন-ভিন্ন নরখাদকের মৃতদেহ। শুধুমাত্র করোটি এবং পায়ের নখগুলি ছাড়া দেহে আর কিছুই প্রায় অক্ষত নেই। মিঃ স্নিল সেই অক্ষত অংশগুলিই সংগ্রহ করলেন এই দুর্লভ দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে।

এরপর বরাহের সন্ধান।

রক্তের ঘনত্ব, বর্ণ এবং পরিমাণে বোঝা গেল যে বরাহের অবস্থাও খুব একটা ভালো কিছু নয়। সেও সাংঘাতিকভাবে আহত।

মিঃ স্নিলক এবং তাঁর সঙ্গীরা আশা করলেন যে বাঘের মৃতদেহের খুব কাছাকাছিই শুয়োরের সন্ধান মিলবে। অবশ্যই মৃত অবস্থায়।

কিন্তু আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ওই বুনো শূকর।

ঘন রক্তের চিহ্ন ধরে শিকারি দল যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর শূকরটিকে একটি জলাশয়ের পাড়ে আবিষ্কার করলেন, তখন মূল রণক্ষেত্র ছাড়িয়ে তাঁরা পাক্কা ছ'ছটি মাইল অতিক্রম করে এসেছেন।

শূকরটির অন্তিম যন্ত্রণা শিকারিদের কারুরই সহ্য হচ্ছিল না। ফলে মিঃ স্নিলকের রাইফেল অগ্নিবর্ষণ করে বন্য বরাহকে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিল।
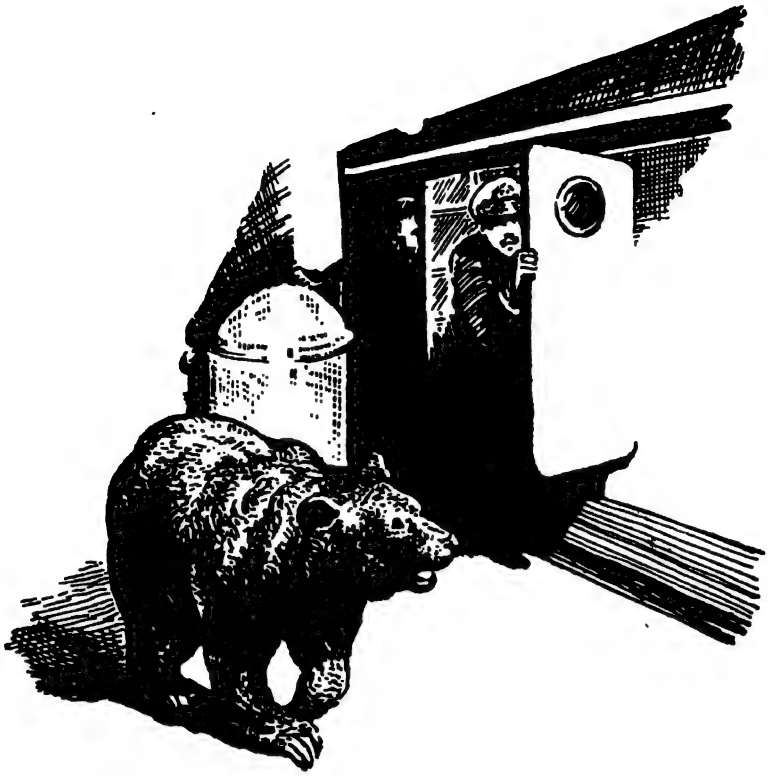
সাগরের বুকে চিড়িয়াখানা

'বাঘে-বলদে একঘাটে জল খায়।' রাজা-উজিরের প্রতাপ কতখানি তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে লোকের মুখে মুখে এই প্রবাদ বাক্যটা প্রচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কেন বলা হল না 'বাঘে-মানুষে একঘাটে জল খায়?' কারণটা ঠিক জানি না, তবে এইটুকু বুঝি যে, বাঘ এবং বলদে একসঙ্গে জল খাওয়াটা যখন এতই অপ্রচলিত ব্যাপার, অর্থাৎ বলদের মতো বলবান জন্তুই যখন বাঘের সঙ্গে জল খেতে বা কাছে ঘেঁষতে এত নিমরাজি, তখন মানুষের ক্ষেত্রে তো কোনো কথাই আসে না।

কিন্তু বাস্তব মাঝে মাঝে প্রবাদ অথবা গল্পকেও ছাপিয়ে যায়। তাই, যদিও বন্য ব্যাঘ্র ও মানুষের একসঙ্গে পাশাপাশি জলপান করার কথা আমার জানা নেই, কিন্তু যদি আমি বলি বাঘে-মানুষে নির্বিবাদে দিব্যি সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করছে তা হলে হয়তো অনেকেই চমকে উঠবেন। আর ভ্রমণের পক্ষে স্থানটি বড় মনোরম। অতলান্ত সাগরের বুকে ধাবমান একটি জাহাজের ডেক।

ঘটনাটা বিস্তারিতভাবে বলা যাক। কারণ, সেই আজব চিড়িয়াখানায় সে দিন শুধুমাত্র বাঘ আর মানুষই মুক্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করেনি, পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি চরিত্রকেও আমরা ক্রমশ আবিষ্কার করব।

সন—ইংরেজি ১৯২৮। 'এস, এস, ফোর্ডসডেল' নামে একটি জাহাজ লন্ডন থেকে ছুটে চলেছিল আটলান্টিক মহাসাগরের বুক চিরে অস্ট্রেলিয়ার তটভূমির উদ্দেশ্যে। জাহাজের 'বিশেষ যাত্রী'-দের
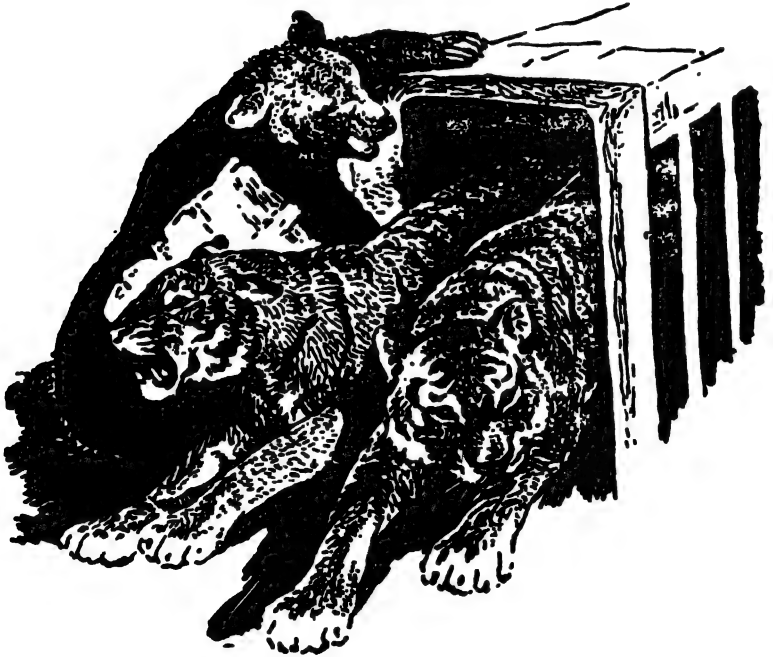
তালিকায় ছিল একজোড়া বিরাট ভাল্লুক, একটা অজগর সাপ, প্যান্থার, তুষারচিতা বা 'স্নো-লেপার্ড', বাঁদর, কতকগুলি ব্যাজার (ছোট ছোট মাংসাশী প্রাণী), কোকিল ও অন্যান্য কয়েক জাতের পাখি। আর ছিল দুটো পূর্ণবয়স্ক বাঘ।

জাহাজ ছাড়বার সময়ই খাঁচাগুলোর গড়ন ও কাঠামো বিশেষ সুবিধার ঠেকছিল না। কয়েকজন যাত্রী এমনকী স্বয়ং ক্যাপ্টেনও একবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, যাত্রাপথে জন্তুগুলো খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাতে পারে। কিন্তু নাবিকরা তাঁদের আশ্বস্ত করল এই বলে যে, বিগত বহুকাল ধরেই এই খাঁচাগুলোতে করে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ার পৃথিবীর বহু চিড়িয়াখানায় চালান দেওয়া হয়েছে এবং কোনো ক্ষেত্রেই কোনো বিপদ ঘটেনি। যাত্রীদের এবং ক্যাপ্টেনের ধারণা নিতান্তই অমূলক...

ঘটনার সূত্রপাত ঘটল একদিন রাত্রে কয়েকটি ব্যাজারের মুক্তিলাভের মধ্যে দিয়ে। কী করে কে জানে, ব্যাজারগুলো তাদের খাঁচা ভেঙে সেই রাত্রে মুক্তিলাভ করে এবং অচিরেই কোকিলের খাঁচা আক্রমণ করে পাখিগুলোকে নির্বিবাদে পেটে চালান করে। সকালে পাখির খাঁচায় কোকিলগুলোর ছড়ানো পালক দেখে হত্যাকারীদের খোঁজ পড়ে যায়, কিন্তু ভোঁদড়ের মতো আকৃতিবিশিষ্ট ওই হতচ্ছাড়া জানোয়ারগুলোকে ধরতে গিয়ে নাবিকদের বারবার নাজেহাল হতে হয়। এরই মধ্যে জনৈক নাবিক একটা গর্তের মধ্যে থেকে ব্যাজার ধরতে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে বসে। ক্ষুদে বিচ্ছুটা নাবিকটার মুখের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন ভাবে তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে দেয় যে, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে 'ব্যাজার' অনুসন্ধানে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয় এবং অচিরেই উপলব্ধি করে যে, এই ধরনের অসম্ভব পাজি জন্তু-জানোয়ার ধরা কখনোই নাবিকদের কর্তব্যকর্মের মধ্যে পড়ে না।

এই ঘটনা যখন ঘটে তখন 'ফোর্ডসডেল' ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ভারত মহাসাগরের বুকে পাড়ি জমাতে।

ভারত মহাসাগরের উষ্ণ জলবায়ুতে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের কিছুটা অস্বস্তি হওয়ারই কথা। ফলে ভারত মহাসাগরের দিগন্তবিস্তৃত নীল জলের উপর দিয়ে জাহাজ যখন এগিয়ে চলেছে তখন জাহাজের

অভ্যন্তরে দুজন যাত্রী বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল। দুজনই শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী—দুটি বিরাটকায় ভাল্লুক।

উষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ায় অনভ্যস্ত ভালুক দুটো ক্রমান্বয়ে অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল এবং বারবার আঘাত করতে লাগল খাঁচার নড়বড়ে শিকগুলোর উপর। অমিতশক্তির অধিকারী দুই বিপুলদেহ বন্য প্রাণীর ক্রমাগত আঘাতে ধীরে ধীরে খাঁচার প্রতিরোধ ক্ষয়ে আসতে লাগল এবং এই ঘটনার পরিসমাপ্তি হল একটি রাতে, যেদিন ডেকের উপর 'চার্ট' দেখতে ব্যাপৃত জনৈক নাবিকের দেখা হয়ে গেল অদূরে সঞ্চরণশীল দুটি বিপুলবপু ছায়ার সঙ্গে। মুহূর্তপূর্বের মনোসংযোগ ছিন্ন করে এবং চার্ট সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন হয়ে সে যে গতিবেগ এবং দেহ-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি করে দৌড় দিল, সেটি দৌড়বীরদের আদর্শ হতে পারত।

এক দৌড়ে সে যখন উপরের ডেকে এসে পৌঁছল তখন জাহাজের একজন মেট সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতীতের কোনো সুখকর স্মৃতির রোমন্থন করছিল—সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছিল একহাতে ধরা কফির পেয়ালায়। মোট কথা, সে একটা অলস, কর্মহীন পরিবেশকে বেশ একা একা উপভোগ করছিল। এমন সময়ে বেগে ধাবমান ব্যক্তিটি এসে তাকে ওই ভাল্লুক দুটোর কথা জানাল। 'সাংঘাতিক ব্যাপার—বলে কি!' এখনই কোনো একটা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন মেট।

কিন্তু সেই কাজে এগোতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল। অপসৃয়মান মানুষটির পিছু পিছু একটা কৌতূহলী ভালুক চলে আসছিল উপরের ডেকে—ডেকের সিঁড়ির উপরই তার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল মেট-এর। ভাল্লুকটার কাছে সম্ভবত, আলাপ পরিচয়ের প্রাথমিক পর্বটা সেরে নেওয়া ভদ্রোচিত বলে মনে হয়ে থাকবে। কিন্তু সে দু-এক পা এগোতেই ডেকের উপরে মেট ভদ্রলোক যেভাবে 'আস্ত ডিমের পোচ মার্কা' দু-দুটো গোল গোল বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, ভালুককে হতাশ হতে হল। সে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে তার সঙ্গীর সাথে মিলিত হতে চলে গেল।

ততক্ষণে জাহাজের বিপদসূচক ঘন্টি বেজে উঠেছে। নাবিকরাও প্রায় সবাই এসে ডেকের উপর জড়ো হয়েছে মুক্ত ভালুক দুটোকে দেখবার আগ্রহে।

ভাল্লুকের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই, বোধ করি এই বিষয়ে খুব কম লোকই পড়াশোনা করেছেন। সুতরাং সঠিক করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবু যতদূর মনে হয় ডেকের উপর অতগুলো লোকের সমাবেশ তাদের কাছে ভালো ঠেকছিল না। ফলে মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা দুটো বাঘ, দুটো বিরাট বিরাট ইঁদুর, বেশ কয়েকটা বানর এবং অন্যান্য আরও কয়েকটা জন্তুকে বন্ধন দশা থেকে মুক্তি দিল। বোধ করি তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যত জন্তু মুক্তিলাভ করবে, নিজেদের মুক্ত বিচরণের সময়সীমাও তত দীর্ঘতর হবে...

ওই দিনই বিকেলের দিকে ঘটল আরেক অঘটন। জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সেই সময় জাহাজের ডেকের উপর পায়চারি করছিলেন। এমন সময়ে গুটি গুটি পায়ে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা পাতাতে একটি সদ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত বাঘের সেখানে আবির্ভাব ঘটে। বাঘের মতলব বিশেষ খারাপ ছিল না। কিন্তু শার্দুল সন্দর্শনে ভদ্রলোক অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে কোমরের খাপ থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাঘটার উদ্দেশ্যে গুলি চালালেন। গুলির নিশানা কতদূর নির্ভুল ছিল সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, কিন্তু ভদ্রলোকের এই ব্যবহারে বাঘটি অত্যন্ত বিরক্ত হল, এবং 'মানুষ' নামক জীবটি যে অত্যন্ত হীনচেতা ও অভদ্র সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে ওই স্থান ত্যাগ করল। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছিল যে, বাঘটির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত গুলিতে জাহাজেরই একটা বিড়ালের দেহান্তর ঘটেছিল। ভদ্রলোকের এলেম আছে!

ইতিমধ্যে জাহাজের নাবিকরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল মুক্তিপ্রাপ্ত জন্তুগুলোকে ধরার জন্য। দুই ভদ্রলোক—মিঃ দেওয়ার এবং জাহাজের জনৈক কর্মচারীর প্রচেষ্টায় বাঘ এবং ভালুকদের ধরা হল। প্রথমে জাহাজের কারিগরকে দিয়ে আগেরগুলোর চেয়ে অনেক শক্ত এবং টেকসই খাঁচা বানানো হল। তারপর জাহাজের কর্মচারীটির পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বাঘ দুটিকে রসাল ভেড়ার মাংসের টোপ দিয়ে প্রলুব্ধ

করে আটকানো হল, এবং তারপর নাবিকদের সাহায্যে মিঃ দেওয়ার ভালুক দুটোকে ধরলেন দড়ির ফাঁস দিয়ে। এই চারটে জন্তুকে আটকে জাহাজের নাবিকরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বিপজ্জনক পরিস্থিতি কাটানো গেছে।

অন্য দিকে কতকগুলো বাঁদর পাখির খাঁচা ভেঙে সেগুলোকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, কিন্তু বাঘ-ভালুকের দিকে মনোযোগ থাকার জন্য এই সামান্য ঘটনাটা বিশেষ কেউই লক্ষ্য করল না। সে যাই হোক, ক্রমে ক্রমে সবক'টা ছোটখাটো জন্তুকেই ধরা হল—কেবল ধরা পড়ল না একটা বাঁদর। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যখন ওই লক্ষ্মীছাড়া প্রাণীটাকে ধরা গেল না, তখন ক্যাপ্টেন বেশ বিরক্ত হয়েই 'জীবিত অথবা মৃত' যে কোনো অবস্থায় সেটাকে ধরার জন্য আদেশ জারি করলেন।

তখন পুবের আকাশে সবে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। জলপোত 'এস্ এস্. ফোর্ডসডেল' ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অস্ট্রেলিয়ার তটভূমির দিকে। ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। মিঃ দেওয়ার ও জাহাজের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডেকের উপর দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ জাহাজের উলটোদিক থেকে ভেসে এল এক প্রাণান্তকর চিৎকার এবং একটু পরেই আবছা আলোতে তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল দ্রুতবেগে ধাবমান একটি সাদা এ্যাপ্রন ও টুপি—জাহাজের বাবুর্চি! ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করতে করতে সে ওই দুই ব্যক্তির দিকেই ছুটে আসছে। কাছে আসতে আর্তনাদ শব্দে রূপান্তরিত হল—ক্রমান্বয়ে সে চিৎকার করে চলেছে—ভূত! ভূত!...

'—ভূত! ভূত কোথায়!' বেশ একটু আশ্চর্য হলেন মিঃ দেওয়ার ও তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোক।—'আজ্ঞে হ্যাঁ! আমি যখন প্রাতরাশ বানাতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলাম তখনই ভূতটাকে প্রথম দেখতে পাই। আমাকে দেখেই ভূতটা তেড়ে এল, আমি কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি,' আতঙ্কিত স্বরে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয় বাবুর্চিটি।

একটু একটু ভয় যে করছিল না, সে কথা বললে ভুল হবে। কিন্তু উভয় ব্যক্তিই ভূতের সন্ধানে যাত্রা করলেন। বেশি দূর এগোতে হল

না, দূর থেকে তাঁদের চোখে পড়ল ডেকের উপর সঞ্চরণশীল কোনো 'কিছুর' উপর। অন্ধকারে তার অবয়ব প্রায় অদৃশ্য; একমাত্র জ্বলন্ত চোখ দুটো ছাড়া। বাবুর্চির ভয় অমূলক নয়। তবু সাহসে ভর করে এগিয়ে গেলেন মিঃ দেওয়ার। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট লাফে ডেকের এক প্রান্তে এসে পড়ল আর তারপরই তরতর করে মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল বহু উর্ধ্বে। এতক্ষণে ভূতের রহস্য পরিষ্কার হল দুজনের কাছে। ভূত আর কেউ নয়। হতচ্ছাড়া বাঁদরটা।

মিঃ দেওয়ার ডেকের উপর থেকে কয়েকটা কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে মাস্তুল বেয়ে খানিকটা উঠে গেলেন। তারপর বানরটাকে লক্ষ্য করে ছুড়তে লাগলেন ওই কাঠের খণ্ডগুলো। প্রথম আর দ্বিতীয়টা লাগল না বটে, কিন্তু তৃতীয় টুকরোটা গিয়ে সজোরে আঘাত করল বাঁদরটার গায়ে। বেশ জোরেই টুকরোটা ছুড়েছিলেন মিঃ দেওয়ার, ফলে লক্ষ্যবস্তু স্থানচ্যুত হয়ে সোজা ডেকের উপর পড়তে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূপতিত হল না বাঁদরটা। দেওয়ার মাস্তুলের যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে সেইখানে একটা লোহার শিক সোজা বেরিয়ে এসেছিল মাস্তুলের গা থেকে। সেই বেরিয়ে থাকা লোহার দণ্ডটা ধরে নিয়ে নিজের 'অধঃপতন' রোধ করল বানরটা! পরক্ষণেই, মিঃ দেওয়ার কিছু বুঝবার আগে তাঁরই হস্তগত একটি কাঠের টুকরো কেড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পাজি জানোয়ারটা সজোরে আঘাত করল তার আততায়ীকে, আর সেই সঙ্গে দেওয়ারের গালের উপরও এসে পড়ল এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। এবার আর সহ্য হল না মিঃ দেওয়ারের। বাঁদরের হাতে এই নিগ্রহ তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দিল। ফলে তিনিও হতভাগা বাঁদরটার গালে কসিয়ে দিলেন এক বিরাশি সিক্কার চড়। চড়ের ওজনটা নেহাত মন্দ ছিল না। এরপর শুরু হল বানর আর মানুষে পারস্পরিক চপেটাঘাত পর্ব। এই সুযোগে দেওয়ারের অপর সঙ্গী মাস্তুল বেয়ে উঠে চট করে ধরে ফেললেন বাঁদরটাকে, তারপর উভয়ে মিলে তাকে নামিয়ে এনে খাঁচায় বন্দি করলেন।

ঘণ্টা কয়েক পরে ফ্রিমেনটেল বন্দরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল জলযান 'এস. এস. ফোর্ডসডেল'।

আবগারী বিভাগের কর্মচারী প্রশ্ন করলেন জাহাজের ক্যাপ্টেনকে।

সেই সনাতন প্রশ্ন—'যাত্রাপথে কী কোনো অসুবিধার কারণ ঘটেছিল?'

—'তা কিছুটা হয়েছিল বলতে পারেন,' স্বাভাবিক স্বরেই উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন, 'ওই কয়েকটা জন্তু খাঁচা ভেঙে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, সেগুলোকে আবার আমাদের ধরে খাঁচায় পুরতে হয়েছে।'
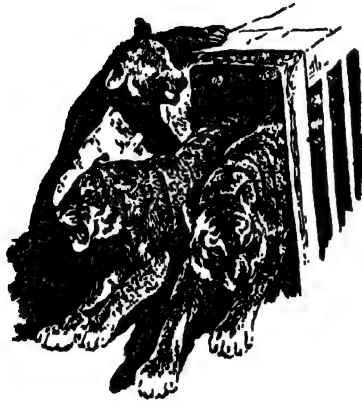
‘বেসার বুয়াইয়া!’

মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সেলান্‌গর উপদ্বীপ। আর এই উপদ্বীপকে বেষ্টন করে চলে গিয়েছে বারজুনটাই নদী। অন্যান্য ঋতুতে ধীরে প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী বলে মনে হলেও, বর্ষাকালে তরঙ্গ-ভয়াল খরস্রোতা এই নদীর ভিন্ন রূপ।

১৯২৭ সালের জুলাই মাসে, এই বারজুনটাই নদীর উপর একটি সেতু তৈরির কাজ চলছিল। কাঠের গুঁড়ির উপর সাময়িকভাবে সেতুটার প্রাথমিক কাঠামো স্থাপন করা ছিল। এই কাজে কয়েকজন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং অভিজ্ঞ চিনা কুলি নিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সমস্ত সেতুটির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন দুই শ্বেতাঙ্গ কুশলী ইঞ্জিনিয়ার— এন্সান স্মিথ এবং জনৈক রুশ—‘ডি’। কাহিনির বর্ণনা দিতে গিয়ে স্মিথ সাহেবও ওই রুশ ইঞ্জিনিয়ারের নাম গোপন করে গিয়েছেন, বিশেষ কোনো কারণে তাঁকে ওই ‘ডি’ নামেই অভিহিত করেছেন পুরো ঘটনায়। এই রুশ ইঞ্জিনিয়ারটি বহু দিন চিন দেশে বসবাস করেছিলেন, ফলে

স্থানীয় চিনা কুলিদের দিয়ে তিনি খুব ভালো ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারতেন এবং তাঁর নির্দেশমতোই তারা পরিচালিত হত। এন্সান স্মিথের তার ফলে বেশ খানিকটা সুবিধাই হয়েছিল। কিন্তু একটি ব্যাপারে মাঝে মাঝেই কাজ ব্যাহত হত। আর সেটি হল চিনা কুলিদের অহিফেনের প্রতি প্রবল আসক্তি। আফিমের ধূমপান, অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে 'চণ্ডু' বলা যেতে পারে, স্থানীয় চৈনিক শ্রমিকরা সেই কড়া নেশা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিল। নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা মানুষকে দিয়ে তো আর কাজ হয় না, সুতরাং বাধ্য হয়েই দুই শ্বেতাঙ্গকে সেতুর কাজ বন্ধ করতে হত। মাঝে মাঝেই হয় স্মিথ সাহেব, নয় ওই 'ডি' নামক ভদ্রলোক কুলিদের আস্তানায় হানা দিতেন এবং আফিম পেলেই তা বাজেয়াপ্ত করতেন—কারণ, তাঁদের ধারণা ছিল যে গরিব কুলিদের কাছ থেকে নেশার ওই পদার্থটিকে বাজেয়াপ্ত করতে পারলে পয়সার অভাবে তাদের পক্ষে বার বার কিনে নেশা করা সম্ভব হবে না, ফলে কাজের মধ্যে এই মন্থরতার ভাব স্বাভাবিক ভাবেই কমে আসবে। দুই শ্বেতাঙ্গের ধারণা ভুল নয়। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন কুলিবস্তিতে হানা দেবার পর যদিও কুলিরা সতর্ক হয়ে গেল, কিন্তু নেশার ব্যাপকতাও হ্রাস পেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে—কাজও আশানুরূপ ভাবে চলতে লাগল।

বারজুনটাই নদীগর্ভে সে দিন একটা বড় খুঁটি স্থাপন করার কাজ চলছিল। দুই শ্বেতাঙ্গই কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন। অকস্মাৎ 'ডি' নামধারী রুশটির চোখে পড়ল দূরে নদীবক্ষে ভাসমান তিনটি সচল গোলাকৃতি বস্তুর উপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই দিকে স্মিথ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ততক্ষণে, ধীরে ধীরে নদীর উপর ভেসে উঠেছে সরীসৃপের অতিকায় দেহ। প্রথমটায় জলের উপর দৃশ্যমান তার দুটো চোখ আর নাকের সম্মুখভাগই চোখের পড়েছিল রুশ ইঞ্জিনিয়ারের। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, বারজুনটাই নদীতে কুমির কোনো নতুন বাসিন্দা নয়, মালয়ের বহু নদীর মতো এখানেও মাঝে মাঝে ওই অনড়-দৃষ্টি অতিকায় সরীসৃপের দেখা মেলে। সুতরাং, কুমির দেখে আশ্চর্য হওয়ার মতো ঘটনা কিছু ঘটেনি, কিন্তু নদীর উপর যে মুহূর্তে সম্পূর্ণ দেহটা ভেসে উঠল, স্তম্ভিত বিস্ময়ে দুই শ্বেতাঙ্গ তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। স্মিথের মুখ থেকে নিজের অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে

এল দুটি স্থানীয় শব্দ—'বেসার বুয়াইয়া', যার অর্থ দানব-কুমির।

—'সত্যিই বিরাট কুমির ওটা!' 'ডি' সম্মতি জানালেন সঙ্গীর কথায়।

—'কখনো শিকার করতে চেষ্টা করেছ?' প্রশ্ন করলেন স্মিথ, তাঁর চোখ দূরে নদীবক্ষে ভাসমান বিরাট সরীসৃপটার উপর নিবদ্ধ।

—'ওটা অসাধারণ ধূর্ত—বুনো মোষের মতো', দৃশ্যমান প্রাণীটি সম্পর্কে তথ্য পরিবেশন করলেন 'ডি'। 'তবে আজ সূর্যাস্তের আগে আলো থাকতে থাকতে একটা চেষ্টা করলে হয়।'

সঙ্গীর প্রস্তাব মন্দ ঠেকল না এন্সান স্মিথের। ফলে একটু পরেই দুই ইঞ্জিনিয়ার নদীর পাড় দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চললেন সেই দিকে, যেখানে আস্তানা গেড়েছে আমাদের পূর্বোক্ত সরীসৃপটা। খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর পাতার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ল, প্রায় শ-দুই গজ দূরে নদীর তীরবর্তী জমির উপর বিশ্রামরত কুমিরের দেহ। তার বিরাট চাবুকের মতো লেজ ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়ে মাঝে মাঝে আছড়ে মাটির উপর। নদীর পাড়ে কালো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তার চামড়ার রং। অগ্রবর্তী 'ডি'-এর নির্দেশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এগোলেন স্মিথ। কুমির এবং দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারির মাঝে নদীর একটা বাঁক। অতি সাবধানে নিঃশব্দে সেই বাঁকটা অতিক্রম করলেন দুই জনে।

'প্লপ্!'

মুখ তুললেন দুজনেই। কিছু দূরে ধীরে ধীরে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জলবাসী দানবের দেহ। শিকার হাতছাড়া হতে দেখে আড়াল ছেড়ে দুই শিকারি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যখন নদীর তীরে গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলেন তখন জলের মধ্যে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে 'বেসার বুয়াইয়া'। নদীর তীরে ওই জায়গায় কতকগুলো বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে জলের উপর। ভালোভাবে সমস্ত জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করে দুই শ্বেতাঙ্গ যখন নিরাশ হয়ে ফিরে চলেছেন, বারজুনটাই-এর জলে তখন অস্তমিত সূর্যের শেষ আভা লাল আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

এত সহজে হাল ছাড়লে চলে না। তাই ওইদিন রাত্রেই 'সাম্পানে' চড়ে দুই শ্বেতাঙ্গ শিকারি বের হলেন কুমিরের খোঁজে। সঙ্গে নিলেন উচ্চশক্তির টর্চলাইট এবং রাইফেল। 'সাম্পান' মালয়ে প্রচলিত এক

ধরনের মজবুত নৌকা। তাতে চড়েই নদীবক্ষে দুই তত্ত্বাবধায়ক বেরিয়ে পড়লেন কুমির-সন্ধানে।

টর্চের আলোর রেখা প্রথম কুমিরটাকে আবিষ্কার করল সেতুর সাময়িক কাঠামোর ঠিক নীচে। কিন্তু না, সেটা তাঁদের অভিপ্রেত কুমিরটা নয়। অনাবশ্যক কুমির শিকার করতে শিকারিদের আদৌ কোনো আগ্রহ ছিল না। সুতরাং, সাম্পান এগিয়ে চলল। এরপর মাঝে মাঝেই টর্চের আলোতে ধরা পড়ছিল জোড়ায় জোড়ায় অনড় রক্তচক্ষু, কিন্তু আসলটার খোঁজ মিলল না। সারা রাত ধরে অনুসন্ধান-পর্ব চালিয়ে প্রত্যুষে যখন তাঁরা ফিরলেন, তখন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে একদল চিনা ও স্থানীয় কুলি। তাদের বক্তব্য অতি সহজ এবং সরল।

তাদের মতে, "তুয়ান বেসার" অর্থাৎ স্মিথ সাহেব এবং 'তুয়ান কিচি', অর্থাৎ 'ডি' নামক রুশ ব্যক্তি যে কুমিরটাকে শিকার করবার চেষ্টা করছেন সেটি আদৌ কোনো সাধারণ কুমির নয়—ওটা আসলে নদীর দেবতারই সরীসৃপ রূপ। এর আগেও অনেক শিকারি ওই বিশেষ কুমিরটাকে মারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং, তারা যখন জানতেই পেরেছে, তখন তাদের অনুরোধ যে দুই 'তুয়ান' যেন আর ওই চেষ্টা না করেন।

কিন্তু এরপরেও যখন 'তুয়ান'-দের মধ্যে ভাবান্তর এল না, উপরন্তু 'টোপ' হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তাঁরা যখন ওই কুলিদের কাছেই একটা জ্যান্ত কুকুর তাঁদের জোগাড় করে দিতে বললেন, তখন তারা 'তুয়ান'-দের অনুরোধ রাখল বটে কিন্তু বিশেষ খুশি হয়েছে বলে মনে হল না।

পরবর্তী অভিযানে দুই ইঞ্জিনিয়ার সাম্পানে চড়ে যেখানে এসে নামলেন কুমিরটা সেই জায়গায় দুপুরবেলা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করত। সঙ্গে যে কুকুরটাকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন সেই হতভাগ্য জন্তুটাকে সুবিধামতো একটা জায়গায় বেঁধে রেখে দুই শিকারি রাইফেল হাতে আড়াল থেকে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

বেলা বাড়তে লাগল। জুলাই-এর গনগনে সূর্য যখন মধ্য আকাশে আগুন ছড়িয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ল, স্মিথ সাহেবের ঘড়িতে তখন বেলা দুটো। কিন্তু তখনও, কুমির তো দূরের কথা তার লেজের

ডগাটুকুও চোখে পড়ল না। শিকারিরা উভয়েই তাঁদের ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় নদীর অপর পাড়ে জলের উপর ভেসে উঠল তিনটি কালো গোলাকৃতি পদার্থ। একবার দেখেই সিদ্ধান্তে এসে গেলেন এন্সান স্মিথ—কোনো ভুল নেই, 'বেসার বুয়াইয়া'-ই গা ভাসিয়েছে নদীর জলে। উভয় শিকারি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন অতিকায় জলবাসী দানবের জন্য। প্রায় মিনিট পাঁচেক জলের উপর স্থির হয়ে রইল তিনটি বিন্দু—একাগ্র দৃষ্টিতে কুমির তাকিয়ে আছে কুকুরটার দিকে। তারপর হঠাৎ পুনরায় অদৃশ্য হল জলের তলায়। আর তাকে দেখা গেল না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে উঠে পড়লেন দুই শ্বেতাঙ্গ। ইঙ্গিতে দূরে অপেক্ষমান সাম্পান-চালককে নৌকা কাছে আনতে বললেন, তারপর কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন তাঁদের আস্তানায়। অফিসে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাল সহাস্যবদন একদল কুলি। তাদের হাবভাবে বোঝা গেল যে 'তুয়ান'-দের বিফলতা তাদের মোটেই বিস্মিত করেনি। বরং এটাই স্বাভাবিক তারা ধরে নিয়েছিল।

মধ্যাহ্নভোজ সমাধা করতে করতে উভয় শ্বেতাঙ্গই সিদ্ধান্তে এলেন যে, কুকুরের টোপ দিয়ে সরীসৃপটাকে সম্ভবত প্রলুব্ধ করা সম্ভব হবে না। সুতরাং কুকুরটা কুলিদের ফিরিয়ে দিয়ে নতুন কোনো ফাঁদের বা কৌশলের আশ্রয় নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে তাঁদের মনে হল।

পরের সপ্তাহে শনিবার। এক নতুন পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে দুই সঙ্গী কুমিরটার আস্তানায় হানা দিলেন। নদীর পাড়ে নেমে, প্রথমে বর্শার ফলার মতো দু-মুখো ছুঁচোলো একটা আড়াই ফুট আন্দাজ লম্বা শক্ত গাছের ডালের সঙ্গে তাঁরা একটা লোহার তার বাঁধলেন। তারপর এক খণ্ড ছাগলের মাংসের মধ্যে ডালটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে পুরো বস্তুটাকে জলের নীচে প্রায় দু-হাত মতো ডুবিয়ে দেওয়া হল। তারের অপর প্রান্ত বাঁধা হল নদীর পাড়ে জলের উপর ঝুঁকে পড়া একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। সমস্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল টোপ-সংলগ্ন একটা বিরাট বঁড়শির মতো। অর্থাৎ, মাংসের খণ্ডটা উদরস্থ করতে গেলেই কুমিরের গলায় দু-মুখো ছুঁচলো গাছের ডালটা আটকে যাবে এবং তখন সরীসৃপটাকে গুলি করার যথেষ্ট সময় পাবেন শিকারিরা। উভয়েই আড়াল থেকে

অপেক্ষা করতে লাগলেন কুমিরের জন্য, কিন্তু জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্র যখন পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের স্নিগ্ধ কতকগুলো লাল রশ্মিতে পরিণত হল, তখনও কুমিরটার দেখা মিলল না।

অল্প সময়ের মধ্যেই অফিস থেকে বিকালের জলখাবারের পর্ব সেরে আবার শিকারিরা ফিরে এলেন পূর্বের স্থানে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তাঁরা আবিষ্কার করলেন সেটি হল নদীবক্ষে ভাসমান টোপহীন বঁড়শি। তাঁদের এই স্বল্প সময়ের অনুপস্থিতির সুযোগেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। সামান্য পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে স্মিথ সিদ্ধান্তে এলেন যে কাজটা স্থানীয় কুলিদের ছাড়া আর কারও নয়। আজ রাতের ভোজটা তাদের বেশ ভালোই জমবে। 'ডি'-এর সন্দেহ কিন্তু অন্য—তাঁর ধারণা ধূর্ত কুমিরটাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু সঙ্গীর এই সিদ্ধান্ত অমূলক বলে স্মিথ যখন উড়িয়ে দিলেন, রুশ ব্যক্তিটি তখন অন্য প্রমাণের ব্যবস্থা করলেন।

আশেপাশের গাছগুলোর উপরে অনেক বানর অবস্থান করছিল, তারই একটাকে গুলি করে মেরে পুনরায় টোপের জায়গায় রেখে শিকারিরা স্থানত্যাগ করলেন। কিছু পরে ফিরে আসতেই দেখা গেল পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার স্মিথেরও আর সন্দেহ রইল না। বানরের মাংস আহারে কুলিরা অভ্যস্ত নয়, সুতরাং এ কাজ নিঃসন্দেহে কুমিরটার।

এই শিকার অভিযানের দিন কয়েক পরে, রুশ ইঞ্জিনিয়ারটির উপর কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার দিয়ে স্মিথ সাহেব জরুরি প্রয়োজনে কুয়ালালামপুরের হেড অফিসে চলে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যে কাজের চাপে কুমিরের ঘটনা তাঁর আর মনে রইল না। এর মধ্যে একদিন 'ডি' এসে জানালেন যে, বর্ষায় বারজুনটাই নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে, এবং তাঁর আশঙ্কা সেতুর সাময়িক কাঠামো নদীর ওই তীব্র স্রোত সামলাতে না পেরে যে কোনো সময়ে ভেঙে যেতে পারে। কথাটায় স্মিথ সাহেব বিশেষ কোনো আমল দিলেন না, কারণ তাঁর ধারণামতো বড় কোনো ভূমিকম্পের সৃষ্টি না হলে ওই কাঠামো ভাঙার সম্ভাবনা নেই। স্মিথের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেলেন রুশ সহকর্মীটি।

কিন্তু মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই স্মিথের অফিসে তাঁর পুনরাগমন ঘটল। নাঃ! এবার কোনো সেতু সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়; এবারে তিনি নিয়ে এসেছেন এক আশ্চর্য খবর। বারজুনটাই নদীর 'সরীসৃপ দেবতা' মারা পড়েছে। যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ! সুতরাং পুরো ঘটনার

বিবরণ শুনতে উৎসুক স্মিথ সাহেব তাঁর রুশ সহকর্মীটিকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলেন স্থানীয় একটি ক্লাবে।

'স্পটেড ডগ' ক্লাব।

ক্লাবের মধ্যে কফি পান করতে করতে 'ডি' যে রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেলেন সেটি আমি নীচে তুলে দিলাম।

স্মিথ সাহেব সেলান্‌গর থেকে চলে আসার পর ইদানীংকালে 'চণ্ডু'-র নেশা কুলিদের মধ্যে আবার ব্যাপকহারে চালু হয়েছিল। ফলে মাঝে মাঝেই কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন অতিষ্ঠ হয়ে 'টিফিনের' সময় 'ডি' গিয়ে হাজির হলেন কুলিদের আস্তানায়। ওই সময় যে তাঁর আগমন ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কেউই ঠিক ধারণা করতে পারেনি, ফলে বেশ কয়েক পাউন্ড আফিং-এর একটা বড় দলা অচিরেই 'ডি'-এর হস্তগত হল। কলাপাতায় মুড়ে ডেলাটা পকেটে ঢুকিয়ে 'ডি' স্থানত্যাগ করলেন।

বর্ষার জলে কানায় কানায় পূর্ণ বারজুনটাই নদী তখন উত্তাল, উদ্দাম, খরস্রোতা। তীব্র বেগে ধাবমান নদীর জলে ভেসে চলেছে অসংখ্য কাঠের খণ্ড, ছোট-বড় গাছ, পাথরের বড় বড় টুকরো ইত্যাদি। আর সেই দুর্বার স্রোতে থরথর করে কাঁপছে সেতুর কাঠামো।

কুলিদের আস্তানা থেকে বেরিয়ে রুশ ব্যক্তিটি ওই সেতুর উপর ফিরে গিয়ে পুনরায় কাজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হলেন। হঠাৎ, নদীর জলে ভেসে আসা প্রকাণ্ড একটা গাছের সঙ্গে সংঘাত হল নদীবক্ষে প্রোথিত একটা কাঠের খুঁটির। প্রচণ্ড ধাক্কায় থর থর করে কেঁপে উঠল সেতুর কাঠামো আর 'ডি' যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ পর্যবেক্ষণ করছিলেন, সেতুর সেই অংশটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নদীর জলে।

তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বারজুনটাই-এর দুরন্ত স্রোতে দক্ষ সাঁতারুর পক্ষেই টিকে থাকা কষ্টকর। কিন্তু, ভাগ্যক্রমে 'ডি' তাঁর হাতের নাগালে ভেঙে পড়া একটা চৌকোণা কাঠের কাঠামো পেয়ে গেলেন। ভারী কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি খাঁচার মতো আকৃতি বিশিষ্ট সেই কাঠামোটাকে আশ্রয় করে ভেসে চললেন তিনি।

স্রোতে পাক খেতে খেতে, একজন যাত্রীকে বহন করে কাঠের কাঠামো শেষ পর্যন্ত পাড় স্পর্শ করল। কিন্তু জায়গাটা ঠাহর করে

'ডি' শিউরে উঠলেন। সর্বনাশ! এ তো 'বেসার বুয়াইয়া'-র বাসস্থল। কাঠের কাঠামোর মধ্যে বন্দি অবস্থায় 'ডি' পাড়ের যে জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছেন, দিন কয়েক আগে এখানেই বাঁধা হয়েছিল জ্যান্ত কুকুরটাকে। একটু পরেই সমস্ত চিন্তার অবসান হল। কাঠের খাঁচা থেকে বেরোবার জন্য 'ডি' সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ একটু দূরে নদীর তীরবর্তী কালো মাটির একটা বিরাট অংশ যেন নড়েচড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। "দানব সরীসৃপ—বেসার বুয়াইয়া"। আতঙ্কে পাথর হয়ে জমে গেলেন 'ডি'।

ধীরে ধীরে অতিকায় সরীসৃপটা এগিয়ে এল কাঠের খাঁচাটার দিকে, তারপর হঠাৎ তার মুখটা দ্রুতবেগে ধাবিত হল 'ডি'-এর প্রতি। উন্মুক্ত মুখগহ্বরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল ক্ষুরধার দাঁতের সারি। কিন্তু কুমিরের ভাগ্য বাদ সাধল। শিকারের নাগাল পাওয়া কুমিরের পক্ষে ঠিক অতটা সহজ হল না। আড়াআড়িভাবে আটকানো কাঠের তক্তায় আটকে গেল কুমিরের বিরাট চোয়াল। কিন্তু মুখের সামনে সহজলভ্য শিকারকে এই সামান্য বাধার জন্য ছেড়ে দিতে কুমির রাজি নয়। 'প্রাণ-রক্ষক' কাঠের কাঠামো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সরীসৃপের প্রচণ্ড আঘাতে। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লেও, 'ডি' কিন্তু স্থানু হয়ে বসেছিলেন না। প্রাণভয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে লাথি চালাচ্ছিলেন কুমিরের নাকে এবং মুখের সামনের দিকে নরম অংশে। ফলে মাঝে মাঝে সরীসৃপটা তার কুৎসিত মুখ টেনে নিচ্ছিল খাঁচার বাইরে।

এর মধ্যেই ঘটল সেই অদ্ভুত ঘটনা। প্রচণ্ডভাবে এলোপাথাড়ি হাত-পা ছোঁড়ার ফলে 'ডি'-র কোটের পকেট থেকে ছিটকে পড়ল কুলিবস্তি থেকে বাজেয়াপ্ত করা আফিমের ডেলা, তার পরই আর এক লাথিতে সেটা গড়িয়ে কাঠের খাঁচার বাইরে চলে গেল। 'ডি' ব্যাপারটা কতখানি খেয়াল করেছিলেন তা বলা কঠিন, কিন্তু কুমির ডেলাটা বাইরে আসা মাত্রই গলাধঃকরণ করল, এবং তারপর পুনরায় মনোযোগ দিল তার শিকারের প্রতি।

অন্যদিকে 'ডি'-র পরিত্রাণের আশা ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল। কারণ, আর কতক্ষণ জলবাসী দানবের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করে কাঠের কাঠামো টিকে থাকতে পারবে, সে সম্বন্ধে জোর করে কিছুই বলা যায় না।

কুলিদের ডাকাও নিরর্থক। নদীর কল্লোলে ভেসে যাবে তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ। অতএব, স্নায়ু এবং আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় খুঁজে পেলেন না 'ডি'।

পরিত্রাণের আশা নেই। কিন্তু আতঙ্কিত 'ডি'-র কাছে কুমিরের আচরণ হঠাৎ কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। ক্রমশ যেন নিশ্চল হয়ে আসছে অমিত শক্তির অধিকারী অতিকায় কুমিরটার আস্ফালন। তার সমস্ত দেহ যেন শ্রান্তিতে শুয়ে পড়তে চাইছে নদীর পাড়ে মাটির বুকে। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা সম্ভাবনার কথা রুশটির মাথায় খেলে গেল। আর সেই সঙ্গে মুক্তির আলোও দেখতে পেলেন তিনি।

অল্পক্ষণ পরেই কুমিরটা আক্রমণে ইস্তফা দিল। তারপর আস্তে আস্তে তার প্রকাণ্ড শরীরটাকে টেনে নিয়ে গেল নদীর পাড়ে। অসীম ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বুজে এল। আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে বারজুনটাই নদীর তিরে পড়ে বইল নদীর 'সরীসৃপ দেবতা'।

একদৌড়ে 'ডি' যখন অফিসে এসে পৌঁছলেন, জলে কাদায় তখন তাঁর সর্বাঙ্গ মাখামাখি।

—'কুমিরটা এখনও আছে। আমার বন্দুকটায় গুলি ভরো।' এর চেয়ে বেশি কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে।

সাম্পানে চড়ে গোটাকয়েক কুলি সঙ্গে নিয়ে 'ডি' যখন অকুস্থলে এসে পৌঁছলেন, তখনও নদীর পাড়ে জলবাসী দানবের বিরাট দেহ লম্বমান। জন্তুটার মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পরপর দুটো গুলি করলেন 'ডি'। তীব্র যন্ত্রণায় একবার মোচড় দিয়েই শান্ত হয়ে গেল কুমিরের দেহ।

কুমিরটা মৃত, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর কুলিরা নেমে এল সাম্পান থেকে। অবশ্য, সামান্য কিছুক্ষণ মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করেই তারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এটা সেই 'নদীর দেবতা'-টা নয়, বরং তার ভাই হতে পারে!!

প্রতিধ্বনির অভিশাপ

আফ্রিকা। রহস্যময়ী আফ্রিকা পূব ও পশ্চিমের বহু রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলের কাছে এই মহাদেশের রূপ নিত্যনতুন; কিন্তু শিকারির চোখে আফ্রিকা চির আদিম, চিরন্তনী!

এই মহাদেশের এক দিকে যেমন বিরাজ করছে বিরাট মরুভূমি, অন্য দিকে তেমনি বিশাল অরণ্যের বিস্তার—আর এই প্রাকৃতিক পটভূমিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠছে সভ্য সমাজ। রাজনীতিবিদরা আপাতত এই সভ্য মানুষদের নিয়ে ভাবুন; আমরা চলে যাই বরং অরণ্যের অধিবাসীদের খবর নিতে।

আফ্রিকা মহারণ্যের মাঝখানে রয়েছে যে সব ঘাসে ঢাকা বিশাল

তৃণভূমি সেখানে চড়ে বেড়ায় কালো মেঘের মতো যে মোষের পাল তাদের সঙ্গে আমাদের চেনা-পরিচিত মোষদের কিছু তফাত রয়েছে। আফ্রিকার বিভীষিকা এই মহিষাসুররা হল 'কেপ-বাফেলো।'

বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্র আর অসম্ভব ধূর্ত এই জানোয়ারের প্রধান অস্ত্র তার দুটি শিং এবং দুজোড়া শক্তিশালী পায়ের খুর। প্রকৃতি এই চতুষ্পদকে সাজিয়েছে আরও একটি অভিনব অস্ত্রে—'কেপ-বাফেলো'র মাথায় ঠিক যোদ্ধাদের 'হেলমেট' বা শিরস্ত্রাণের মতোই রয়েছে একটি অত্যন্ত পুরু হাড়ের আবরণ, যার নাম 'বস অফ্ দ্য হর্ণ'। পৃথিবীর অন্য মহিষদের এই শিরস্ত্রাণ নেই। বন্দুকের গুলিও এই হাড়ের দুর্গকে ভেদ করে মোষের মাথায় কামড় বসাতে পারে না।

পেশাদার শিকারিদের কাছে তাই 'কেপ-বাফেলো' শিকার এক দুর্লভ প্রাপ্তি, এক স্বপ্নের সাফল্য। সুতরাং, ন্'জুই নামে আফ্রিকান সহচরটির মুখে 'মবোগো-ইয়া-মংগু' অর্থাৎ যমের বাহনের মতো বিশাল মোষটার কথা শুনে শ্বেতাঙ্গ শিকারি স্নিলকের রক্ত স্বাভাবিক কারণেই গরম হয়ে উঠেছিল। রক্ত গরম হওয়ার আর একটা সঙ্গত কারণ অবশ্য এই যে, মোষটা এরমধ্যেই শ'খানেকের উপর মানুষ মেরেছিল।

মোষ সাধারণত বাঘ বা সিংহের মতো মানুষ মারে না। কারণ সহজ, মানুষ তার খাদ্য নয়। কিন্তু এই মোষটার কথা আলাদা—নিছক হত্যার আনন্দেই নয়-নয় ক'রে অন্তত শ'খানেক মানুষকে এরই মধ্যে সে যমের দুয়ারে পাঠিয়েছে অথচ একটা তীর অথবা বল্লমের ফলা তার শরীর স্পর্শ করতে পারেনি, বন্দুকের গুলি তো দূরের কথা। স্থানীয় উপজাতিদের কাছে মোষটা ক্রমে হয়ে উঠেছে একটা অলৌকিক জন্তু, দেবতার বাহন। তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে, দেবতার বাহনকে মানুষের পক্ষে মারা সম্ভব নয়।

স্নিলক কিন্তু তাদের বিশ্বাসে সায় দিতে পারেনি, না পারারই কথা। অলৌকিকতার চেয়ে তার বেশি বিশ্বাস হাতের বন্দুকের উপর। তাই ন্'জুই চুপ করলে সে বলেছিল, 'এবার তা হলে আমি নিজেই একবার মোষটাকে মারার চেষ্টা করে দেখি, কি বলো?'

শুনে যেন আঁতকে উঠেছিল ন্'জুই, 'সে কী। এত কথা শোনার পরও তুমি যাবে 'বাওয়ানা'? না, না, যেওনা; এভাবে আত্মহত্যা করার

কোনো মানে হয় না।' শেষে স্নিলককে নিরস্ত করতে না পেরে হতাশভাবে মাথা নেড়েছিল, 'তা হলে তোমায় একাই যেতে হবে বাওয়ানা, তোমার সঙ্গে আর কেউ পাগলের মতো মরতে যাবে না...'

ন্'জুইকে কথা শেষ করতে না দিয়েই এবার উত্তর দিয়েছে স্নিলক, চাপা বিদ্রূপ ফুটেছে স্পষ্ট তার গলায়, 'পাগলামি না ভয়? সত্যি কথাটাই বরং বলো ন্'জুই। এতবড় জোয়ান লোকগুলোর বুকের মধ্যে কি মুরগির কলজে ভরে দিয়েছে ভগবান, কি হে?'

ভীতু! কাপুরুষ! নিমেষে আগুন ধরে গেছে ন্'জুই-এর আদিম রক্তে। বাওয়ানার কথায় দপ করে জ্বলে উঠে সে জবাব দিয়েছে, 'ভয়? ভয় এ বান্দা কাউকে পায়না বাওয়ানা; শুধু যার সঙ্গে লড়াই দেওয়া যায় না, তাকেই আমি ভয় পাই। তবু চলো, তুমি যখন যাবেই বলছ, তখন ন্'জুইও তোমার সাথে থাকবে।'

চুপ করল ন্'জুই। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে একটা ভারী নিস্তব্ধতা। স্নিলক একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনে আগুনের কুণ্ডটার দিকে; ন্'জুই-এর দু-চোখ তখন প্রসারিত খানিকদূরের 'সিডার' বনের সীমানায়—কেনিয়ার সিডার বন!

'প্রতিধ্বনিমুখর মৃত্যু-উপত্যকা!'

নামটা এইরকমই বটে। আফ্রিকার মহা অরণ্যের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা বিরাট তৃণভূমি; মাঝেমধ্যে দু-চারটে বড় গাছ মাথা তুলেছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। উজ্জ্বল সবুজের সেই সমারোহের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন উদাসী হয়, বুলেট আর রক্তের কথা মানুষ ভুলতে চায় তখন।

স্নিলকও বোধহয় ভুলতে বসেছিল, অন্তত দেখেশুনে ন্'জুই-এর সেরকমই মনে হয়ে থাকবে; ভারী গলায় সে বলল, 'সাহেব, এই হল মৃত্যু-উপত্যকা!'

যেন সম্বিত ফিরে স্নিলক থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা দলটা। দল বলতে অবশ্য তিনটে মানুষ—স্নিলক, ন্'জুই, ন্'জুই-এর ভাই কেপেজ আর ছ'টা 'মংগ্রিল' কুকুর'। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত ন্'জুই শুধু একাই আসেনি, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ভাই কেপেজকেও। খুব ইচ্ছা যে

ছিল এমন নয়, কিন্তু সাহেবের কাছে সম্মানরক্ষার প্রশ্নটা তাঁর কাছে অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্নিলক অবশ্য এসব চিন্তায় মাথা ঘামাচ্ছে না আপাতত—উপত্যকায় পৌঁছে প্রথমটা তার রূপে মুগ্ধ হলেও এখন সে কাজের কথা ভাবতে চায়, নইলে 'যমের বাহনের' আস্তানায় দাঁড়িয়ে তাঁর অবস্থাও যদি কোনো মুহূর্তে আগের শ'খানেক হতভাগ্য মানুষের মতো হয়ে যায়, তখন আপশোষের সময় মিলবে না।

উপত্যকার চারদিক জুড়ে চলে গেছে অজস্র মোষের পায়ের ছাপ, তার মধ্যে থেকে একটা কোনো বিশেষ মোষকে খুঁজে বের করা মুশকিল। খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বের করার কথাই মনে হয়ে থাকবে স্নিলকের, কিন্তু মাথা নীচু করে সেই ছাপগুলোকে শিকারি কুকুরের মতো খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ ন্'জুই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাওয়ানা, এই যে পাওয়া গেছে! এদিকে এসো।'

খানিকটা অবিশ্বাস নিয়েই এগোল স্নিলক, কিন্তু কাছে এসে তাঁর বুঝতে দেরি হল না যে ন্'জুই অভ্রান্ত—অত বড় ছাপ মোটামুটি অন্ধ না হলেই খুঁজে বার করা যায়। প্রমাণ আকারের খাবার প্লেটের মাপের সেই ছাপের মালিকের চেহারাখানা মনে মনে চিন্তা করে একবার বোধহয় শিউরে উঠল স্নিলক। আশপাশের খুরের দাগগুলো ওর পাশে নেহাতই বামন মনে হচ্ছে। ন্'জুই-এর কথা কানে এল—'বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে মোষটা এখান দিয়ে গেছে, চলো আরো এগিয়ে দেখা যাক।'

খুনি মোষটার পদচিহ্ন হারাবার কোনো আশঙ্কা নেই। সেই নিশানা ধরে ক্রমে ক্রমে প্রায় মাইল তিনেক পথ পেরিয়ে আসার পর দেখা গেল সামনে বুনো ঝোপঝাড়ের জঙ্গল তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে ছাপটাকে ভালো করে পরীক্ষা করে ন্জুই উঠে দাঁড়াল—'মোষটা ওই প্রথম ভাগের জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে বাওয়ানা। সবসময়ই দেখেছি ও এই তে-ফলা জঙ্গলটার মধ্যে গিয়ে ঢোকে।'

প্রথম ভাগের জঙ্গলটার ঠিক মুখে একটা বড় ঝোপ। ম্যানলিকার রাইফেলে গুলি ভরে সেই ঝোপটার কাছে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ একটা

বুদ্ধি খেলে গেল স্নিলকের মাথায়—না, মহিষটাকে তাড়া করে নয়, বরং সেটাকেই ডেকে আনতে হবে এখানে, তাহলে বিপদ অনেক কম।

একটা আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে এই উপত্যকার, এখানে কোনো আওয়াজ করলে সেটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে ফিরে আসে চারদিক থেকে আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল শয়তান মোষটা সে কথা জানে। তাই শত্রুকে বা শিকারকে ওই প্রতিধ্বনিতে বিভ্রান্ত করে হত্যা করাটাই তার রেওয়াজ। ন্'জুই-এর কাছেই স্নিলক কথাটা শুনেছিল। এখন উলটে মোষটাকেই বিভ্রান্ত করার চিন্তা মাথায় আসতে তাই কেপেজকে ডেকে সে বলল একটু দূরে গিয়ে চিৎকার করতে। আগে দেখে নেওয়া যাক আসল ঘটনাটা কি?

চিৎকার শোনা গেল কেপেজের একটু বাদেই, আর কি আশ্চর্য, তারপরই গোটা উপত্যকা জুড়ে যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ভেসে আসতে লাগল তার রেশ; ডাইন-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে সব দিকে থেকে।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে স্নিলক এবার পরিকল্পনা ঠিক করল। বুনো ঘাসঝোপে লুকিয়ে গুলি চালানো সহজ হতে পারে কিন্তু ভুললে চলবে না যে, 'কেপ বাফেলো' হল পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জন্তুদের মধ্যে একটা, তাই তার গতিবিধি দেখে সময়মতো যাতে তাকে সাবধান করে দিতে পারে সেইজন্য কেপেজ আর ন্'জুই-কে স্নিলক দুটো উঁচু জায়গায় উঠে আস্তানা গাড়তে বলল। কেপেজ গিয়ে উঠল একটা নেড়া টিলার উপর, আর ন্'জুই সামনের একটা গাছে। ঘাসঝোপের মধ্যে থেকে

ন্'জুইকে চোখে পড়ছে না বটে কিন্তু কেপেজের কালো শরীর স্পষ্ট চোখে পড়ছে; সেই দিকে চেয়ে স্নিলক এবার অপেক্ষা করতে শুরু করল।

কুকুরগুলো ডেকেই চলেছে; প্রায় ঘন্টাখানেক কাটার পর হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল কেপেজের। চমকে উঠে হাতের রাইফেল তুলে সামনের দিকে তাকাল স্নিলক। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। জঙ্গলের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বেরিয়ে এল চারটে মোষের একটা দল। চলেছে তারা তিন নম্বর ভাগটার দিকে। পেছনে চিৎকার করে তাড়া করছে কুকুরবাহিনী, কিন্তু সে দিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ নেই মহিষপ্রবরদের। শুধু মাঝে মাঝে খুব বেশি বিরক্তি বোধ করলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্রকাণ্ড শিং জোড়া নীচের দিকে নেড়ে আর তৎক্ষণাৎ ছিটকে আওতার বাইরে সরে যাচ্ছে কুকুরের দল—তারা বিলক্ষণ জানে ওই শিং-দুটোর মর্ম; দেখেশুনে রাইফেল নামাল স্নিলক; না, এদের খোঁজে সে এখানে আসেনি।

মোষগুলো ঢুকে গেল জঙ্গলের ফালিটার মধ্যে। বেশ খানিকক্ষণের বিরতি আবার। তারপর একসময় ফের শোনা গেল কেপেজের গলা—'কামাতা! কামাতা!' অর্থাৎ 'ধরো! ধরো!'

আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল স্নিলক। আর একটা মোষের দল। প্রথমে স্ত্রী-মহিষটাকে দেখে একটু হতাশ হয়েছিল বটে কিন্তু তারপরেই... হ্যাঁ, চোখ চেয়ে দেখবার মতো একখানা চেহারা বটে! কালো মেঘের মতো চামড়ায় মোড়া আঁটোসাটো প্রকাণ্ড, শরীর, জোড়া-সঙিনের ফলার মতো আকাশের পটে আঁকা বিরাট দুটো শিং, চলাফেরায় রাজকীয় মহিমা, সত্যিকারের 'যমের বাহন'ই বটে!

দেখেশুনে খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেছিল স্নিলক, ঘোর কাটল যখন, তখন মোষ আর তার মাঝখানে মাত্র পনেরো গজের জমি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল মোষটা; কে জানে হয়তো বনের বাতাস তার নাকে বয়ে এনেছে শত্রুর গন্ধ? স্নিলক কিন্তু আর সময় নষ্ট করা সুবিধের বলে মনে করল না। মোষের গলা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থল নিশানা করে বন্দুকের ঘোড়া টিপল।

খুব রয়ে-সয়ে নিশানা করবার সুযোগ ছিল না; গুলি তাই একেবারে

মর্মস্থানে কামড় বসিয়ে মোষকে তৎক্ষণাৎ পেড়ে ফেলতে পারল না মাটিতে, যদিও জখম করল ভালোভাবে। কিন্তু জখম মোষ বড় ভয়ঙ্কর জানোয়ার। স্নিলকের ভাগ্যে হয়তো অনেক দুর্গতিই লেখা থাকত যদি না এবার নিজের আস্তানার ফাঁদেই ধরা পড়ত মোষটা।

বন্দুকের আওয়াজ নিস্তব্ধ উপত্যকার বুকে বাজ-পড়ার মতো শোনাল, প্রতিধ্বনির ঢেউ উঠল চারদিক থেকে আর সেই ভেসে আসা শব্দ শুনে দিক ভুল করে রাগে অন্ধ মোষটা বিদ্যুতের মতো ছুটে পেরিয়ে গেল প্রায় একশো গজ জমি—স্নিলক যেখানে লুকিয়ে ছিল ঠিক তার উলটো দিকে। শত্রুর সন্ধানে ফেরা হিংস্র দুটো শিং খুঁজে পেল শুধুই বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে ওঠা উপত্যকার বাতাস। ততক্ষণে স্নিলক মোষের পেটে আর একটা গুলি পরিষ্কার নিশানায় বর্ষণ করেছে।

দু-নম্বর গুলিটা খেয়ে মোষ এবার যুদ্ধকৌশল পালটাল, আত্মগোপন করল ঝোপের আড়ালে। আহত মোষটাকে অনুসরণ করতে স্নিলককে এবার বেরোতে হল ঝোপের আড়াল ছেড়ে, বেরোতেই ন্'জুই-এর চিৎকার কানে এল তার। গাছের উপর থেকে সে তারস্বরে বারণ করছে স্নিলককে, কিন্তু স্নিলকের কানে সে চিৎকার কতগুলো অর্থহীন শব্দ ছাড়া তখন আর কিছু নয়। শিকারির দায়িত্ব স্নিলককে পালন করতেই হবে, নইলে জখম হওয়া মোষ আরও কত মানুষ খুন করবে কে জানে? শেষপর্যন্ত সাহেবকে না থামাতে পেরে ন্'জুই নিজেই নেমে এল গাছের উপর থেকে।

সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ন্'জুই। স্নিলকের খুবই আপত্তি ছিল এই ভাবে তাঁর আশ্রয় ছেড়ে নেমে আসার ব্যাপারে কিন্তু এখন তর্ক করার পক্ষে সময়টা সুবিধের নয়—আহত কেপ বাফেলো ঝোপের আড়াল থেকে আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে; এক মুহূর্তের দাম এখন অনেক। দুজনে মিলে তন্নতন্ন করে গোটা জঙ্গলটা খুঁজতে শুরু করল—কিন্তু কোথায় মোষ? অত বড় পাহাড়ের মতো শরীরটা যেন উবে গেছে কর্পুর হয়ে।

'পালাও বাওয়ানা, পালাও!' হঠাৎ ন্'জুইয়ের চিৎকার শুনে পিছনে ঘুরল স্নিলক। ন্'জুই ততক্ষণে উধর্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে। মাত্র তিরিশ গজ দূরে মূর্তিমান ধ্বংসের মতো ছুটে আসছে আহত মোষ। রক্তাক্ত

দেহ, দুটো প্রকাণ্ড শিং হেলে পড়েছে পিছন দিকে এক জোড়া নিষ্ঠুর তরোয়ালের মতো, চোখ রক্তের মতো লাল, প্রকাণ্ড রেল ইঞ্জিনের মতো মাটি কাঁপিয়ে ধেয়ে আসছে 'কেপ বাফেলো'।

দন্‌ন্‌! দন্‌ন্‌ন্‌!! উপত্যকার বুকে প্রতিধ্বনি তুলে গর্জন করে উঠল শিকারির হাতের রাইফেল। পরপর দুবার। থমকে দাঁড়াল মোষ, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটির উপর। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। চার-চারটে গুলি খেয়েও আবার উঠে দাঁড়াল সেই দুর্দান্ত জানোয়ার, আবার গিয়ে লুকোলো একটা ঝোপের আড়ালে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার গুলি ভরে তৈরি হল স্নিলক। তবে এবার আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই ভেসে এল ন্‌'জুই-এর চিৎকার—আর্তস্বর নয়, উল্লাসধ্বনি! কপালের ঘাম মুছে পাইপ ধরাল স্নিলক।

প্রায় একশো মানুষের হত্যার নায়ক 'ম্‌বোগো-ইয়া-মংগু'র বিশাল শিং দুটো স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করে আনতে ভুল হয়নি স্নিলকের। এক একটা শিং-এর মাপই ছিল তার পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চির মতো। অমূল্য স্মৃতি, সন্দেহ নেই।

অগ্নি পরীক্ষা

উত্তর রোডেশিয়ার লিভিংস্টোন নামক অঞ্চলটিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে যে পুলিশ কর্মচারীটি নিয়োজিত হয়েছিলেন, তাঁর নাম মিঃ জ্যাকোয়েস্ট। কিন্তু স্থানীয় অঞ্চলের শান্তিরক্ষার কাজে ব্যাপৃত হয়ে, মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে, এই সব জায়গায় যে মানুষগুলো শান্তি ভঙ্গ করে তারা স্বভাবতই খুব শান্তশিষ্ট, ভদ্র এবং বিনীত চরিত্রের নয়। এইসব দুর্বিনীত মানুষদের শায়েস্তা করতে গিয়ে দণ্ডদাতাকেও মাঝে মধ্যে বেশ খেসারত দিতে হয়। এমনকী, পুলিশ নামক আইনরক্ষাকারী জীবদেরও এরা যে সবসময়ে খুব রেয়াত করে চলে এ কথা বললে সত্যি কথা বলা হয়

না। বিপদে পড়লে তারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পুলিশ কর্মচারীর উপর তাদের অভ্যস্ত হাতের প্রচণ্ড মুষ্টিযোগ অথবা হস্তধৃত অস্ত্র প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

একটি ছোটখাটো ঝামেলার মধ্যে দিয়ে মুখের সামনের দিকের চার-চারটি দাঁত খুইয়ে এই কথা ক'টি জ্যাকোয়েস্ট অচিরে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

কথায় বলে—'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'; জ্যাকোয়েস্টের ক্ষেত্রে প্রবচনটা অক্ষরে অক্ষরে ফলল। ডাক্তার নকল দাঁতের পাটি জুড়ে দিয়ে জ্যাকোয়েস্টের মুখের পুরোনো আদল ফিরিয়ে দিল বটে; কিন্তু নকল দাঁতের উপসর্গ নিয়ে বেচারা পুলিশ কর্মচারীটি পড়ল খুবই অস্বস্তিতে। চিবোতে গেলে বিপত্তি, হাঁ করতে গেলে বিপত্তি, আর খাওয়ার কথা মনে হলেই তার গায়ে জ্বর আসতে লাগল।

কিন্তু দাঁতের চিন্তা করলে তো আর দাঁত ফিরে আসবে না। সুতরাং সে চিন্তায় ইস্তফা দিয়ে জ্যাকোয়েস্ট ছুটলেন তাঁর কার্যক্ষেত্রে। শান্তিভঙ্গ কারীদের জন্য প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধান করতে—পুলিশ কর্মচারী হিসাবে এটা তাঁর কর্তব্য।

পুলিশ-স্টেশনে ঢোকার মুখে কয়েকজন স্থানীয় লোক দল বেঁধে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। প্রতিদিনের মতো আজও তারা জ্যাকোয়েস্টকে অভিবাদন জানাল—'ম্যুতিন্দে ম্'কোয়ে'। বাংলায় তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায়—'হে মহান ব্যক্তি! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।'

পুলিশ কর্মচারী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন স্থানীয় অধিবাসীদের এই সুন্দর অভিবাদনটি জ্যাকোয়েস্টের খুব প্রিয় ছিল। গোটা উত্তর রোডেশিয়া জুড়ে বহু জায়গায় তিনি এই কথা দুটি শুনেছেন, কিন্তু কোনোদিনই তাঁর পুরোনো মনে হয়নি।

স্থানীয় লোকেদের সমস্যার সমাধান করতে হলে আগে সেগুলো জানা প্রয়োজন। দোভাষীকে ডেকে পাঠালেন জ্যাকোয়েস্ট। দোভাষী এল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জ্যাকোয়েস্ট প্রথমেই অপ্রস্তুত হলেন। তাঁর মুখ দিয়ে কোন পরিষ্কার কথা নির্গত হল না—কেবল কয়েকটি অস্ফুট শব্দ। সন্দেহ নেই যে ওই ধ্বনিবিকৃতি কারণ—নকল দাঁতের পাটি। সুতরাং, উপায়ান্তর না দেখে, মুখগহ্বর থেকে কৃত্রিম

দন্তপংক্তি অপসারিত করে পুনরায় বাক্যালাপ করতে সচেষ্ট হলেন জ্যাকোয়েস্ট। তাঁর এই অদ্ভুত কার্যকলাপ এবং মুখমণ্ডলের আকস্মিক বিকৃতি অপেক্ষমান স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকবে। ফলে তাদের মধ্যে একটা সমবেত হাসির রোল পড়ে গেল। জ্যাকোয়েস্ট তাকিয়ে দেখলেন, হাসতে হাসতে তারা একে অপরের গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি হাস্যকর বটে, কিন্তু জ্যাকোয়েস্টের মনে হল স্থানীয় লোকগুলো তাঁকে নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি ধরনের রঙ্গ-রসিকতা শুরু করেছে। একজন ক্ষমতাশালী পুলিশ কর্মচারীর কাছে এ ধরনের বেয়াদবি অসহ্য। দাঁতের পাটি মুখে পুরে নিয়ে রাগে লাল হয়ে তিনি উঠে গেলেন পাশের ঘরে।

জ্যাকোয়েস্টের ঘরের পাশের ঘরটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট লসনের কার্যালয়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট লসনের বয়স হয়েছ। মাথার চুলে সাদা পাক ধরেছে। উত্তর রোডেশিয়া পুলিশ বাহিনীর একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী তিনি। কর্মরত সময়ে বহু দিন ধরে স্থানীয় অঞ্চল এবং অধিবাসীদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতি তাঁর নখদর্পণে।

ক্ষিপ্ত জ্যাকোয়েস্টের সমস্ত অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন তিনি। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে অভিযোগকারীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, লোকগুলো যখন তোমার দিকে চেয়ে হাসতে শুরু করল, তার আগে তারা কিছু বলাবলি করছিল বলে তোমার মনে পড়ে?'

চিন্তায় পড়লেন জ্যাকোয়েস্ট। প্রথমত, স্থানীয় ভাষা তিনি বোঝেন না, ফলে তাদের উচ্চারিত শব্দের অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোনো উপায়েই তাঁর পক্ষে লসনকে সাহায্য করা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত, তাঁর এখন মাথা গরম, স্থির হয়ে কিছু চিন্তা করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তবু অল্প-সল্প কিছু মনে পড়ল জ্যাকোয়েস্টের—'হ্যাঁ! কী যেন "বা-ইলা" বা ওই ধরনের কোন শব্দ তারা উচ্চারণ করছিল বটে।'

চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে উঠল সুপারিন্টেন্ডেন্ট লসনের, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা,—'ওই জন্যে, তাই বল!'

তারপর একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন তিনি,—

'বুঝলে! এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা খুব সরল বা সাদাসিধে। সামান্য মজার ব্যাপার হলেও এরা সেটাকে চূড়ান্তভাবে উপভোগ করে। আর সবচেয়ে মজা হয় যখন সেই আমোদের কারণ ঘটায় কোনো শ্বেতাঙ্গ।'

'কিন্তু আসল মজাটা যে কী তা তো বুঝলাম না।' জ্যাকোয়েস্ট বেশ কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত।

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে প্রৌঢ় সুপারিন্টেন্ডেন্ট এগিয়ে গেলেন ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বড় মানচিত্রটার দিকে। মানচিত্রটা স্থানীয় অঞ্চলসমূহকে নির্দেশ করে অঙ্কিত।

'দেখ! এই যে জায়গাটা দেখছ', লসনের আঙ্গুল মানচিত্রের উপর একটি বড় ভূখণ্ডকে নির্দিষ্ট করে, "এই জায়গাটার নাম 'বারোৎসে অঞ্চল', আমরা বলি 'সিংহের দেশ'। আর এই অঞ্চল জুড়ে বাস করে একদল বিচিত্র মানুষ—'বা-ইলা' উপজাতি। কিন্তু এই উপজাতিটির সম্বন্ধে কিছু জানবার আগে প্রথমে ওই 'বারোৎসে অঞ্চল'-এর একটা সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক বিবরণ তোমার জানা প্রয়োজন।"

"জাম্বেসী নদীর প্রবল বন্যায় বছরের মধ্যে একটা সময় এই অঞ্চলটির দুই-তৃতীয়াংশ প্লাবিত হয়। সেই সময়ে বন্যার জলে তাড়িত হয়ে 'বারোৎসে অঞ্চলের' সমস্ত প্রাণী আশ্রয় গ্রহণ করে পাহাড়ি উচ্চভূমির উপর। তারপর বেশ কিছুদিন পরে জল সরে যায়—বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে আত্মপ্রকাশ করে পলিমাটি সমৃদ্ধ উর্বর ভূভাগ— 'বারোৎসে সমভূমি'। উর্বর জমির বুকে দ্রুত দেখা দেয় সবুজের সমারোহ, আফ্রিকার তৃণভূমির নিবিড় স্নিগ্ধ শ্যামলিমা। পাহাড়ের উপর থেকে দলে দলে পশুরা নেমে আসে সমতলভূমির বুকে। তৃণভোজী প্রাণীদের খোঁজে তখন উপত্যকার বুকে এসে হাজির হয় সিংহের পাল। ফলে, এই সময় পশুরাজের আক্রমণ থেকে নিজেদের গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করতে প্রায়ই সমভূমির অধিবাসীদের যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয় সিংহের বিরুদ্ধে।

বিস্তীর্ণ এই স্থানীয় অঞ্চল জুড়ে বাস করে তিয়াত্তরটি উপজাতি। কিন্তু অন্যান্য বাহাত্তরটি উপজাতির তুলনায় 'বা-ইলা'-রা এক বিরাট ব্যতিক্রম। দুর্জয় সাহসী এবং একগুয়েঁ প্রকৃতির এই উপজাতিটি স্বভাব-

চরিত্রে একেবারেই স্বতন্ত্র।

'বা-ইলা'-দের পূর্বকথা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আর খুব অল্পসংখ্যক 'বা-ইলা'-কেই আমরা উত্তর রোডেশিয়ার পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত করে থাকি। তার কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত এদের একগুঁয়েমি, আর দ্বিতীয়ত এদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ। শ্বেতাঙ্গদের নিয়মকানুন এদের একেবারেই অপছন্দ।' একটু থামলেন সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

নড়ে চড়ে বসলেন জ্যাকোয়েস্ট। নকল দাঁতের পাটি মুখ থেকে খুলে নিয়ে ততক্ষণে তিনি পকেটে পুরেছেন। যদিও ওই দাঁতের পাটির সঙ্গে 'বা-ইলা' উপজাতির কী সম্পর্ক থাকতে পারে সে কথা তখনও তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট লসন আবার শুরু করলেন,—'কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার বয়ঃসন্ধিকালে বা-ইলা যুবকদের এক ভয়ংকর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। নিজের পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য একা তাকে একটি সিংহের সম্মুখীন হতে হয়, এবং কেবলমাত্র একটি বল্লমাকৃতির বংশদণ্ডের সাহায্যে ওই সিংহটিকে শিকার করতে হয়। ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বা-ইলা যুবকের মুখের সামনের দিকের দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়। এটি তার কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা এবং সিংহজয়ী পুরুষের প্রতীকচিহ্ন। ওই চিহ্ন তাকে বালক এবং কিশোরদের থেকে আলাদা করে দেয়।

তুমি ওই 'বা-ইলা' দের অনুকরণ করেছ মনে করেই স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে দেখে হেসেছে।''

জ্যাকোয়েস্ট স্বস্তি পেলেন। বুঝেসুঝে বোকা হওয়া খুবই অস্বস্তির ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু না বুঝে বোকা সাজা তো রীতিমতো শাস্তি!

তখনকার মতো আশ্বস্ত হলেও, লসনের কথাগুলো জ্যাকোয়েস্টের মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল। সিংহবিক্রম 'বা-ইলা'-দের দেখবার প্রবল ইচ্ছা তাঁকে পেয়ে বসল।

সুযোগও এসে গেল মাসকয়েক বাদে...

পুলিশের প্রথামত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য সুপারিন্টেন্ডেন্টে লসন দায়িত্ব দিলেন জ্যাকোয়েস্টের উপর। জ্যাকোয়েস্টের কৌতূহলের কথা

তাঁর মনে ছিল। সঙ্গে দেওয়া হল একজন সার্জেন্ট ও ছ'টি কনস্টেবল। সার্জেন্টটি স্থানীয় অধিবাসী। ফলে 'গাইড' হিসাবেও মন্দ নয়।

যাত্রাপথে মূল পরিবহন নৌকা, সুতরাং ভাড়া করা ছাড়া উপায় নেই। স্থানীয় অধিবাসীরা 'ম্যকোয়া' গাছের কাঠ দিয়ে বিশেষ একধরনের নৌকা প্রস্তুত করে। তারই একটা ভাড়া করে ছোট দলটির যাত্রা শুরু হল জাম্বেসীর বুকে। বিস্তৃত নদী জাম্বেসী। একবার নৌকা উলটে গেলে নদীবক্ষে দলে দলে বিচরণশীল নক্রকুল অথবা জলহস্তীর জলযোগে পরিণত হওয়াও আশ্চর্য নয়...

নদীপথে গন্তব্যস্থান ছিল 'মংগু' নামক একটি ছোট শহরতলি। অতঃপর স্থলপথে 'ম্যাংকোয়া' পর্যন্ত।

যাত্রাপথ মোটামুটি নির্বিঘ্নেই কাটল। পাঁচদিনের জলবিহার শেষে জ্যাকোয়েস্ট তাঁর দলবল নিয়ে এসে পৌঁছলেন 'মংগু'-তে।

ছোট শহরটির শাসনকার্য পরিচালনা করেন জনৈক ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। জ্যাকোয়েস্ট তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন। ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মিঃ সিম্পসন নিঃসন্দেহে যোগ্য ব্যক্তি। ভদ্রলোক যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং তাঁর আওতায় গোটা অঞ্চলটি সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। এছাড়া জনৈক ডাক্তার এবং কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর দেখা পেলেন জ্যাকোয়েস্ট। স্থানীয় পসারিদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রিসদেশীয় অথবা ভারতীয়।

সরকারি অতিথিশালায় থাকার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু মিঃ সিম্পসনের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করলেন জ্যাকোয়েস্ট।

ওইদিন বিকেলে কথায় স্থানীয় অধিবাসীদের প্রসঙ্গ উঠল। জ্যাকোয়েস্ট তাঁর কৃত্রিম দন্তপংক্তির ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে, সিম্পসনকে তাঁর কৌতূহল এবং আগ্রহের কথাও জানালেন। প্রত্যুত্তরে মিঃ সিম্পসন যে প্রস্তাব রাখলেন সেটি চমকপ্রদ—

মাইল ত্রিশেক দূরের একটা 'বা-ইলা' গ্রামে জনৈক মোড়লের ছেলে বয়ঃসন্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং এই সময়টি যেহেতু পশুরাজের মিলনকাল বা mating season, সেই কারণে ওই বিশেষ উৎসবটি অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে সুবর্ণ সময়। জ্যাকোয়েস্ট ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁকে উক্ত অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

এ যেন 'মেঘ না চাইতে জল পাওয়া'। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন জ্যাকোয়েস্ট।

পরদিন প্রত্যুষে আফ্রিকান সার্জেন্টকে সঙ্গে নিয়ে ট্রাকে চড়ে পূর্বে উল্লিখিত 'বা-ইলা' গ্রামটির দিকে যাত্রা করলেন তিনি। সার্জেন্টটি স্থানীয়, ফলে দোভাষীর কাজ দেবে। উপরন্তু, মিঃ সিম্পসন যে

ট্রাকচালকটিকে সঙ্গে দিয়েছিলেন, পথপ্রদর্শকের কাজও সে বেশ ভালোমতো চালাতে সক্ষম।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কিন্তু প্রথমে বেশ কিছুটা অবাক হলেন জ্যাকোয়েস্ট। গ্রামের মধ্যে একটিও পুরুষের চিহ্ন নেই। কেবল স্ত্রীলোকেরা দুপুরের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কতগুলো উচ্ছিষ্ট-লোভী কুকুর। আর কোনো প্রাণের সাড়া চোখে পড়ে না।

জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল যে গ্রামের সমস্ত পুরুষ ও যুবকরা জঙ্গলে গেছে সিংহের খোঁজ করতে, ফলে গ্রামে এখন কেউ নেই। তবে 'বাওয়ান' (সাহেব) যদি অপেক্ষা করেন তাহলে দুপুরেই তাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে।

দেখতেই এসেছেন জ্যাকোয়েস্ট, ফলে তিনি বিশ্রামের উদ্যোগ করলেন।

বেলা যত বাড়তে লাগল, ছোট ছোট দল বেঁধে কিশোর অথবা যুবকরা গ্রামে ফিরতে শুরু করল। বিকেল পড়তে পড়তে প্রায় সবাই গ্রামে ফিবে এল।

গ্রামের মোড়লের ছেলে 'চুলা'। তাকে ডেকে পাঠালেন জ্যাকোয়েস্ট। সে এল। হ্যাঁ! জরীপ করার মতোই একখানা চেহারা বটে! তার আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন জ্যাকোয়েস্ট। উদ্ধত, বলিষ্ঠ 'বা-ইলা' যুবক। উন্নত ললাটের নীচে একজোড়া চোখের দৃষ্টি শীতল। মুখের আদল মোটেই প্রতিবেশী উপজাতিদের সদৃশ নয়—পাথর কেটে খোদাই করা মুখাবয়বের সঙ্গে আরবদেশীয়দের আর্শ্চয সাদৃশ্য বর্তমান। বলিষ্ঠ দেহ জুলু যোদ্ধাদের মতো ছিপছিপে। তার কাছে জ্যাকোয়েস্ট জানতে পারলেন যে আজ সারাটা দিন খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে একটি সিংহীর দেখা পাওয়া গেছে। গ্রাম থেকে অদূরবর্তী একটা জলাশয়ের ধারে একটা জেব্রা শিকার করে নিয়ে এসে সে আস্তানা গেড়েছে। খাদ্য এবং জলের প্রাচুর্য থাকায় সে অন্তত দিন দুই ওই আস্তানা গোটাবে বলে মনে হয় না। সুতরাং, পর দিন উষাকালেই 'চুলা' ওই সিংহীটার মুখোমুখি হবে।

সে দিন সারারাত আশেপাশের গ্রাম থেকে ক্রমাগত দলে দলে লোক এসে জমায়েত হতে লাগল পূর্বোক্ত গ্রামটিতে। সারারাত ধরে মশালের

আলোয় চলল অবিরাম মদ্যপান। বহু চেষ্টা করেও জ্যাকোয়েস্ট দু-চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। গ্রামের অধিবাসীদের উত্তেজনা তাঁকেও স্পর্শ করেছিল।

জ্যাকোয়েস্টের ঘড়িতে তখন ভোর চারটে।

পথপ্রদর্শক এসে জানাল সময় হয়ে গেছে। তৈরিই ছিলেন জ্যাকোয়েস্ট। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গাইডের অনুসরণ করলেন। গ্রামের মধ্যে থেকে এক জনস্রোত এগিয়ে চলেছে অরণ্যের পথে। তাদের সঙ্গে , প্রায় পাঁচফুট লম্বা একটা বাঁশ হাতে চলেছে এক অপরূপ মূর্তি—'চুলা'।

বেশ কিছুটা পথ চলার পর এক বিরাট উইঢিপির সামনে এনে জ্যাকোয়েস্টকে দাঁড় করাল পথপ্রদর্শকটি। পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত স্থান। উইঢিপিটার উপর থেকে অগ্রবর্তী সব কিছুই সহজে দৃষ্টিগোচর হবে। ধীরে ধীরে জ্যাকোয়েস্ট ঢিপিটার উপরে উঠে পড়লেন। আফ্রিকার সমতলভূমি তখনও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক উইঢিপির উপর দাঁড়িয়ে আছেন জ্যাকোয়েস্ট।

প্রথম উষার আলো ধীরে ধীরে ফুটে উঠল দিগন্ত জুড়ে। সাদা-কালোর আঁচড়ে ফুটে উঠতে লাগল বিভিন্ন দৃশ্যপট। সম্মুখের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, ইতস্তত ছড়ানো দু-চারটে গাছ, উঁচু উইঢিপি। নীচে দৃষ্টিপাত করলেন জ্যাকোয়েস্ট।

বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে এক চলন্ত বৃত্ত—'বা-ইলা' যোদ্ধাদের সারি। প্রায় দুশো গজ ব্যাসযুক্ত সেই বৃত্তের মধ্যস্থলে একটি ঝোপ জ্যাকোয়েস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ঝোপের আড়ালে শায়িত একটি ধূসর দেহ। এত দূর থেকেও জ্যাকোয়েস্টের পক্ষে বস্তুটির স্বরূপ উপলব্ধি করতে বিলম্ব হল না—ঘুমন্ত সিংহী!

ক্রমশ সংকুচিত হয়ে এল বৃত্তাকারে সারিবদ্ধ যোদ্ধার দল। নিস্তব্ধ, নীরব তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের বুকে শুধু মন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে চলেছে একদল মানুষ।

ঘুমন্ত সিংহীকে কেন্দ্র করে ক্রমশ ছোট, আরও ছোট হয়ে এল বেষ্টনী। তারপর হঠাৎ প্রত্যুষের শান্ত নীরবতাকে খান খান করে দিয়ে প্রান্তরের বুকে জেগে উঠল সহস্র উন্মত্তকণ্ঠের বীভৎস ঐকতান। যেন

এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রে প্রতিটি 'বা-ইলা' যুবকের রক্তে জেগে উঠেছে বন্য হিংসা, দেহের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে জেগেছে হত্যার উন্মাদনা। টিনের ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে তারা এগিয়ে চলল সিংহীটার দিকে। জ্যাকোয়েস্টের মনে হল তাঁর সামনে নরকের সব ক'টা দরজা যেন কেউ একমুহূর্তে খুলে দিয়েছে...

ঝোপের আড়ালে উঠে দাঁড়াল ক্রুদ্ধা সিংহী। নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তি এবং আক্রমণের আকস্মিক ধাক্কায় সে খানিকটা বিচলিত। আন্দোলিত সুদীর্ঘ লাঙ্গুল, ত্রস্তদৃষ্টি, অভিব্যক্তিতে ভয় এবং ঘৃণার ভাব পরিস্ফুট।

শ্বাপদের মতো ঋজু পদক্ষেপে চুলা প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হল। তার দৃঢ়মুষ্টিতে বল্লমের মতো সুতীক্ষ্ণ বংশদণ্ড শক্ত করে ধরা। দু-চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শত্রুর গতিবিধির উপর সতর্ক পরীক্ষায় নিবদ্ধ। সিংহীও ততক্ষণে তার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবিষ্কার করে ফেলেছে—তার শীতল, ধূসর দুটি চোখ আর ত্রস্ত নিরীক্ষণে ব্যস্ত নয়, চুলার উপর স্থির। সম্মুখ দ্বৈরথের জন্য প্রস্তুত হল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে থেমে গেল সমস্ত কোলাহল। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, প্রান্তরের বুকে পুনরায় বিরাজ করতে লাগল স্তব্ধতার রাজত্ব।

প্রতিটি মুহূর্ত এক একটা যুগ মনে হচ্ছে জ্যাকোয়েস্টের। নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন তিনি। অজানিত আশংকা নিয়ে এ এক আশ্চর্য প্রতীক্ষা...

ধীরে ধীরে সতর্ক পায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে এল চুলা, দুজনের মধ্যে দূরত্ব হবে আর বড়জোর পনেরো ফুট। চুলার দু-হাতে শক্ত করে ধরা ছুঁচোল বাঁশের দণ্ডটি শত্রুর দিকে আনত...

সিংহীর উন্মুক্ত ওষ্ঠের ফাঁকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল তীক্ষ্ণ দন্তের সারি, কণ্ঠদেশ থেকে নির্গত হল অবরুদ্ধ গর্জনধ্বনি। তার প্রকাণ্ড শরীরের সমস্ত মাংসপেশিগুলো সংকুচিত হয়ে এল। আক্রমণের পূর্বসংকেত!

চুলার ছিপছিপে বলিষ্ঠ দেহ ধনুকের মতো বেঁকে গেল চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায়।

মুহূর্তের অপেক্ষা...

তারপরই প্রচণ্ড গর্জনে বনভূমি প্রকম্পিত করে সিংহী লাফ দিল। একটা ধূসর বিদ্যুৎ উড়ে এল চুলার দিকে।

এক ইঞ্চি নড়ল না 'বা-ইলা' যুবক।

জ্যাকোয়েস্টের মনে হল চুলার হাতের 'অস্ত্রের' নাগাল এড়িয়ে সিংহী তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর এসে পড়েছে—আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে নখ ও দাঁতের ক্ষিপ্র সঞ্চালনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে হতভাগ্য বা-ইলা যুবকটির দেহ।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না।

দু-হাতের প্রাণপণ শক্তিতে চুলা তখন বাঁশটাকে ধরে রেখেছে মাটিতে ঠেস দিয়ে। আর তার মাথার উপর বাঁশের ছুঁচোল ফলায় বিদ্ধ হয়েছে সিংহীর কণ্ঠদেশ।

কৌশল, শক্তি এবং বুদ্ধির জোরে চুলা উত্তীর্ণ হয়েছে তার যৌবনের অগ্নিপরীক্ষায়।
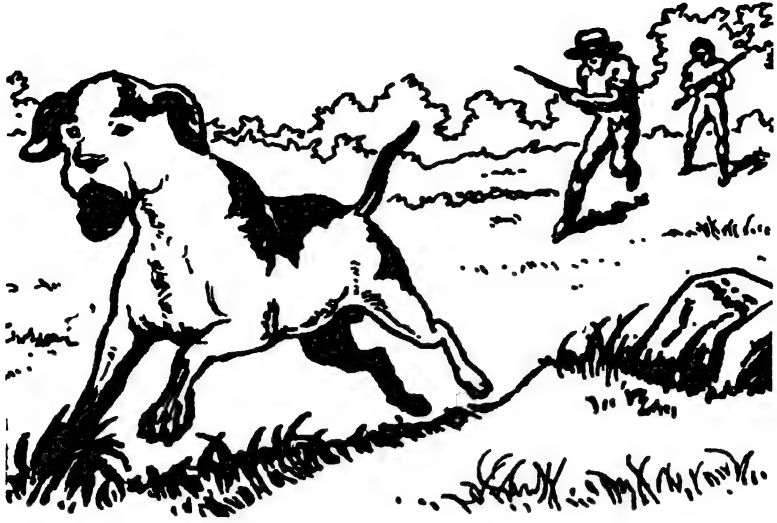
'এবার আমার পালা!'

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ শিকারির কাছে একান্তই নিরীহ গোছের ভূখণ্ড। গোটা মহাদেশটা জুড়ে রোমাঞ্চের কোনো স্বাদ-গন্ধ নেই বললেই হয়। এখানে নেই 'কেপ-বাফেলোর' মতো ভয়ঙ্কর বুনো মোষ, কি জীবন্ত ট্যাঙ্কের মতো খড়্গধারী গন্ডার—এখানে ঝোপঝাড়ে সবুজ মরকত মণির মতো জ্বলে ওঠে না পশুরাজ সিংহ, কেঁদো বাঘ, লেপার্ড কি জাগুয়ারের হিংস্র চোখ—অথবা বিরাট থামের মতো গাছ শুঁড়ের টানে মাটিতে নামিয়ে আনে না কোনো দাঁতাল হাতি; মোট কথায় হিংস্র শ্বাপদ কিম্বা অতিকায় তৃণভোজী গোষ্ঠীর কোনো কুলীনরাই এই দেশে ঘর বাঁধেনি। সুতরাং এরকম একটা নিরামিষ জায়গাকে আর যে বিশেষণেই ভূষিত করা হোক, অন্তত 'শিকারির স্বর্গভূমি' তো আর বলা যায় না।

তবু বিপত্তি ঘটে মাঝে মাঝে। আর সেই বিপত্তির ঠেলা সামলাতে তখন অসমসাহসী পেশাদার শিকারিরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়; তখন আর মুহূর্তের জন্য মনে হয় না যে এই মহাদেশটা নিতান্তই

নিরীহ গোছের, বরং মনে হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নগুলো যেন সশরীরে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে দলে দলে। শরীরী দুঃস্বপ্নের মতো অষ্ট্রেলিয়ার এই আতঙ্কের কারণ যে প্রাণী, তার নাম—'ডিংগো'। এক ভয়ঙ্কর জাতের বুনো কুকুর।

এই ডিংগো শিকার করতে গিয়েই এই শোচনীয় আর ভয়ঙ্কর স্মৃতি নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসেছিল আমেরিকান শিকারি হ্যারি হফম্যান। হফম্যানের সেই কাহিনিই এখন আমরা শুনব।

মজার কথা হল, খাস মার্কিন মুলুকের বাসিন্দা হ্যারি হফম্যানের সঙ্গে সাগরপাড়ে সুদূর অস্ট্রেলিয়ার ওই বুনো কুকুরদের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো কারণই ছিল না। এমনকী, বন্দুক রাইফেলে হাত পাকাবার সময়েও কোনোদিন হ্যারি ওই হতচ্ছাড়া কুকুরগুলোকে শিকার করার কথা ভাবেনি। কিন্তু নিয়তির বিধান এড়াবে, এমন সাধ্য কার?

ঘটনার শুরু ১৯৫৯ সালের মে মাসে—

মার্কিন মুলুকে একটা খামার তত্ত্বাবধানের কাজ করত হ্যারি হফম্যান। খামারে গরু-ভেড়া-ছাগল এই সব জন্তুগুলোকে দেখাশোনা করার সাথে সাথে আরও একটা কাজ ছিল তার। শিকারের লোভে খামারের চারপাশে হানা দিয়ে ফেরে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। আকারে-আয়তনে উত্তর আমেরিকার 'টিম্বার উল্‌ফের' মতো বড় না হলেও এদের স্বভাব-চরিত্র সুবিধার নয়। এদের বলে 'কয়োট'।

এই হিংস্র শ্বাপদগুলোকে নিরস্ত করার একটাই উপায় জানা ছিল হফম্যানের, তা হল নিজের রাইফেলটার সদ্ব্যবহার করা। কয়েকটা সঙ্গীর মৃতদেহ লুটিয়ে পড়তে দেখলে তখন জন্তুগুলো সরে পড়ত। দিন কয়েকের জন্য কমত তাদের দৌরাত্ম্য। কিন্তু সে আর কতদিনের জন্য? আবার দু-দিন যেতে না যেতেই হানা দিত নেকড়ের দল, হফম্যানকে আবার বেরোতে হত বন্দুক হাতে। এই ভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কপাল মন্দ হ্যারি হফম্যানের। খামারের মালিক খামার বেচে দিল অন্য লোকের কাছে। নতুন মালিক এসে বেশ কয়েকজনকে ছাঁটাই করল; ভাগ্যদোষে হফম্যানও তাদের মধ্যে পড়ে গেল।

চাকরি যাওয়া সোজা, কিন্তু পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে হফম্যান আবার বিবাহিত, সুতরাং সংসারের দায়িত্ব রয়েছে তার। ফলে খানিকটা

দুশ্চিন্তায় তাকে পড়তে হল বইকী। এই সময়ই প্রথম তার মাথায় চিন্তাটা আসে।

কদিন আগে 'ডেনভার পোস্ট' কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় ইদানীংকালে ডিংগোর উৎপাত নাকি প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা হল পশুপালন। এখন ওই শয়তান কুকুরগুলোর জ্বালায় খামারের মালিকদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিদিন হাজার হাজার বাছুর আর ভেড়া মারা যাচ্ছে ডিংগোর কবলে।

দিন নেই, রাত নেই, যখন-তখন এসে হানা দিচ্ছে নেকড়ের মতো ভয়ঙ্কর ওই বুনো কুকুরের পাল; খামারের লোকজন সতর্ক হয়ে বাধা দেবার আগেই কাজ শেষ করে তারা গা-ঢাকা দিচ্ছে আশেপাশের জঙ্গলে। শুধু তাদের উপস্থিতির কথা জানাতে খামারের এখানে ওখানে পড়ে থাকছে কয়েকটা মরা ভেড়া কি বাছুরের রক্তাক্ত দেহ। দিনের পর দিন এই ভাবে আর কত সহ্য করা যায়, ফলে খামারের মালিকরা ছাড়াও সরকারকে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয়েছে। কিন্তু অনেক মাথা ঘামিয়েও সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি।

বুনো কুকুরগুলো অস্ট্রেলিয়ার সরকারকে মেনে চলতে রাজি নয়। বুদ্ধির পাল্লাতেও তারা কম যায় না। ফাঁদ পেতে কুকুর ধরার চেষ্টা হয়েছে, সযত্নে তারা সেই ফাঁদ এড়িয়ে গেছে। খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রাখলে তারা সে খাবার স্পর্শমাত্র করেনি। আরও কত রকমের যে চেষ্টা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কোথায় কি? সরকার আর খামার মালিকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কুকুরগুলো তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে একটানা। শেষ পর্যন্ত সরকারকে শিকারিদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। প্রতিটা কুকুরের মাথার দাম হিসাবে সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে এক পাউন্ড বা প্রায় ষোল টাকার মতো।

এই পুরস্কারের ব্যাপারটাই মনে ধরল হফম্যানের। খামারের কাজ করার সময় নেকড়ে মেরে হাত পাকিয়েছে সে, ফলে ওই বুনো কুকুরগুলোকে শিকার করা তার কাছে খুব একটা কঠিন কাজ বলে মনে হল না। অস্ট্রেলিয়ায় ডিংগোর অভাব নেই। এমনকী দিনে গোটা পঞ্চাশেক করে শিকার করাও অসম্ভব কিছু নয়। অর্থের দিক দিয়ে

সেটা রীতিমতো লাভজনক।

অস্ট্রেলিয়ায় যাবার আরও একটা কারণ ছিল হফম্যানের। স্ত্রী ম্যাডালীন হল অস্ট্রেলিয়ারই মেয়ে। তার বাবা-মা সেখানেই থাকেন। অনেকদিন হল বাবা-মাকে দেখেনি ম্যাডালীন, হফম্যানও যথেষ্ট সময় করে উঠতে পারেনি তাকে নিয়ে যাবার জন্য। এখন রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই চলতে পারে। ম্যাডালীন যাবে বাবা-মাকে দেখতে, আর হফম্যান উপার্জনের চেষ্টায়। দেখা যাক, সেরকম রোজগার-পত্তর হলে আমেরিকায় ফিরে নিজের নামেই একটা খামার কিনে নেবে'খন হফম্যান। মোটামুটি এই ধরনের একটা পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ষাট সালের গোড়ার দিকে প্লেনে চড়ে হ্যারি হফম্যান সস্ত্রীক পাড়ি জমাল অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে।

এগারোই জানুয়ারি ব্রিসবেনে এসে নামল হফম্যান আর ম্যাডালীন। ম্যাডালীনকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে হফম্যান এসে দেখা করল ব্রুস ক্যাভানোর সাথে। ক্যাভানো প্রৌঢ় মানুষ। ক্ষেতখামারের সংরক্ষণের কাজে সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

আন্তরিকভাবেই হফম্যানকে অভ্যর্থনা জানালেন ক্যাভানো। তারপর আলোচনার শুরুতেই বললেন, 'কুকুরগুলোর সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আগে শুনে নিন, তারপর আপনার পথ আপনি ঠিক করবেন।'

'সত্যি বলতে কি, শয়তানগুলো আমাদের জ্বালিয়ে খেল মশাই, নইলে সরকার কি দানসত্র খুলে বসেছে যে কুকুর মারলে টাকা দেবে। চেষ্টা হয়েছে হাজার রকমের, কিন্তু কিছুতেই কিছু লাভ হচ্ছে না, তাই শেষমেষ এখন এই পথই ধরতে হয়েছে আমাদের। অন্য আর উপায় কি বলুন? কিন্তু এতেই বা বিশেষ সুবিধে হচ্ছে কই?'

'এখানকার আদিবাসী শিকারিরাও হয়েছে তেমনি। গোটাকয়েক কুকুর মেরে যেই কিছু টাকা পেল, অমনি রইল তার শিকার, বাবু বেরিয়ে পড়লেন ফূর্তি করতে; শত চেষ্টা করেও আর তাদের আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। অথচ ওদের বাদ দিলেও চলে না, এখানে ওদের সাহায্য ছাড়া আপনি একটা কুকুরের টিকি খুঁজে বার করতে পারবেন না, শিকার তো দূরের কথা।'

'বুনো কুকুরগুলো ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁই-এর আড়ালে এমন

ভাবে লুকিয়ে থাকে, যে হাজার চেষ্টা করলেও কোনো বিদেশি শিকারির পক্ষে ওদের খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। ওদের খুঁজতে দরকার স্থানীয় আদিবাসীদের বনে-জঙ্গলে অভ্যস্ত সতর্ক চোখ। তাই শ্বেতাঙ্গ বা অন্যান্য বিদেশি শিকারিরা যখন ডিংগো মারতে আসেন, তখন তাদের সঙ্গে আমরা একজন করে স্থানীয় আদিবাসী শিকারি দিয়ে দিই। কুকুর-পিছু টাকা পায় বিদেশি শিকারি, আদিবাসীটি মাস-মাইনেতে কাজ করে। আপনাকেও আমরা একজন সঙ্গী দিয়ে দেব।' একটু থামলেন ক্যাভানো তারপর বললেন, 'তবে একটু সাবধানে থাকবেন মিঃ হফম্যান ডিংগোর দাঁতে বড় মারাত্মক বিষ। একবার কামড়ালে আর রক্ষা নেই—সঙ্গে সঙ্গে ঠিকমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে মানুষটাকে বাঁচানো খুবই কঠিন। তাই একটু বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করবেন।'

পরদিন সকালে প্লেনে করে হফম্যান তার আদিবাসী সঙ্গীকে নিয়ে পাড়ি দিল উত্তর-পশ্চিম কুইন্সল্যান্ডের দিকে। ক্যাভানোর কথামতো এই জায়গাতেই এখন ডিংগোর দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। পথে যেতে যেতে সঙ্গীটির সঙ্গে বেশ আলাপ জমে গেল হফম্যানের। তার নাম 'টমি'। লোকে ডাকে 'ন্যাটা টমি' বলে। বয়স হবে বছর সাতাশ। পড়াশোনাও করেছে সরকারি স্কুলে, ফলে কথাবার্তা চালাবার মতো চলনসই ইংরেজি জানা আছে তার। হফম্যানের কোনো অসুবিধাই হচ্ছিল না কথাবার্তা বলতে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই প্লেন এসে নামল এক বিরাট খামারের মাঝখানে। ওদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে আবার উড়ে চলে গেল। খামারের মালিক মিঃ উইলোবি জাতে ইংরেজ, অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ধনী খামার-মালিকদের একজন।

বিরাট খামার, লোকলস্কর, গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে বেশ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অঞ্চল গড়ে তুলেছেন উইলোবি। সব কিছুই পাওয়া যায় এখানে।

খামারের মাঝখানে বেশ সুন্দর একটা বাংলো-ধাঁচের বাড়ি। উইলোবির সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওই বাংলোর বারান্দায় বসে। হঠাৎ কথা বলার মাঝখানে লাফিয়ে উঠলেন উইলোবি। অনেকটা দূরে ঘাসজমির উপর চরে বেড়াচ্ছে ষাঁড় আর গরুর পাল। খানিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শয়তানগুলো আবার হানা দিয়েছে', বলেই বারান্দার

দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকটা এক ঝটকায় টেনে নিয়ে ছুটলেন বাইরের দিকে। টমি আর হফম্যানও তাঁর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল—

দূরে, বেশ কিছুটা দূরে যেখানে খামারের জন্তুগুলো চরে বেড়াচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে হফম্যানের চোখে পড়ল কতগুলো বাদামি রঙের ছোট ছোট প্রাণী লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে পালটার দিকে। বাংলোর বাইরে ঘোড়া রাখা ছিল। চটপট উঠে পড়ে ঘোড়া ছোটাল তিনজন। মিনিট পাঁচকের মতো সময় লাগল অকুস্থলে পৌঁছতে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। কাজ সমাধা করে ডিংগোর দল গা-ঢাকা দিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। ঘাসজমির উপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা অল্পবয়সি ষাঁড়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ—পেট চিরে ফেলে তাদের 'লিভার' গুলো উদরস্থ করেছে খুদে শ্বাপদের দল। 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি',

মনে মনে ভাবল হফম্যান; পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই ডিংগোর সাথে ভালোমতো আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল।

পরের দিন সকালেই টমিকে সঙ্গে নিয়ে হফম্যান বেরিয়ে পড়ল ডিংগোর খোঁজে—

ডিংগোর দল সাধারণত গরু কিংবা ভেড়ার পালের কাছাকাছি সুযোগের অপেক্ষায় ঘরঘর করে বেড়ায়। সেই আন্দাজমতো দূরে যেখানে উইলোবির খামারের একপাল গরু-ভেড়া চরছিল সেদিকে এগিয়ে গেল শিকারি দুজন। কিছুটা গিয়ে একটা বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। হফম্যানকে অপেক্ষা করতে বলে টমি তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে গেল উপরে, তারপর সেখান থেকে সতর্ক চোখে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারদিক। এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ চোখ ঘোরাবার পর হঠাৎ তার দৃষ্টি এক জায়গায় এসে আটকে গেল। অনেকটা দূরে ঝোপের মধ্যে একটা কিছুর নড়াচড়া তার চোখে পড়েছে। লালচে বাদামি রঙের কয়েকটা সচল বস্তু—ডিংগো!

মাটির উপর দিয়ে দৌড়ে গেলে কুকুরগুলো দেখতে পেয়ে পালাবে, তাই ঝোপঝাড়ের আড়ালে হামাগুড়ি দিতে দিতে তারা এসে পৌঁছল গরু-ভেড়ার পালটার কাছাকাছি। মাটির উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে থাকা অবস্থাতেই টমি তার রাইফেলের সেফটি ক্যাচ টেনে তৈরি হয়ে নিল। হফম্যানও প্রস্তুত হল।

খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ পাশের জঙ্গল থেকে মাঠের উপর বেরিয়ে এল একটা বাদামি রঙের কুকুর। মুখের আদল অবিকল নেকড়ের মতো, সতর্ক চলাফেরা। তার পিছনে আর একটা, আরও একটা, আরও আরও আরও...প্রায় গোটা বারো জন্তু আত্মপ্রকাশ করল মাঠটার উপর সরীসৃপের মতো মসৃণ, সতর্ক গতিতে তারা এগিয়ে চলল গরুর পালটার দিকে। মৃত্যু-দূতের দল!

কানের কাছে একটা ফিসফিসে গলা শুনতে পেল হফম্যান, 'সাহেব, গুলি চালাও।' সঙ্গে সঙ্গে একটা রাইফেলও গর্জন করে উঠল। কথা বলতে বলতেই গুলি চালিয়েছে টমি।

অভ্রান্ত লক্ষ্য। কপালের ঠিক মাঝখানে মৃত্যুচুম্বন নিয়ে লুটিয়ে পড়ল একটা ডিংগো। আবার গর্জে উঠল টমির রাইফেল। আরো একটা কুকুর

লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ততক্ষণে হফম্যানও শুরু করে দিয়েছে। বারবার দুজনের হাতের রাইফেল আগুন ঝরিয়ে ধমকে উঠছে আর মাটিতে শুয়ে পড়েছে একটার পর একটা জন্তু। কিন্তু তার ফলে গোটা দলটা এক মুহূর্তের জন্যেও থমকে দাঁড়াচ্ছে না; গরম সীসার মৃত্যুঝড়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছে কুকুরগুলো। পাশের সঙ্গী শুয়ে পড়ছে মাটিতে, তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। স্থির লক্ষ্যে তারা এগিয়ে চলেছে শিকারের দিকে।

এক এক করে সবক'টাকে মেরে রাইফেল নামাল দুজনে। খানিকটা খুশি হয়েই বলল হফম্যান 'জন্তুগুলো রাইফেলকে ভয় পায় না, দেখছি। তাহলে ওদের মারতে তো কোনো অসুবিধাই নেই।'

উত্তরে মৃদু হাসল টমি, 'ঠিকই বলেছেন; কিন্তু অন্য দিকটা বোধহয় আর ভেবে দেখেননি। ভগবান না করুন, তবে যদি কখনো সাত-আটটা কুকুর একসাথে আপনাকে তাড়া করে বন্দুকের কথা ছেড়ে দিন, রিভলবারের ছ'ছটা গুলিতে ছ'টাকে মেরেও আপনি নিষ্কৃতি পাবেন না। সাত নম্বরটা আপনাকে নির্ঘাত কামড়াবে, গুলি ভরারও সুযোগ মিলবে না তখন। আর একবার কামড়ালে কী হয়, তা তো জানেনই।'

না, বিপদের দিকটা একেবারেই ভেবে দেখেনি হফম্যান, কথাগুলো শুনতেও খুব একটা ভালো লাগল না তার, ফলে সে চুপ করে গেল। টমি নেহাত মিথ্যে বলেনি, বিনা ঝুঁকিতে শুধু শুধু এতগুলো টাকা সরকারের দিতে দায় পড়েছে। নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথ ধরল হফম্যান, 'আর একটু সাবধান হতে হবে।'

মাঝে কেটে গেল বেশ ক'টা দিন। এইভাবেই ক্রমাগত ডিংগো মেরে চলল দুই শিকারিতে মিলে। টমি ডিংগোর দল খুঁজে বের করত, তারপর দুজনে মিলে সেগুলোকে সাবাড় করা হত। প্রতিদিন প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটা ডিংগোর মাথার ছাল জমা হতে লাগল তাদের থলিতে। ক'টা ডিংগো মারা হল চামড়াগুলো তার প্রমাণ। পরে ওই চামড়াগুলোকে সরকারি অফিসে জমা দিয়ে টাকা নিয়ে নিত হফম্যান। চামড়া পিছু এক পাউন্ড।

কয়েক সপ্তাহ টানা শিকারপর্ব চালিয়ে কিছু টাকা রোজগার হলে হফম্যান মাঝে মাঝে ব্রিসবেনে স্ত্রীর সঙ্গে ক'টা দিন কাটিয়ে আসত।

ফিরে এসে আবার শুরু হত কুকুর মারার পালা।

এইভাবে প্রায় মাস চারেক চলার পর হঠাৎ উইলোবির খামার থেকে উধাও হয়ে গেল কুকুরের দল। ফলে তাদের খোঁজে হফম্যান আর টমিকেও সরে যেতে হল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কাইনুনা অঞ্চলে। এর মধ্যে তিন-তিনটে ঘোড়া কিনে ফেলেছিল হফম্যান। দুটো তার আর টমির চড়বার জন্য, অন্যটার পিঠে চাপত মালপত্র।

কিন্তু কাইনুনায় এসে হফম্যানকে অন্য উপদ্রবের মুখোমুখি হতে হল। জায়গাটা বিষাক্ত পোকামাকড়ে ভর্তি, বিশেষ করে ইঞ্চি-দুয়েক লম্বা 'ফানেল-ওয়েব স্পাইডার' বলে এক ধরনের মাকড়শার জন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হত। ওই বিষাক্ত মাকড়শা কামড়ালে আর রক্ষা নেই—যত বড় জোয়ান হোক না কেন, দশঘণ্টার মধ্যে অনিবার্য মৃত্যু! তার উপর এখানে দিনের বেলায় যেমন গরম, রাতে তেমনই শীত। তবু এত সব অসুবিধা হফম্যান মানিয়ে নিয়েছিল একটা মাত্র কারণে—এখানে ডিংগো প্রচুর, শিকারও চলছিল মহা উদ্যমে। সপ্তাহ শেষে অতগুলো করে টাকা পাওয়ার জন্যই বোধহয় অসুবিধাগুলো গা-সওয়া হয়ে গেছিল।

এরই মধ্যে একদিন শিকারে বেরিয়ে দেখা হল আর এক শ্বেতাঙ্গ শিকারির সঙ্গে। তার সাথেও রয়েছে একজন আদিবাসী। দুজনে চলেছে জিপগাড়িতে চড়ে। হফম্যানকে দেখে সাদাচামড়ার শিকারিটি গাড়ি থামাল। খানিকক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পর কথায় কথায় বলল, 'আরে মশাই, মাটিতে হেঁটে ডিংগো মারছেন কেন? একটা জিপ কিনে ফেলুন। কুকুরগুলোর মজা হল, গাড়ি দেখলেই পাশে পাশে ছুটতে থাকে—আর গুলি করলে যে পালায় না সে-কথা তো নিশ্চয়ই জানেন। সুতরাং এবার মেরে যান যতগুলো ইচ্ছে। দেখুন না আমার থলিটা, তাহলেই বুঝবেন।'

কথাটা মনে ধরল হফম্যানের। দিন কয়েকের মধ্যেই একটা জিপগাড়ির বন্দোবস্ত করে ফেলল সে। কাছাকাছি অঞ্চলেরই একজনের কাছ থেকে চলনসই গোছের দামে গাড়িটা পাওয়া গেল।

ফল ফলল একেবারে হাতেনাতে। জিপে ঘুরে দিনে প্রায় ষাটটা করে কুকুর মারতে শুরু করল হফম্যান আর টমিতে মিলে। রোমাঞ্চ আর

টাকার নেশা পেয়ে বসল হফম্যানকে। ম্যাডালীনের সপ্তাহ ধরে চলতে লাগল শিকার।

হিসাব করে হফম্যান দেখল এইভাবে চললে আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই মার্কিন মুলুকে ফিরে গিয়ে সে অনায়াসে একটা ছোটখাটো খামার কিনে নিতে পারবে। সেই পরিকল্পনা মতো অন্তত আর কয়েকটা সপ্তাহ অস্ট্রেলিয়ায় কাটিয়ে যেত হফম্যান, যদি না তাকে এর মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী হতে হত।

১৯৬০ সালের ১৯শে জুন।

সেদিন বৃহস্পতিবার। সকাল দশটা নাগাদ টমিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল হফম্যান।

পাহাড়ি পথ বেয়ে জিপ ছুটে চলেছে টিলার উপরে। খুব বড় গোছের টিলা নয়, ছোট পাথুরে স্তূপমতো। মোটা, শক্ত গোড়া-ওয়ালা কাঁটা গাছ ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদের পক্ষে পাথুরে মাটির বুক ফাটিয়ে এখানে মাথা তোলা কঠিন। এখান থেকে নীচে অনেকদূর অবধি চোখ যায়।

টিলার মাথায় পৌঁছে গাড়ি থামাল হফম্যান। নীচে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র, সবুজ মাঠ আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। নীচে বেশ কিছুটা দূরে বয়ে যাচ্ছে সরু রূপোলি ফিতের মতো মিচেল নদী। তার মধ্যে কোথায় ডিংগো লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষ কাছে থেকেই তা বুঝতে পারবে না, আর এতদূর থেকে তা কোনো প্রশ্নই নেই। তবে টমির কথা আলাদা।

জিপের উপর উঠে দাঁড়িয়ে শিকারি বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল চারিদিক, তারপর এক সময় নীচে মিচেল নদীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওইদিকে চলুন।'

টমির এ ব্যাপারে বিশেষ ভুল-টুল হয় না। তার কথামতো হফম্যান জিপ নামিয়ে আনল টিলার উপর থেকে সমতলভূমিতে; উইঢিবি, ঝোপঝাড় আর পাথর ডিঙিয়ে জিপ নামল এসে হাঁটু-সমান উঁচু ঘাসঝোপের মধ্যে। টমির কথামতো কুকুরগুলোর ওই ঘাসঝোপের মধ্যেই থাকার কথা।

জিপ চলছে,—হঠাৎ একটা বাদামি রঙের কুকুর লাফিয়ে উঠল

ঝোপের মধ্যে থেকে? তারপর আর একটা, আশেপাশে আরও দু-চারটে দেখা দিল। শেষমেষ অনেকগুলো কুকুর জিপটাকে ঘিরে ছুটতে আরম্ভ করল। ডিংগোরা দল বেঁধে থাকে। এই দলটায় ছিল প্রায় গোটা বারো কুকুর।

ব্রেক চেপে গাড়ি থামাল হফম্যান। কুকুরগুলোও জিপটাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল—কেউ কেউ জিপের চারপাশে ঘুরে ঘুরে শুঁকতে লাগল, আবার কেউ কেউ খুদে খুদে সবুজ চোখ মেলে চেয়ে রইল।

পাশে ঝোলানো রাইফেল হাতে তুলে নিল শিকারি দুজন। শুরু হল কুকুর মারার পালা। এমনিতে খুবই সোজা কাজ, তবে একটু দেখেশুনে গুলি ছুড়তে হয়। কুকুরগুলোর দু-চোখের মাঝখানে ইঞ্চি-দুয়েক চওড়া কপালের মতো জায়গাটাতে গুলি করাই ভালো, তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। নইলে আহত ডিংগো বড় মারাত্মক—তখন হয় সে নিজে মরবে, নয় শিকারিকে মারবে। কিন্তু আপাতত সেরকম অসুবিধার কারণ নেই। কারণ, প্রথমত হফম্যান আর টমি দুজনেই পাকা বন্দুকবাজ, দ্বিতীয়ত ডিংগোগুলো একদম হাতের আওতার মধ্যে প্রায় স্থির হয়েই বসে আছে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই সবক'টা জন্তু মারা পড়ল। এইবার চামড়া ছাড়ানোর কাজ—অবশ্য পুরো চামড়াই নয়, কুকুরগুলোর মাথার চামড়াটুকু ছাড়িয়ে নিলেই হবে। রাইফেল রেখে দিয়ে ছুরি হাতে টমি লাফিয়ে পড়ল সেই কাজ করতে। হফম্যানও বন্দুকটা জিপের মধ্যে রেখে একটা বড় ছুরি হাতে নেমে এল টমিকে সাহায্য করতে। এই কাজটা তার একেবারে ধাতে সয় না। কিন্তু তবু একজনের কাজ দুজনে করলে অনেকটা সময় বাঁচে, আর হফম্যানের কাছে এখন সময় মানেই টাকা।

তিনটে কুকুরের চামড়া ছাড়িয়ে সবে চার নম্বরটায় ছুরি লাগিয়েছে হফম্যান, এমন সময় একটা তীব্র আর্তনাদ তার কানে ভেসে এল। টমির আর্তনাদ। ঘুরে তাকিয়ে হফম্যানের চোখে পড়ল এক ভয়াবহ দৃশ্য—

টমিকে আক্রমণ করেছে আর একপাল ডিংগো। একটা কুকুর লাফিয়ে উঠে তার গলায় কামড় বসিয়েছে, গলার শ্বাসনালির উপর

চেপে বসেছে দু-জোড়া শ্ব-দন্ত। টমি দু-হাত দিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেই মরণ-কামড় ছাড়াতে। অন্য ডিংগোগুলোও চুপ করে বসে নেই। তাদের মধ্যে দুটো কামড় বসিয়েছে টমির দু-পায়ের গোড়ালিতে, আরেকটা তার হাঁটুর কাছে প্যান্টটাকে কামড়ে ধরেছে। তার মধ্যেই টমি মাঝে মাঝে যন্ত্রণার গোঙানির মতো চিৎকার করে উঠছে। ডিংগোগুলোর মুখে কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই। রক্ত-লোলুপ প্রেতমূর্তির মতো নীরবে তারা তাদের কাজ করে চলেছে।

যে দুটো কুকুর টমির গোড়ালিতে কামড় বসিয়েছিল, তারা এবার জোরে টান মারল। এক-একটা ঝটকায় গোড়ালির পেছনের রগ-দুটো গেল ছিঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে ছিটকে পড়ল টমির গোটা দেহ। তৎক্ষণাৎ একসঙ্গে সমস্ত কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। মুহূর্তের মধ্যে তীক্ষ্ণ দাঁতের মারাত্মক কামড়ে ছিন্ন হয়ে গেল পেটের নরম মাংস। এতক্ষণ যে কুকুরটা টমির গলা কামড়ে ঝুলছিল সেটাও গলা ছেড়ে দিয়ে এসে কামড় বসাল পেটের উপর। তীব্র একটা চিৎকার বেরিয়ে এল টমির গলা থেকে, তারপর হঠাৎ থেমে গেল। নিশ্চল হয়ে গেল তার দেহ।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরল হফম্যানের, টমির বীভৎস মৃত্যু তাকে পাথরের মতো নিশ্চল করে দিয়েছিল। নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না তার। কিন্তু, এবার নিজের অবস্থাটা একটু বিচার করে দেখা দরকার।

রাইফেল জিপের মধ্যে, হাতে অস্ত্র বলতে চামড়া ছাড়াবার একটা বড় ছোরা, কিন্তু এতগুলো জন্তুর বিরুদ্ধে সেটা বিশেষ কাজে লাগবে বলে মনে হয় না। এখন ওরা টমির দেহটাকে নিয়ে ভোজ লাগাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটু পরেই ওরা খেয়াল করবে এ দিকে। তাহলে আর নিস্তার নেই। তারও দশা হবে টমির মতো। ভাবতেই সারা শরীর বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল হফম্যানের।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছে জিপগাড়িটা। ওখানে একবার পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। কিন্তু শয়তান কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে এতদূর কী পৌঁছতে পারবে হফম্যান? তবে এছাড়া উপায়ই বা কী? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।

কুকুরগুলোর দিকে একবার তাকাল হফম্যান। না, এখনো ওরা টমির মৃতদেহ নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে বিশেষ কারও দৃষ্টি নেই। সঙ্গে সঙ্গে জিপের দিকে ছুট লাগাল সে।

জিপের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে হফম্যান। আর মাত্র চার গজ, এইটুকু পথ পেরোলেই সে নিরাপদ। কিন্তু ভাগ্য খারাপ—একটা কুকুর দেখে ফেলল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে সে জিপটাকে আড়াল করে দাঁড়াল হফম্যানের সামনে। অপেক্ষা করার মতো সময় নেই, তাহলে অন্য কুকুরগুলো এসে পড়বে। হাতের ছুরিটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে শ্বেতাঙ্গ হ্যারি হফম্যান তৈরি হল লড়াই-এর জন্য।

মাটির উপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল ডিংগো। ছুরি হাতে হফম্যান সতর্ক হল। চকিত বন্য ক্ষিপ্রতায় লাফ দিল ডিংগো, লক্ষ্য শত্রুর তলপেট। কিন্তু কুকুরের দাঁত হফম্যানের তলপেট স্পর্শ করতে পারল না। তার আগেই শিকারির হাতের ছোরা ছোবল মারল ডিংগোর একটা চোখের উপর। মাটিতে ছিটকে পড়ল আহত ডিংগো। কিন্তু পরক্ষণেই ঘুরে এসে চোখের পলক ফেলার আগেই আবার আক্রমণ করল সে। এবার লক্ষ্য শত্রুর কণ্ঠনালি। এক ঝটকায় সরে গেল হফম্যান, তবে গলা বাঁচলেও আক্রমণের ধাক্কাটা পুরোপুরি এড়ানো গেল না। ডিংগোর মারাত্মক দাঁত চেপে বসল তার গালের উপর। সঙ্গীন-মুহূর্তে কিন্তু বুদ্ধি হারাল না হফম্যান। অব্যর্থ লক্ষ্যে তার হাতের ছোরা নেমে এল বুনো কুকুরটার বুক আর পেটের উপর। ডিংগোর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

তাড়াতাড়ি জিপে উঠে ঝড়ের মতো গাড়ি চালিয়ে দিল হফম্যান। তার গালের উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে কেটে বসেছে ডিংগোর দাঁত। ক্ষত বিষিয়ে উঠলে আর রক্ষে নেই। কাছাকাছি এক সরকারি প্রতিনিধির নিজস্ব প্লেন রয়েছে, সেটা নিয়েই হাসপাতালে পৌঁছতে হবে।

হাসপাতালে যখন হফম্যান এসে পৌঁছল, তখন তার সমস্ত মুখ ফুলে ঢোল; জ্বরে প্রায় বেহুঁশ, হাতে পায়ে খিঁচুনি শুরু হয়েছে।

পাঁচ সপ্তাহ। দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর সুস্থ হল হফম্যান। ভাগ্য ভালো তার।

তারও প্রায় সপ্তাহখানেক বাদে ব্রিসবেনে এসে হফম্যান সস্ত্রীক দেখা করল মিঃ ক্যাভানোর সাথে।

'যথেষ্ট হয়েছে মশাই, আর এখানে থাকতে চাই না', গালের শুকিয়ে আসা ক্ষতচিহ্নটা দেখিয়ে বলল হফম্যান।

—'আর আপনার ভয়ের কিছু নেই। একবার ডিংগোর কামড় থেকে বেঁচে আসলে, পরে কামড়ালেও আর কোনো ক্ষতি হয় না। অনেকটা ওই 'টিকা'র মতো ব্যাপার আর কি। সুতরাং থেকে যান, আমাদেরও সুবিধা হবে, আর আপনারও ভালোই রোজগার হবে।'

উত্তরে মৃদু হাসল হফম্যান, 'আচ্ছা মিঃ ক্যাভানো, আপনি কখনো একপাল ডিংগোর কবলে কোনো মানুষকে মারা পড়তে দেখেছেন, দেখেছেন কীভাবে শয়তান কুকুরগুলো তার পেট চিরে লিভারটা খেয়ে ফেলে; শুনেছেন কখনো সেই হতভাগ্য মানুষটার আর্তনাদ? বোধ হয় কোনদিন শোনেননি, তাই না?'

ক্যাভানো মাথা নাড়লেন অর্থাৎ না, তিনি দেখেননি বা শোনেননি।

—'কিন্তু আমি দেখেছি। সেইজন্যেই আর একমুহূর্তও থাকতে চাই না এ দেশে।'

দশ দিন পরে ম্যাডালীনকে নিয়ে আমেরিকাগামী বিমানে চড়ল হ্যারি হফম্যান।

হরিণ নিরীহ নয়

সৌন্দর্যের প্রতীক হরিণ। যুগ যুগ ধরে কবির সৃষ্টিতে, লেখনীতে, কাব্যে হরিণের উল্লেখ ঘটেছে রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক উপমা হিসাবে। তপোবনের যুগ থেকে আজও হরিণ মানুষের প্রিয় পোষ্য।

স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে হরিণ নিতান্তই নিরীহ, ভীতসন্ত্রস্ত প্রাণী। অরণ্যে, শিং, দাঁত এবং নখের রাজত্বে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই প্রাণীটির সম্বল শুধুই গতি, সুতরাং পালিয়ে বাঁচা ছাড়া নিজেকে রক্ষা করার দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র হরিণের একরকম নেই বললেই চলে। কিন্তু এগুলো হল সাধারণ নিয়মের কথা। শহরের বুকে চিড়িয়াখানার আবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে অরণ্য সাম্রাজ্যের মুক্ত পটভূমিতে যেখানে নিয়মের রাজত্বে মাঝে মাঝেই ব্যতিক্রমের দেখা মেলে, সেখানে আমাদের পূর্বোক্ত কথাগুলো হয়তো বহু ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। নীচে আমি সেরকম দুটি ঘটনার বিবরণী পেশ করলাম। লক্ষণীয় বিষয়, উক্ত

কাহিনিকারদের ধারণার সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক ধারণা এবং অভিমত সম্পূর্ণ পৃথক।

জীবনতত্ত্বর একটি সাধারণ কথা এইখানে জানিয়ে রাখা উচিত, নচেৎ প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। 'ডিয়ার' এবং 'অ্যান্টিলোপ', এই দুইটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিশব্দের প্রচলন বাংলা ভাষায় নেই, ফলে উভয় ক্ষেত্রেই 'হরিণ' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'অ্যান্টিলোপ' এবং হরিণের মূল আকৃতিগত পার্থক্য তাদের শিং-এ। হরিণের শিং ডালপালা ছড়ানো গাছের মতো, ইংরেজিতে বলে 'অ্যান্টলার'। অ্যান্টিলোপের শিং অপেক্ষাকৃত সোজা, ধারাল, ডালপালাহীন, ইংরেজি প্রতিশব্দ 'হর্ন'। অধিকন্তু, হরিণের শিং খসে পড়ে এবং পুনরায় নির্গত হয়, অ্যান্টিলোপের শিং একবারই ওঠে, খসে না। কাহিনি পড়বার সময় এই ক'টি মনে রাখতে হবে।

চিন-মুলুকের শয়তান

না, বই পড়ে শিকার হয় না। বই পড়া আর শিকার করা দুটো পুরোপুরি আলাদা ব্যাপার। 'ইয়াংজে' নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় একটা 'সেরাও' অ্যান্টিলোপ শিকার করতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ শিকারি ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ওই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার যে বিবরণ পেশ করেছিলেন, নীচে তার কিছু অংশ তুলে দিলাম।

'ইয়াংজে নদীর তীরেই আমি প্রথম সেরাও দেখলাম। তার আগে চিড়িয়াখানাতেও কোনোদিন ওই দুর্লভ প্রাণীটিকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। শিকারের নেশা আমাকে পেয়ে বসবার আগে ওই বিষয়ে যাবতীয় বই নিয়ে আমি বিস্তর পড়াশুনা করেছিলাম এবং প্রাণীবিষয়ক আমার সেই পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের তালিকায় 'সেরাও' নামক বিশেষ শ্রেণির অ্যান্টিলোপটিও বাদ পড়েনি। ফলে এই ঘটনার আগে কোনোদিন সেরাও না দেখলেও, প্রাণীটির আকৃতি, প্রকৃতি, মুখাবয়ব প্রভৃতি সম্পর্কে আমি বেশ ওয়াকিবহাল ছিলাম। শুধু দুটি বৈশিষ্ট্য

সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। প্রথমত, ওই প্রাণীটির ভয়ংকর স্বভাব চরিত্র এবং দ্বিতীয়, সাঁতারে তার অসাধারণ দক্ষতার কোনো উল্লেখই বইয়ে ছিল না। আর এই দুটি অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকার ফল হয়েছিল প্রাণঘাতী, মর্মান্তিক!'

'ন্'গেই-লাই-ৎজে'।

আক্ষরিক অর্থে পাহাড়ি গাধা। এই হল সেরাও অ্যান্টিলোপের চিনে নাম। জন্তুটির প্রধান চারণক্ষেত্র পূর্ব হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরদেশে। প্রায়শই দশ হাজার ফুট অথবা তদুর্দ্ধ উচ্চতায়। ভয়ংকর গিরিখাত ও তুষারঢালের বুকে এরা স্বচ্ছন্দ দ্রুততায় ঘুরে বেড়ায়, সমতল উপত্যকার বহু বিপদের সীমানা এড়িয়ে।

মহাযুদ্ধের কিছু আগে। চিনের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইয়ুনান প্রদেশের কুনমিঙ অঞ্চলে আমাদের কাহিনিকার মিঃ ক্রিশ্চিয়ান কোহ্ল ব্যবসার প্রয়োজনে ঘুরছিলেন। শিকার ছিল কোহ্লের সবচেয়ে প্রিয় নেশা। ফলে ব্যবসার কাজে ঘুরলেও চিন দেশের উক্ত অঞ্চলে, ব্যাপক অংশ জুড়ে তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য জাতের ছাগল এবং হরিণ ওই সময়ে শিকার করেছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন কোহ্ল একটি 'সেরাও' শিকারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পূর্ব-হিমালয়ের দুরারোহ শিখরে শিখরে। কিন্তু আশ্চর্য, পর্বত-চূড়ায় সেরাও-এর দেখা মিলল না, দেখা পেলেন অদ্ভুতভাবে 'ইয়াংজে' নদীর তীরবর্তী সমতল উপত্যকার বুকে। বিচিত্র এই অনুসন্ধানের ইতিহাস।

স্থানীয় গাইড বা পথপ্রদর্শক 'চেন'-কে সঙ্গে নিয়ে শ্বেতাঙ্গ ক্রিশ্চিয়ান কোহ্ল দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে কুনমিঙ এর সন্নিহিত পর্বত শিখরগুলি সুউচ্চ চূড়ায় ঘোরাঘুরি করেছিলেন। হাল্কা বাতাসে শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গকে আগ্রাহ্য করেও তাঁরা ওই দুর্লভ প্রাণীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। চেন-এর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। কিন্তু ভাগ্য মন্দ। জন্তুগুলোর খুরের ছাপ মিললেও, চাক্ষুষ দর্শন মিলল না।

একটি দিনের কথা। শ্বেতাঙ্গ কোহ্ল এবং চেন উভয়ে দুটি পর্বতশিখরের মধ্যবর্তী কয়েকশো ফুট গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিখাতের পাশে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। হঠাৎ শিষের মতো তীক্ষ্ণ এক নাসিকাধ্বনি

কোহ্লের কানে এল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথর আলগা হয়ে মাথার উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য হল গিরিখাতের অতলে। এক জীবন্ত ছায়ামূর্তি উপরের একটি গিরিশিখর থেকে অন্য পবর্তচূড়ায় লাফ দিয়ে চলে গেল।

'লাই-ৎজে'! চেন-এর কণ্ঠস্বর উত্তেজিত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর প্রায় চোদ্দো দিন ধরে বহু খোঁজাখুজির পরও সেরাও-এর দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, কোনো হদিসই পেলেন না তাঁরা। পরিশেষে হাল ছেড়ে দিলেন কোহ্ল। সেরাও খোঁজার ইস্তফা দিয়ে সমতলভূমিতে নেমে আসাই সমীচীন মনে হল তাঁর।

কুনমিঙে ফেরার পথে হোয়াইলি নামক একটি স্থানে রাত কাটাতে হল কোহ্লকে। চেন-এর জনৈক আত্মীয় ছিল স্থানীয় অধিবাসী। হোয়াইলি অঞ্চলের অনতিদূরে বয়ে চলেছে পীত রঙের ইয়াংজে নদী। সেই ইয়াংজের তীরবর্তী অঞ্চলেই উক্ত আত্মীয়টির বাসস্থান। কোহলের অনুমতি নিয়ে সে রাত্রেই চেন তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

পরদিন ভোরে সে যখন ফিরে এল, তখন সে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। তার দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম হিসাবে কোহ্ল বুঝলেন যে, ইয়াংজে নদীর পার্শ্ববর্তী উপত্যকায় প্রায়শই একটা সেরাও-এর আবির্ভাব ঘটে বলে চেন-এর আত্মীয়টি তাকে জানিয়েছে। প্রায় দিনই সে নাকি ক্ষেতে কাজ করতে করতে জন্তুটাকে দেখতে পায়। খাবার লোভে জন্তুটা রাত্রে নদী পার হয়ে এ পারে আসে এবং সারারাত ধরে ভোজনপর্ব সমাধা করে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতরে নদী পার হয়ে অপর পারে পাহাড়ের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যায়।

চেন-এর কথায় বেশ এটু চমকে গেলেন কোহ্ল। কারণ, দশ হাজার ফুটের নিরাপদ উচ্চতা ছেড়ে হঠাৎ কী কারণে একটা সেরাও সমতলভূমির বুকে অবতীর্ণ হতে পারে, সেটা তাঁর মাথায় ঢুকছিল না। কিন্তু কোহ্লের মনে সন্দেহ থাকলেও, চেন তার বিশ্বাসে অটল। শেষ পর্যন্ত সে তার আত্মীয়টিকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। সম্পর্কে সে হল চেন-এর এক নিকট সম্পর্কের ভাই।

সাহেব এবং তার ভাই-এর কথোপকথনের মধ্যে চেন দোভাষীর ভূমিকা নিল। কোহ্ল তাকে জন্তুটার বর্ণনা দিতে অনুরোধ করলে সে

যা বলল, তার ফলে আর কোনো সন্দেহ থাকার কারণ ছিল না। চেন-এর ভাইয়ের বর্ণনা অনুসারে প্রাণীটা বেঁটে কিন্তু বলিষ্ঠ গড়নের, ছাগলের আকৃতি বিশিষ্ট। ওজনে হবে প্রায় দুশো পাউন্ড। গায়ের চামড়া লাল রঙের—রোমশ। ছোট ছোট দুটি শিং সোজা এবং ধারালো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য জন্তুটার কান দুটো। খাড়া ছুচোলো—একদম গাধার মতো। কোহ্‌লের পক্ষে এই বর্ণনা যথেষ্টরও বেশি। নাঃ, চেন-এর ধারণা অভ্রান্ত; ওই গাধার কানওয়ালা মাথাটিই স্মারকচিহ্ন হিসাবে কোহ্‌লের প্রয়োজন। এই প্রাণীটার খোঁজেই এতদিন ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন তাঁরা।

চেন-এর ভাই কোহ্‌লকে আরও জানাল যে, নদীর অপর পাড়ে জন্তুটার যাতায়াতের পথে একটা গর্তের ফাঁদ কেটে সে ওটাকে ধরার চেষ্টা করেছিল। গর্তের মুখ নমনীয় গাছের ডাল এবং পাতা প্রভৃতি দিয়ে এমনভাবে ঢাকা ছিল যার ফলে কোনো মতেই ফাঁদের হদিশ পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য অনুভূতি বলে হরিণটা আজও নাকি গর্তটাকে এড়িয়ে চলাফেরা করে চলেছে।

কথাবার্তা শেষে কোহ্‌ল 'আত্মীয়টির' কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন। হরিণটাকে মারলে কেবলমাত্র মাথাটাই তিনি নেবেন, বাকি দেহাংশ হবে ওই আত্মীয়টির প্রাপ্য। উত্তম প্রস্তাব। গররাজি হওয়ার মতো কিছু দেখতে পেল না চেন-এর ভাই। সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

পর দিন সকালে অকুস্থলে পৌঁছে ক্রিশ্চিয়ান কোহ্‌ল এবং চেন উভয়েই 'সাম্পানে' চড়ে নদী পার হলেন। সাম্পান চিনদেশের এক ধরনের নৌকা। অপর পাড়ে অবতীর্ণ হয়ে সামান্য অনুসন্ধানেই নজরে পড়ল সেরাওটার যাতায়াতের পথ। মসৃণতা দেখে বোঝা যায় যে পথটি বহু ব্যবহৃত। প্রায় শ-খানেক গজ এগিয়ে গিয়ে ফাঁদটাও আবিষ্কার করলেন তাঁরা দুজন। ছড়ানো-ছিটানো গাছের ফাঁকে ফাঁকে চলে যাওয়া পথের উপর লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা একটি গর্ত।

দুজনেই ঠিক করলেন যে, পরদিন প্রত্যূষে নদীর যে পারে হরিণটা খাদ্য সংগ্রহের জন্য আসে অর্থাৎ চেন-এর আত্মীয় যে পারে বাস করে; সেইখানেই তাঁরা জন্তুটার জন্য অপেক্ষা করবেন। সমতলভূমির উপর হরিণ শিকার অবশ্যই কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা নয়; কিন্তু সেরাও-

এর সন্ধানে কোহ্ল যে পরিমাণ নাজেহাল হয়েছিলেন, তাতেই সে আপশোষটুকু পুষিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন ভোর...

ইয়াংজের পীতরঙের জলে সূর্যোদয়ের লাল আলো তখনও বিচিত্র

বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেনি। নদীর পারে একটা পাতাঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিলেন কোহ্‌ল এবং তাঁর সঙ্গী। ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগল। ক্রমে কেটে গেল সুদীর্ঘ কয়েকটি ঘণ্টা। শিকারিদের সতর্কতা এবং মানসিক চাপেও ঢিলে পড়তে লাগল। কোহ্‌লের তো বেশ একটু গা-ছাড়া দেবার ভাব এসে গিয়েছিল। এমন সময় অল্প দূরে গাছ পালার সঙ্গে কোনো সচল বস্তুর ঘর্ষণের খসখস শব্দ কানে ভেসে এল, তারপরই শিকারিদের উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে নদীর তীরবর্তী জমির উপর আবির্ভূত হল একটা বেশ বড়সড় সেরাও। অদ্ভুত আকৃতির মাথাটা উপর নীচে করতে করতে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল নদীর দিকে।

বিগত ঘণ্টা কয়েকের নিষ্ক্রিয়তা কোহ্‌লের মধ্যে সাময়িক আলস্য এনে দিয়েছিল, ফলে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে যে সময়টুকু গেল তার মধ্যে হরিণটা সচকিত হয়ে এক বিরাট লাফে প্রায় পনেরো ফুটের মতো জমি পেরিয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। স্বাভাবিক কারণেই শিকারির গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। নদীবক্ষে অর্ধনিমজ্জিত জন্তুটার মাথার অল্প দূর দিয়ে কোহ্‌লের বুলেট জল ছিটকে বেরিয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের ভাগ্যকেও ধন্যবাদ দিলেন কোহ্‌ল। আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়েছিল আর কি! যে স্মৃতিচিহ্নর জন্য এত পরিশ্রম, সেই মাথাটাই তিনি অল্পের জন্য গুঁড়িয়ে দিতে বসেছিলেন। সে যাই হোক, তখনকার মতো আর গুলি করার সুযোগ পেলেন না কোহ্‌ল। একমাত্র উপায় নৌকায় চড়ে জন্তুটার পশ্চাদ্ধাবন করা।

'সাম্পান'।

আড়াল ছেড়ে লাফিয়ে উঠে কোহ্‌ল ছুটলেন নদীর দিকে। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নৌকা খুলে দুজনেই তাড়া করলেন জন্তুটার পিছনে। কিন্তু চেন নৌকার গতি বৃদ্ধি করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করলেও খানিকক্ষণের মধ্যেই কোহ্‌লে বুঝতে পারলেন যে, এইভাবে সেরাওটার নাগাল পাওয়া অসম্ভব, কারণ অসাধারণ দৈহিক পটুতায় সে ক্রমেই নৌকার সঙ্গে তার নিজের ব্যবধান বাড়িয়ে চলেছে। সেরাও যখন অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গেছে, কোহ্‌লের সাম্পান তখন তার দুশো ফুট পিছনে। বাধ্য হয়েই কোহ্‌ল তাঁর মত পালটালেন। তিনি ঠিক করলেন

যে, হরিণটা নদীর পাড়ে উঠলেই গুলি করবেন।

কোহ্ল বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু হরিণ জমির উপর উঠল না। হঠাৎ ঘুরে সাঁতার কেটে এগিয়ে এল নৌকার দিকে। জন্তুটার অকস্মাৎ মতি পরিবর্তনের কারণ কোহ্ল তখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেননি, যদিও চেন তৎক্ষণাৎ সাম্পানটার গতিপথ পরিবর্তন করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। চেন এর প্রচেষ্টা আংশিক সফল হলেও লাভ বলতে তেমন কিছু হল না, নিজস্ব ভরবেগের ধাক্কায় নৌকা এগিয়ে গেল নিকটবর্তী নদীর পারের দিকে। দ্রুতগতিতে জল কেটে নৌকার নিকটবর্তী হল ছাগলের মতো আকৃতি বিশিষ্ট জন্তুটা, শুধুমাত্র তার অদ্ভুত মাথা এবং দেহের উপরিভাগের কিছু অংশ জলের উপরে দৃশ্যমান। কোহ্লের যথেষ্ট সুযোগ ছিল গুলি করার, কিন্তু মৃতদেহটা গভীর নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি বিরত হলেন। সেরাওটা ততক্ষণে নৌকার একদম পাশে এসে পড়েছে। জন্তুটার গতিবিধি কোহ্লের ভালো ঠেকছিল না, বন্দুকের কুঁদোর সাহায্যে জন্তুটাকে নৌকার পাশ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন।

এমন সময় ঘটল সেই অঘটন। কোহ্লের হস্তধৃত বন্দুকের বাঁট সেরাওয়ের দেহ স্পর্শ করার আগেই হতচ্ছাড়া জানোয়ারটা অকস্মাৎ সামনের পা-দুটো জলের উপরে তুলে চকিতের মধ্যে একজোড়া ভারী হাতুড়ির মতো প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল সাম্পানটার এক পাশে। পরমুহূর্তে উলটে যাওয়া নৌকার পাশে জলের উপর ছিটকে পড়লেন কোহ্ল এবং তাঁর চৈনিক সঙ্গী চেন।

সঙ্গীন মুহূর্ত! ঘটনার আকস্মিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠে কোহ্ল প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগলেন পাড়ের দিকে, নিজের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অন্য কোনো দিকে তাকাবার সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই তাঁর ছিল না। এমন সময় চেন-এর অসহায় আর্তনাদ তাঁর কানে প্রবেশ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোহ্লের মনে পড়ে গেল—চেন সাঁতারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। একটু দূরে তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে কোনোক্রমে জলের উপরে ভেসে থাকতে। কোহ্ল ফিরলেন।

চেন-কে সঙ্গে নিয়ে সাঁতার কাটা দুজনের পক্ষেই বিপজ্জনক।

সামনে ভাসছিল উলটে যাওয়া সাম্পান, চেনকে সেটা আশ্রয় করে ভেসে থাকবে বলে কোহ্‌ল পুনরায় সাঁতার কেটে এগিয়ে চললেন পাড়ের দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ শিষের মতো নাসিকাধ্বনি। সেই সঙ্গীন মুহূর্তেও কোহ্‌লের মনে পড়ে গেল পূর্ব-হিমালয়ের একটি গিরিখাতের পাশে দাঁড়িয়ে অবিকল এইরকম শিসের শব্দই শুনেছিলেন তিনি। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন স্ফুরিতনাসা উন্মত্ত অ্যান্টিলোপ জল কেটে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। একটা তিক্ত শপথবাক্য নির্গত হল কোহ্‌লের মুখ দিয়ে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে তিনি সাঁতরে চললেন পাড়ের দিকে। কোহ্‌ল অবশ্য বুঝেছিলেন যে, উলটে যাওয়া নৌকায় সংলগ্ন চেন-এর চেয়ে তাঁর দিকেই হরিণটার দৃষ্টি পড়া স্বাভাবিক, কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে সাঁতরে যাওয়া ছাড়া আত্মরক্ষার অন্য কোনো উপায় তখনকার মতো তাঁর মনে পড়ল না। কোহ্‌ল জন্তুটার আসাধারণ দৈহিক পটুতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, ফলে প্রতি মুহূর্তেই তিনি তাঁর পিঠ অথবা কাঁধের উপর দুটো খুরের প্রচণ্ড আঘাত আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু নদীর পাড়ের বালি যখন কোহ্‌লের পায়ে ঠেকল, কোনো অজানিত কারণে তখনও তাঁর দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত। আতঙ্কিত কোহ্‌ল এবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে দৌড়ে জীবনক্ষা করতে, কিন্তু বালিতে পা হড়কে বারবার তার গতি রুদ্ধ হতে লাগল।

আচম্বিতে নদীবক্ষ থেকে ভেসে এল এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! ঘুরে নদীর দিকে চোখ ফেরাতেই কোহ্‌লের নজরে পড়ল এক মর্মন্তুদ দৃশ্য!

কোহলকে তাড়া করার পরিবর্তে জন্তুটা উলটে যাওয়া সাম্পানটার দিকে এগিয়ে এসে আঘাত করল সেটার পৃষ্ঠদেশে। ফোয়ারার মতো জল ছিটকে উঠল উপরে এবং নৌকা ও তার সাথে সংলগ্ন চেন কয়েক মুহূর্তে ভেসে উঠল বটে, কিন্তু বেশ কয়েক গজ দূরত্বে। প্রাণরক্ষার প্রচেষ্টায় চেন-এর পাগলের মতো হাত-পায়ের সঞ্চালন সহজেই উন্মত্ত হরিণটার দৃষ্টিগোচর হল। কৌতূহলী হয়ে সে এগিয়ে এল তার দিকে। হরিণটাকে দেখামাত্রই হতভাগ্য চেন-এর গলা দিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, কিন্তু শুধু চিৎকার করে আত্মরক্ষা করা যায় না। অ্যান্টিলোপের সামনের দুটো পা জলের উপর একবার

দৃশ্যমান হল, তারপরই নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে এসে আঘাত হানল শিকারের দেহে। চেন-এর আর্তনাদ পরিণত হল একটা অস্ফুট ঘড়ঘড় শব্দে তারপর তার দেহ অদৃশ্য হল নদীগর্ভে। সঙ্গীর জীবন রক্ষার শেষ প্রচেষ্টায় কোহ্‌ল নদীর পাড় থেকে কতকগুলো পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে ক্রমাগত ছুড়তে লাগলেন সেরাওটাকে লক্ষ্য করে। উদ্দেশ্য, যদি চেনকে ছেড়ে কোহ্‌লের দিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এমনকী শেষ পর্যন্ত পাগলের মতো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কোহ্‌ল সাঁতরে সঙ্গীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইয়াংজের হলুদ জলে দাঁড়িয়ে সঙ্গীর মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করা ছাড়া অসহায় কোহ্‌লের করার মতো আর কিছুই নেই।

বারকয়েক নদীর জলে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেরাও, কিন্তু চেন-এর কোনো সন্ধান মিলল না কোথাও। নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ ফেরাতে এবার তার নজর পড়ল স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকা কোহ্‌লের উপর। নাক দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে সে তার ক্রোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ করল, তারপর তীরের মতো জল কেটে এগোল তাঁর দিকে।

বিপদ আসন্ন!

কোহ্‌ল বুঝলেন যে এবার তাঁর পালা। নিরস্ত্র, অসহায় কোহ্‌ল আত্মরক্ষার্থে সচেষ্ট হলেন। সাম্পান উলটে যাওয়ার সময় রাইফেল তলিয়ে গেছে নদীবক্ষে, সুতরাং নাগালের মধ্যে যে গাছগুলো রয়েছে তারই একটাতে আশ্রয় নেওয়া নিরাপদ বলে তাঁর মনে হল। অনতিদূরের অরণ্য ঘন সন্নিবিষ্ট নয়, এধারে ওধারে ছড়ানো বড় বড় গাছের সমাবেশে গঠিত। তার মধ্যে, ওক্‌, চেস্টনাট এবং পাইন গাছই বেশি। প্রথম দুটি জাতের গাছ অত্যন্ত শক্ত হলেও, তাড়াতাড়ি ওঠার পক্ষে সুবিধাজনক নয়। ফলে কাছে একটা পাইন গাছের নীচে ঝুঁকে পড়া ডাল ধরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন কোহ্‌ল। কিন্তু নিরাপদ উচ্চতায় আরোহণ করলেও, গাছে উঠে কোহ্‌ল আবিষ্কার করলেন যে, আশ্রয়ের পক্ষে গাছটি ঠিক উপযুক্ত নয়। ডালগুলো বেশ নরম এবং পলকা, কিন্তু নতুন করে অন্য কোনো গাছের কথা চিন্তা করার মতো সময় তখন আর নেই। ওরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্ত একটা গাছের ডালকে আশ্রয় করে কোহ্‌ল বসে রইলেন।

নদীর জলে আলোড়ন তুলে তীরে উঠে এল ক্রুদ্ধ সেরাও। গাছের ডালে বসে কোহ্‌ল নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ করে রইলেন। কিন্তু জন্তুটার চোখ এবং কানকে ফাঁকি দিলেও ঘ্রাণশক্তিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না তিনি।

বাতাসে ঘ্রাণ নিতে জন্তুটা পাইন গাছের খানিকটা দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্দেহের দৃষ্টি দিয়ে গাছটাকে খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে পিছিয়ে এল সে। তারপর সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে দুরন্ত বেগে ছুটে গেল গাছটাকে লক্ষ্য করে। একটা প্রচণ্ড ঢুঁ-এ থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা গাছটা, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা যন্ত্রণার অভিব্যক্তিও ফুটে উঠল হরিণের দেহে। আবার পিছিয়ে গেল উন্মত্ত অ্যান্টিলোপ, এবং কোহ্‌ল সভয়ে আবিষ্কার করলেন যে, তিনি যে ডালটিকে আশ্রয় করে বসে আছেন, সেটি এর মধ্যেই চিড় খেতে শুরু করেছে। আর একমুহূর্তও এই গাছটাকে আশ্রয় করে বসে থাকা সম্ভব নয়।

অদূরবর্তী একটা ওক গাছকে আশ্রয়ের জন্য মনে মনে নির্বাচিত করলেন কোহ্‌ল। কিন্তু নীচে অপেক্ষমান শৃঙ্গী, মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে গাছটায় আশ্রয় নেওয়া খুব সোজা কাজ নয়। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কোহ্‌ল।

প্রথম সংঘাতের যন্ত্রণায় জন্তুটা গাছের থেকে খানিকটা দূরে পিছিয়ে গিয়েও, তেড়ে আসার বদলে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এই সুযোগ কোহ্‌ল হাতছাড়া করলেন না। গাছের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন ওক গাছটার দিকে। মাটির উপর ভারী বস্তুর পতনের শব্দে যেন সম্বিত ফিরে এল জন্তুটার। বিদ্যুৎগতিতে সে ছুটে গেল পলায়নে তৎপর শিকারের দিকে। নাঃ, ওক গাছ পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না কোহ্‌ল। মাঝপথে দুটো শিং-এর মারাত্মক সংস্পর্শ অনুভূত হল তাঁর কটিদেশের নিম্নভাগে, তারপরেই শূন্যপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর দেহ, আছড়ে পড়ল বেশ কয়েক গজ দূরে জমির উপর। পতনের আঘাতে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে এল কোহ্‌লের চোখের সামনে। শিরদাঁড়ায় তীব্র যন্ত্রণা—পিঠটা ভেঙে গেছে বলে মনে হল তাঁর।

আবার সেই তীক্ষ্ণ শিস। দারুণ আতঙ্ক এবং ভয় কোহ্‌লকে তাঁর দুটো হাঁটুর উপর দাঁড় করিয়ে দিল, কিন্তু দৌড়ানো দূরের কথা, এক

পা এগোবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন তিনি; ফলে ওই অর্ধেক বসা অবস্থায় তিনি প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন চরম আঘাতের জন্য। কিন্তু আঘাত এল না, পরিবর্তে ভেসে এল সংঘাতের ভারী শব্দ। কোহ্‌ল আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে হরিণটা ওই পাইন গাছের কাণ্ডে ক্রমাগত গুঁতো মেরে চলেছে। সম্ভবত সংঘর্ষের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে সে গাছটাকেই তার প্রধান শত্রু বলে মনে করেছে। অবশ্য, সেই সঙ্গে কোহ্‌লের বুঝতে ভুল হল না যে, তাঁর এ নিষ্কৃতি সাময়িক। গাছের উপর রাগ মিটিয়ে জন্তুটা একটু পরেই তাঁর দিকে ছুটে আসবে। এই কথাটা উপলব্ধি করে, অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও কোহ্‌ল ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে হরিণটার দৃষ্টির আড়ালে যাওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন।

কিছুটা পথ ওইভাবে অতিক্রম করার পর হাতে ঠেকল নরম এবং নমনীয় ডালপালা ছড়ানো জমি, আর ভালোভাবে একটু পর্যবেক্ষণ করেই জায়গাটার স্বরূপ চিনতে ভুল হল না কোহ্‌লের। ডালপালা দিয়ে আচ্ছাদিত একটা গর্ত—চেন-এর ভাইয়ের পাতা ফাঁদ! ধীরে ধীরে শরীরটাকে ফাঁদের অন্য ধারে টেনে নিয়ে গেলেন কোহ্‌ল, তাঁর মাথায় তখন এক চমকপ্রদ চিন্তার তরঙ্গ। সেরাও এবং কোহ্‌লের মাঝখানে ওই ফাঁদ। একটা মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন কোহ্‌ল।

সমস্ত প্রাণশক্তি জড়ো করে সোজা হয়ে বসে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে হাত দুটো নাড়াতে লাগলেন কোহ্‌ল। উদ্দেশ্য হরিণটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। গাছে টুঁ বন্ধ করে ফিরে তাকাল রক্তচক্ষু হরিণ। তারপরই জ্যা মুক্ত তীরের মতো ছুটে এল কোহ্‌লের দিকে। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন কোহ্‌ল। সেরাও যদি ফাঁদের হদিশ পেয়ে যায় তাহলে শিং এবং খুরের নিষ্ঠুর আঘাতে কোহ্‌লের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ঝড়ের বেগে ছুটে আসা হরিণের সামনের গোটা দেহ অদৃশ্য হল কোহ্‌লের চোখের সামনে থেকে। গর্তের মধ্য থেকে শুধু ভেসে আসত লাগল ক্রুদ্ধ অ্যান্টিলোপের তীক্ষ্ণ নাসিকা ধ্বনি এবং গর্তের চারিধারে মাটির দেওয়ালে অধৈর্য খুরের আঘাতের শব্দ।

অর্ধ-অচেতন অবস্থায় গর্তের ধারে থাকতে থাকতে প্রায় আধঘণ্টা

বাদে কোহ্লের কানে ভেসে এল স্থানীয় চিনাভাষায় কয়েকজন লোকের কথাবার্তার শব্দ। সাহায্যের জন্য চিৎকার শুনে তারা অবশেষে এসে কোহ্লকে আবিষ্কার করে। উদ্ধারকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিল চেন-এর ভাই। সাম্পান নিয়ে চেন্ এবং কোহ্ল যাত্রা করার বহুক্ষণ পরেও কোনোরকম খবর না পেয়ে সে প্রতিবেশীর নৌকায় চড়ে সন্ধান করতে বেরিয়ে পড়ে।

হোয়েইলীতে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে কোহ্ল সাংহাইতে এসে পৌঁছোলেন এবং সেই সময়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা যায় যে মেরুদণ্ড নয়, ভেঙেছে তাঁর নিতম্বদেশের হাড়। শল্যচিকিৎসার সাহায্যে তিনি আরোগ্যলাভ করেন।

পরিশিষ্ট না বললে বর্তমান কাহিনি অসমাপ্ত থেকে যায়—শিকারি ক্রিশ্চিয়ান কোহ্লের বিবরণী থেকে আমি এই অংশটি তুলে দিচ্ছি।

'হোয়েইলীতে থাকতে থাকতেই আমি চেন-এর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ তার আত্মীয়দের দিয়েছিলাম এবং ঘটনারও বিবরণ দিয়েছিলাম! তার কয়েকদিন পরে সেরাওটার মাথা স্মারক হিসাবে সংগ্রহ করতে গিয়ে শুনলাম যে ওই হরিণটাকে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস উক্ত "ন্‌গেই-লাইৎজে", চেনকে হত্যা করে নিঃসন্দেহে কোনো দৈবশক্তির অধিকারী হয়েছে।

মহাযুদ্ধের যবনিকা তখন ধীরে ধীরে চিনের উপর নেমে আসছে, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনোদিন যদি আমার নিম্নাঙ্গের সচলতা ফিরে আসে, তবে সেদিনই আমি ইয়াংজে নদীর পাড়ে একটা সেরাও অ্যান্টিলোপের সঙ্গে আমার কিছু বাকি হিসাব চুকাতে যাব। তা সে দৈবশক্তির অধিকারী হোক বা নাই হোক।'

সুদানের খুনি

আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় জমে গেলেন রয় হেলভিন। যদিও তাঁর সতর্কবাণী আয়োমকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনতে পারত না, কিন্তু সেটুকু আওয়াজও তার গলা দিয়ে বেরুল না। সুদানের প্রান্তরে

দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র, অসহায় হেলভিনকে প্রত্যক্ষ করতে হল, উপকথার জগৎ থেকে নেমে আসা এক বিচিত্র প্রাণীর ভয়াবহ আক্রমণে সঙ্গী আয়োমের মর্মান্তিক মৃত্যু।

স্থানীয় সুদানীদের দৈহিক পটুতা অসাধারণ। আয়োমের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। এক ঝলক কালো বিদ্যুতের মতো সে দৌড়ে চলেছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাক থেকে একটা রাইফেল সংগ্রহ করে আনতে। অপেক্ষমান লরিটির কাছে তার আর পৌঁছনো হল না। কি ঘটতে চলেছে তা বোঝবার আগেই পিছন থেকে প্রচণ্ড আঘাতে দুটো শিং তার দেহটাকে গেঁধে ফেলল। পরক্ষণেই দুটো শিকে গাঁথা ঝলসানো মাংসপিণ্ডের মতো শূন্যে ঝুলতে লাগল আয়োমের দেহ। আতঙ্কিত হেলভিন দেখলেন, পাঁজরের ঠিক নীচে দিয়ে দু-দুটো শিং-ই দেহটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে গেঁথে ফেলেছে। আয়োমের তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এল। তারপর একসময় স্তব্ধ হয়ে গেল—সব শেষ! হেলভিন বুঝলেন, ফুসফুসে রক্ত প্রবেশ করেছে।

তবে কেবল হেলভিন নয়, আয়োমের হত্যাকারীও বুঝতে পেরেছিল সে কথা। তার ঘাড় ও গলার শক্তিশালী পেশির একটিমাত্র সঞ্চালনে শিং-এ বিদ্ধ আয়োমের প্রাণহীন দেহ প্রায় ফুট বারো দূরের মাটির উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল। হত্যার উন্মাদনা তখনও জন্তুটার সম্পূর্ণ মেটেনি। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে হেলভিন দেখলেন, দুটি বিশাল বর্শাফলকের মতো শিং-এর ক্রমাগত আঘাতে কেমন করে কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে আয়োমের মৃতদেহ পরিণত হল একটি রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে।

পাঠক-পাঠিকাকে আপাতত এইখানে রেখে আমরা চলে যাব কাহিনির প্রারম্ভে।

মাত্র মিনিট কয়েক আগের ঘটনা। শিকারি রয় হেলভিন এবং তাঁর স্থানীয় সুদানী অনুচর আয়োম তাঁবু থেকে মাত্র শ-খানেক গজ দূরে প্রবহমান ক্ষীণ জলধারাটির পাড়ে, ঘোর বাদামি রঙের একটা সুদৃশ্য অ্যান্টিলোপের মৃতদেহ থেকে চামড়া সংগ্রহ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। এই ধরনের কাজগুলো হেলভিন নিজে বিশেষ দেখতেন না, তার জন্য আলাদা লোক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি একটা লেপার্ডের

চামড়া ছাড়াতে গিয়ে তারা অত্যন্ত কাঁচা হাতের কাজ দেখায়। ছাড়ানো চামড়াটার মধ্যে লেপার্ডের চোখ এবং ঠোঁটের অংশে খুঁত থেকে যায়। অপূর্ব চামড়াটার ক্ষতি হওয়ার ফলে, হেলভিন ঠিক করেন যে এর পর থেকে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে ওই কাজের তত্ত্বাবধান করবেন। দুয়েক দিনের মধ্যেই খুঁজে পেতে তিনি নতুন একটি দক্ষ ব্যক্তিকে ওই কাজের জন্য সংগ্রহ করেন। সেই হল আয়োম। হেলভিন এবং আয়োম যে মৃতদেহটি থেকে চামড়া সংগ্রহ করছিলেন, সেটি প্রায় চার ফুট উঁচু, একটা ঘোর বাদামি রঙের অ্যান্টিলোপ। জন্তুটার প্রত্যেকটা শিং-এর দৈর্ঘ প্রায় দু-ফুট করে। শিকারির সংগৃহীত স্মারক হিসাবে অপূর্ব, সন্দেহ নেই।

ছ'জন ভৃত্যের সাহায্যে প্রায় পাঁচশো পাউন্ড ওজনের মৃতদেহটা যখন স্রোতস্বিনীর পাড়ে এনে রাখা হল তখনই সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে এসেছে। নদীর পাড়ে কাজটা সারবারও একটা কারণ ছিল। প্রথমত পরিত্যক্ত শবদেহটা যাতে জলের স্রোতে বহুদূরে চলে যায়, এবং দ্বিতীয়ত মাংসের লোভে তাঁবুর আশেপাশে রাত্রে যেন কোনো 'অবাঞ্ছিত অতিথির' আবির্ভাব না ঘটে। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবে। হেলভিন এবং আয়োম উভয়েই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দ্রুত কাজ সারছিলেন।

হঠাৎ হেলভিন আবিষ্কার করলেন যে তাঁদের পায়ের তলার মাটি কাঁপছে এবং দূর থেকে সমুদ্র গর্জনের মতো ভেসে আসছে অস্ফুট শব্দের তরঙ্গ। প্রথমে দুজনের কেউই বিশেষ গা দিলেন না ব্যাপারটায়, কিন্তু তরঙ্গধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী হতে, কৌতূহল নিরসনের জন্য হেলভিনই প্রথম উঠে দাঁড়ালেন।

সম্মুখবর্তী লম্বা ঘাসের জঙ্গল। তার উপর দিয়ে চোখ চালিয়ে নজরে পড়ল দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা একদল শৃঙ্গী প্রাণী। আফ্রিকার অরণ্যে শিং-এর বাহকের সংখ্যা কম নয়, কিন্তু কালোমাটি আর ঘাসজঙ্গলের পটভূমিতে প্রায় মিশে যাওয়া জন্তুগুলো নিকটবর্তী হলে, হেলভিন দেখলেন তাদের প্রত্যেকের মুখমণ্ডল বেষ্টন করে চলে গেছে একটা কালো দাগ। দুটি শিং যেন দুটি বিরাট সমান্তরাল সরলরেখা—অরিক্স! চিনতে ভুল হল না হেলভিনের, সংখ্যায় প্রায় গোটা চব্বিশ। আফ্রিকার

জঙ্গলে এই দুর্লভ শ্রেণির অ্যান্টিলোপের দলকে এত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য খুব কম শিকারির জীবনেই আসে। অরণ্যআদিম আফ্রিকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে সারি সারি শিং-এর সঙিন উচিয়ে ছুটে চলেছে শরীরী সৌন্দর্যের এক বিচিত্র তরঙ্গ। অপূর্ব! অদ্ভুত! মুগ্ধ বিস্ময়ে রয় হেলভিন নিরীক্ষণ করছিলেন সেই সৌন্দর্যপ্রবাহ, আয়োমও ততক্ষণে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে উঠেছে। সঙ্গীর চাপা সতর্ক কণ্ঠস্বরেই চমক ভাঙল হেলভিন।

—'সিংহ'!

চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল, উধর্বশ্বাসে ধাবমান অরিক্সের দলটির বেশ খানিকটা পিছনে ক্রমশ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে একটি উড়ন্ত ধুলোর মেঘ। আর সেই ধুলোর আস্তরণের মধ্যে হালকা বাদামি রঙের একটি পরিচিত অবয়ব আবিষ্কার করলেন হেলভিন—হ্যাঁ, সিংহই বটে!

'রাইফেল! শিগগির!' মাত্র দুটি শব্দ নির্গত হল আয়োমের গলা দিয়ে।

ততক্ষণে সে দৌড় শুরু করেছে অদূরে অপেক্ষমান 'সাফারী ট্রাক'-এর দিকে। উদ্দেশ্য একটা রাইফেল সংগ্রহ করে আনা। কিন্তু হেলভিন তাকে ডেকে ফিরিয়ে আনলেন। কারণ, প্রথমত সিংহের মনোযোগ পলায়নে তৎপর অরিক্সের দলটির উপরই নিবদ্ধ এবং দ্বিতীয়ত নিজেরা কোনোরকম দৌড়ঝাঁপ করে সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সদিচ্ছা হেলভিনের ছিল না। অরণ্য নাটকের এই বিরল মুহূর্তগুলি নিরীক্ষণ করার সৌভাগ্য থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না।

ততক্ষণে মাত্র দেড়শো গজ দূরে এসে পড়েছে দলটি। রাইফেল সংগ্রহে ইস্তফা দিয়ে আয়োম এসে দাঁড়াল হেলভিনের পাশে।

সম্মুখে দুটি মনুষ্যমূর্তির অবস্থিতি! নতুন বিপদের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ গোটা দলটা গতির সমতা বজায় রেখে বাঁ-দিকে মোড় নিল। কেবল দলের শেষভাগে একটা অ্যান্টিলোপের কাছে চমকটা একটু বেশি হয়ে থাকবে। আকস্মিক বিস্ময়ে সে সামনের দুটো পা ঘাসজমির উপর আটকে কোনক্রমে তার দুরন্ত গতি রুদ্ধ করল। দেহভার ন্যস্ত হল পিছনের দুটি পায়ের উপর। একটা অপূর্ব পুরুষ হরিণ। কিন্তু জঙ্গলের প্রাণীদের বেশিক্ষণ বিস্মিত হওয়ার অবকাশ মেলে না।

নাগালের মধ্যে শিকার—কালো ঘাসগুলির উপর চমকে উঠল ধূসর বিদ্যুৎ। পশুরাজ আক্রমণ করল...

প্রসঙ্গত, এখানে জানিয়ে রাখা ভালো যে, সিংহ শিকার ধরবার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করে। শিকারের পিছনে তাড়া করতে করতে সে হঠাৎ শিকারের পিঠে লাফিয়ে ওঠে এবং তার ঘাড় প্রচণ্ড দংশনে চেপে ধরে মাটিরে উপর পেড়ে ফেলে। তারপরই স-নখ থাবার একটিমাত্র আঘাতে হতভাগ্য প্রাণীটির কণ্ঠনালি ছিন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল।

প্রাণভয়ে মরিয়া হয়ে, আক্রমণে উদ্যত সিংহের দিকে রুখে দাঁড়াল বিপুলবপু অরিক্স। সিংহ এই অভাবনীয় পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না, ফলে চার ফুট করে লম্বা দু-দুটো ক্ষুরধার সঙ্গিনের মারাত্মক সান্নিধ্য এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে বহু চেষ্টা করেও সম্ভব হল না। পশুরাজের গতিরুদ্ধ হওয়ার আগেই একটা শিং তার কণ্ঠদেশ বিদ্ধ করে ঘাড় ও গলার সন্ধিস্থল দিয়ে নির্গত হল, এবং অপরটি প্রায় আমূল প্রবিষ্ট হল তার বুকে। ঘাড় ও মাথার দ্রুত সঞ্চালনে অরিক্স তার শিং দুটো মুক্ত করে নিল, তারপর পুনরায় আঘাত হানল শত্রুর দেহে। চরম আঘাত—সিংহের নরম উদরে বিদ্ধ হল দুটি বিশাল শৃঙ্গ। পশুরাজের প্রাণহীন দেহ গড়িয়ে পড়ল বিস্তীর্ণ তৃণভূমির বুকে।

ঘটনা প্রবাহের নাটকীয়তা রয় হেলভিন ও তার সঙ্গী আয়োমকে সম্মোহিত করে দিয়েছিল। নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ছিলেন দুজনে।

অরিক্স শিকারের আশা হেলভিনের বহুদিন লালিত। কিন্তু শিকার করা তো দূরের কথা, অধিকাংশ সময়েই সদাসতর্ক এই প্রাণীগুলিকে রাইফেলের পাল্লার বাইরে, বাইনোকুলারের কাচে পর্যবেক্ষণ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু আজকের দিনটির কথা স্বতন্ত্র। সিংহদমন অরিক্সের এ এক বিচিত্র রূপ—সিংহের মতো তার সুদীর্ঘ লাঙ্গুল এবং প্রান্তদেশের রোমগুচ্ছ আন্দোলিত হচ্ছে অধীর উন্মাদনায়, পরিশ্রম এবং অবরুদ্ধ ক্রোধে বাদামি হলুদ চামড়ার উপর ফুটে উঠছে সুগঠিত পাঁজরের তরঙ্গ; বুনো ঘোড়ার মতো বলিষ্ঠ পেশিবহুল কাঁধ। একটি মাত্র সরলরেখায় স্থাপিত দু-দুটো বিরাট শিং, পাশ থেকে অন্তত

সেরকমই মনে হল হেলভিনের।

খুব চেনা ওই মুখ—কোথায় যেন একই রকম মুখের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন তিনি! মনে পড়ল, মধ্যযুগের নাইট যোদ্ধাদের ঢালের উপর উৎকীর্ণ একশৃঙ্গ মৃগ 'ইউনিকর্ণের' মুখ। ইউনিকর্ণ তাহলে উপকথা নয়, বাস্তব। আর সেইসঙ্গে ছোটবেলার স্মৃতি হাতড়িয়ে আর একটি রূপকথার ছবি ভেসে উঠল হেলভিনের মানসপটে। সিংহের যুদ্ধরত ইউনিকর্ণের ছবি। কি অদ্ভুত মিল!

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ রূপকথার জগতে বাস করা সম্ভব হল না রয় হেলভিনের পক্ষে। আতঙ্কিত হেলভিন আবিষ্কার করলেন যে উন্মত্ত অরিক্সের দৃষ্টি তাঁদের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। স্ফীত নাসারন্ধ্র, জলন্ত চক্ষু এবং মাথা পিছনে হেলিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে তিনি বুঝলেন গতিক সুবিধার নয়। হত্যার উন্মাদনা পেয়ে বসেছে ওই 'নিরীহ' জন্তুটাকে। সম্মুখে দুটি মানুষের উপস্থিতি এখন আর তার কাছে ভীতিপ্রদ নয়, বরং তার উন্মত্ত হত্যালীলার আগামী শিকার।

—'শিগগির রাইফেল আনো, ততক্ষণ আমি এটাকে দেখছি।' আয়োমকে নির্দেশ দিলেন হেলভিন। বিগত কয়েকটি মুহূর্তের ঘটনাপ্রবাহ রয় হেলভিনের স্নায়ুযন্ত্রের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, তার প্রভাবে তিনি স্থাণুর মতো প্রান্তরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই আয়োম প্রাণপণে দৌড়ল ট্রাকের দিকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান আয়োমের দেহ লক্ষ্য করে দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল প্রকাণ্ড অ্যান্টিলোপ।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন হেলভিন। অরিক্সের দৃষ্টি এড়িয়ে যে করে হোক আয়োমকে 'ট্রাকে' পৌঁছনোর সুযোগ করে দিতে হবে তাঁকে। আয়োম এবং হরিণটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জন্তুটার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। মারাত্মক ঝুঁকি! কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো সহজ উপায় নেই। শেষ মুহূর্তে যদি অ্যান্টিলোপের গতিপথ থেকে হেলভিন সরে যেতে না পারেন তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্য আয়োমের। উন্মত্ত অরিক্স হেলভিনের দিকে মনোযোগ দিল না, ঝড়ের মতো তাঁর ডান দিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল অদূরে ধাবমান হতভাগ্য সুদানীটিকে

লক্ষ্য করে।

পরবর্তী ঘটনা আমরা জানি। দুটি নিষ্ঠুর শিং-এর ক্রমাগত আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আয়োমের দেহ। বীভৎস দৃশ্য! হেলভিন বুঝলেন যে, এবার তাঁর পালা। দৌড়ে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র, অন্তত হতভাগ্য আয়োমের পরিণাম তাঁকে সেই শিক্ষাই দেয়।

একটু দূরে পড়ে আছে গাঢ় বাদামি রঙের হরিণটার মৃতদেহ, অর্ধেক চামড়া ছাড়ানো। আর তার পাশে মাটির উপর ছাল-ছাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত বড় ছুরিটা হেলভিনের নজরে পড়ল। নীচু হয়ে ছুরিটা তুলে নিলেন হেলভিন, যদিও তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে অরিক্সের জোড়া সঙ্গিনের বিরুদ্ধে সেটা তাঁকে কতটুকু সাহায্য করতে পারে। ছোরা হাতে উঠে দাঁড়াতেই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন হেলভিন। তাঁর সামান্য নড়াচড়া জন্তুটার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। অরিক্সের রক্তচক্ষু তাঁর উপর স্থির। হাতে সময় খুবই অল্প। এক আশ্চর্য পরিকল্পনা নিলেন রয় হেলভিন।

ততক্ষণে খুব কাছে এসে পড়েছে ধাবমান অরিক্স। ঝটিতি মাটিতে শুয়ে পড়ে গুঁড়ি মেরে হেলভিন আশ্রয় নিলেন হরিণের মৃতদেহটার আড়ালে। ঝড়ের বেগে ছুটে এল শৃঙ্গধারী শয়তান। দুটি বিশাল ছুরিকার আঘাতে বিভক্ত হয়ে গেল মৃত হরিণের উদর। শুধু অল্পের জন্য হেলভিন বেঁচে গেলেন সে যাত্রায়। তীব্র গতি এবং ভরবেগের প্রাবল্যে অরিক্স হেলভিনকে অতিক্রম করে তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। এই ক্ষীণ সুযোগটুকু হাতছাড়া করতে চাইলেন না শ্বেতাঙ্গ শিকারি। তৎক্ষণাৎ আড়াল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে দৌড়লেন অদূরবর্তী গাড়ির উদ্দেশ্যে।

আয়োম ট্রাক-এ পৌঁছতে পারেনি। হেলভিন কি পারবেন! পিছনে ছুটে আসছে শরীরী মৃত্যু, রক্তলোলুপ হিংস্র অ্যান্টিলোপ।

গাড়িটা ক্রমশ হেলভিনের নিকটবর্তী হচ্ছে। কাছে! আরও কাছে! আর মাত্র কয়েক ফুট—তা হলেই নিরাপদ তিনি। একবার মনে হল প্রাণপণে সমস্ত শরীরটা নিয়ে লরি চারটি মধ্যবর্তী জমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেই চেষ্টা থেকে বিরত হলেন হেলভিন। প্রায় গাড়ির কাছে এসে পড়েছেন আতঙ্কিত শিকারি, একবার মুহূর্তের জন্য

মাথাটা ঘুরিয়ে পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন তিনি।

দশ থেকে বারো ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে আনতশৃঙ্গ উন্মত্ত অ্যান্টিলোপ। শেষ মুহূর্তে জন্তুটার গতিপথ থেকে কোনোক্রমে নিজেকে সরিয়ে আনলেন হেলভিন, কিন্তু ভুল করলেন শিং দুটোকে ধরে আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় তাঁর দেহ শুন্যপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটির উপর।

পতনের আঘাতে সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল হেলভিনের চোখের সামনে, হাত এবং কাঁধের সন্ধিস্থলে অনুভব করলেন তীব্র যন্ত্রণা। চোখের সামনে ঝাপসা একটা বিরাট কাঠামোর অস্তিত্ব বুঝতে পারলেন তিনি। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয়ে আসতে কাঠামোটার সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ করলেন হেলভিন,—'সাফারী ট্রাক'। মস্তিষ্কের কোশগুলি পুনরায় কার্যক্ষম হয়ে উঠলে হেলভিন আরও বুঝলেন যে উন্মত্ত অ্যান্টিলোপের শিং তাঁকে গাড়ির এক পাশ থেকে অন্য পাশে চালান করে দিয়েছে, অর্থাৎ তিনি শূন্যপথে গোটা গাড়িটাই টপকে এসে মাটিতে ছিটকে পড়েছেন। তৎক্ষণাৎ, লাফিয়ে উঠে পড়ে হেলভিন দৌড়ে গাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিরাপদ। হেলভিনের মনে হল তিনি বোধহয় আনন্দে পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু অরিক্সটা গেল কোথায়! লরির অপর দিকে জানলা দিয়ে দেখলেন হেলভিন। ওই তো! অদূরে আয়োমের তালগোল পাকানো রক্তাক্ত মৃতদেহের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে শয়তান খুনিটা। রয় হেলভিন গাড়ির মধ্যে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে নিলেন।

রাইফেলের ভারী বুলেট অরিক্সের কাঁধের ঠিক নীচে মৃত্যুচুম্বন এঁকে দিল।

ভুলের ওজন পঁচিশ পাউন্ড

ভুল মানুষ মাত্রেই হয়ে থাকে। সেটা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। মানুষই আবার সে ভুল শুধরে নেয়। কিন্তু উইলফ্রেড ম্যাকনিলি নামে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গ মানুষটির ভুলের ধরনটা হয়ে পড়েছিল একটু বেয়াড়া গোছের। সাধারণত এই ধরনের ভুল-টুল হলে খুব কম মানুষই সে ভুল শুধরে নিয়ে পৃথিবীর উপর হেঁটে চলে বেড়াবার সুযোগ পায়। ম্যাকনিলি অবশ্য সে সুযোগ পেয়েছিল, তবে তার মুখের উপর ভালোভাবে একটু চোখ বুলিয়ে আনলেই বোঝা যেত যে, সেই ভুলের মাশুল হিসাবে তাকেও কম খেসারত গুনতে হয়নি। তার কপালের প্রায় পুরোটা জুড়ে দুটো চোখের উপর পর্যন্ত নেমে আসা গভীর দাগগুলো যে আসলে বীভৎস কতগুলো ক্ষতচিহ্নের স্মৃতি, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ভারতবর্ষ।

আজকের স্বাধীন ভারত নয়, তখন ব্রিটিশ অধিকৃত উপনিবেশ। সেই সময় বিলেতের 'কার্টার-ডাউনেস লিমিটেড' নামে একটি কাপড়ের কল থেকে ম্যাকনিলিকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল তুলোর চাষের তদারকি করতে। বিদেশে তখন ভারতের তুলোর চাহিদা খুব বেশি ভারত থেকে তুলো নিয়ে গিয়ে, সেই তুলোয় কাপড় তৈরি করে আবার ভারতবর্ষেই সেই কাপড় বেচে তখন রাতারাতি ফুলে-ফেঁপে ওঠে ম্যানচেস্টারের মিলগুলো। 'কার্টার-ডাউনেস' তারই একটা।

মাদ্রাজে নেমে ম্যাকনিলি প্রথম দেখা করল এস.টি. মজুমদার নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। মজুমদার তাকে নিয়ে গেল উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ের ঢালে তুলোর চাষ দেখাতে। সপ্তাহখানেক ধরে চাষবাসের তদারকি করল দুজনে।

অবসর সময়ে মজুমদার ঘুরে বেড়াত কাঞ্চনজঙঘা আর হিমালয়ের কোল ঘেঁষে ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর বিচিত্র বর্ণময় ফুল ও লতা-পাতার ঝোপেঝাড়ে। তার নেশা ছিল উদ্ভিদতত্ত্ব। কাজের ফাঁকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে তাই ছবি তুলত যত দুর্লভ লতা-পাতা আর ফুলের। অন্য দিকে সেই সময়ে ম্যাকনিলি বসে থাকত একান্ত বেকার হয়ে। অথচ এই পরিবেশে তার বেকার বসে থাকার কথা নয়। বহুদিন ধরেই উইলফ্রেড ম্যাকনিলির প্রিয় নেশা—শিকার! আর শিকারের তীর্থক্ষেত্র ভারতবর্ষের অরণ্য-প্রকৃতির মাঝে এসে একজন শিকারির পক্ষে দিনের পর দিন হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা কী করে সম্ভব?

যে বিরাট ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে শিং-এর সঙিন উচিয়ে ঘুরে বেড়ায় বুনো মোষের পাল অথবা খড়গধারী গন্ডার—তৃণভূমির উপর সন্ত্রস্ত ও সদাসতর্ক হয়ে বিচরণ করে চিতল অথবা সম্বর হরিণ আর তাদের পিছনে হলুদ ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় গা মিলিয়ে শিকারের সন্ধানে হানা দিয়ে ফেরে বাঘ অথবা লেপার্ডের দল—আকাশ ছোঁয়া প্রকাণ্ড গাছের মোটা ডাল থেকে পাক খুলতে খুলতে বিপুল দেহকে অলস মন্থর ভঙ্গিতে নামিয়ে আনে বিরাট ময়াল—নদীর পাড়ে কাদামাটিতে শুয়ে নিঃসাড়ে রোদ পোহায় ক্ষুধার্ত কুমির আর গোলপাতার জঙ্গলে মৃত্যুর জাল বিছিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকে যে বুকে-হাঁটা

জীবগুলো, যাদের ছোবল মানেই যমের পরোয়ানা, সে-সবের আস্তানা ভারতবর্ষে এসে একজন শিকারির পক্ষে একেবারে খালি হাতে দেশে ফেরা কী সম্ভব?

প্রায় রোজ রাত্রেই তাঁবুতে ফিরে ম্যাকনিলি তার বন্দুকগুলো পরিষ্কার করে তেল-টেল দিত, কিন্তু মজুমদারের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে রয়েছে তার নিজের খেয়ালে—তার উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে। ফলে সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করার পরে ম্যাকনিলিকে নিজেই উদ্যোগী হতে হল।

আধুনিক যুগে আগ্নেয়াস্ত্রের অনেক উন্নতি ঘটেছে। তপ্ত সীসার মৃত্যু দংশন বহুদূর থেকে অব্যর্থ লক্ষে শুইয়ে দিতে সক্ষম যে কোনো ভয়ঙ্কর জানোয়ারকে। ফলে শিকারের বিপজ্জনক খেলা হয়ে পড়েছে আগের চেয়ে অনেকটাই নিরাপদ। কিন্তু 'শিকার' শব্দটি বলতেই যাদের মনে জেগে ওঠে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের স্বাদ, শিকার বলতে যারা শুধু নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডকেই বোঝে না, বোঝে সমান সুযোগ নিয়ে জীবন দেওয়া-নেওয়ার তীব্র আরকে ভেজানো এক খেলাকে, এ ধরনের মানুষরা নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার মধ্যে শিকারের আনন্দ খুঁজে পায় না। জীবনকে বাজি ধরে মরণ খেলার খেলোয়াড় হয়েই তারা খুঁজে পায় আনন্দের স্বাদ। খেলার একান্ত নিয়মেই তারা কখনো হারে, আবার কখনো জেতে। পুরস্কার হিসাবে কখনো তাদের ভাগ্যে জোটে হিংস্র শ্বাপদের সুন্দর চামড়া কি অতিকায় তৃণভোজীর বিরাট সুদৃশ্য মাথা, আবার কখনো তাদের দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে অরণ্যভূমির বুকে পড়ে থাকে নখ, দাঁত অথবা শিং-এর আঘাতে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ।

এত সব জেনেও কিন্তু বেপরোয়া মানুষ ওই ভাবেই প্রাচীন অথবা মধ্যযুগীয় প্রথায় শিকার করতে ভালোবাসে। উইলফ্রেড ম্যাকনিলি ছিল ঠিক ওই ধরনের মানুষ। তাই আফ্রিকার 'মাসাই' অথবা 'নান্দি' উপজাতির মানুষরা যেরকম সামান্য একটা হাতে তৈরি বর্শা সম্বল করে পশুরাজ সিংহের মুখোমুখি হয়, আরব দেশের মানুষ যেমন শুধুমাত্র তলোয়ার হাতে ক্ষিপ্ত বন্য হাতির মোকাবিলা করে, তেমনই সঙ্গে বন্দুক থাকলেও শিকারের জন্য ম্যাকনিলির প্রিয় হাতিয়ার ছিল তীর-ধনুক। এবার ভারতে আসার সময় সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল

'ফাইবার-গ্লাসের' তৈরি একটা ধনুক, যার গুণের টান ছিল পঞ্চাশ পাউন্ড।

একদিন সকালে বেরোবার সময় সেটাকে সঙ্গে নিয়েই বেরোল ম্যাকনিলি। আর নিল চওড়া ফলা-ওয়ালা ক'টা তীর। পথ চলতে চলতে চোখে পড়ল রং-বেরংয়ের পাখির ঝাঁক, একটার পর একটা, অগুণতি। কিন্তু কোনোটাকেই ঠিক তীরের আওতায় পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল। তারা এসে পৌঁছল ছোট ছোট পাথর-সাজানো একটা বাগানের মতো চত্বরে। ক্লান্তির পথচলা।

হঠাৎ একটু দূরে একটা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া চোখে পড়ল ম্যাকনিলির। সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর লাগিয়ে তৈরি হল সে। তারপর একটা নুড়ি তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল ঝোপ লক্ষ্য করে। মুহূর্তের জন্য ধূসর-বাদামি রংয়ের একটা দ্রুত ধাবমান দেহ ম্যাকনিলির চোখে ধরা দিল, ভালো করে তার সঠিক রূপটাও দেখতে পেল না সে। কিন্তু শিকারির হাতের অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় সাঁ করে ছুটে গেল হাতের তীর। লক্ষ্য অব্যর্থ! শিকার লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর। একটা 'হগডিয়ার'—ছোট জাতের হরিণ।

ম্যাকনিলির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওন্‌ডি। তার মুখের চামড়ায় বয়সের অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। জাতে নেপালি। ওস্তাদ পথ-প্রদর্শক। পানের ছোপওয়ালা দাঁত বের করে সে হাসল—'সাহেব, তুমি খুব পাকা শিকারি। তবে তোমার একজন সঙ্গী থাকলে আরও ভালো হয়। তোমার আপত্তি না থাকলে আমিই তোমার সঙ্গী হতে পারি।' এ প্রস্তাবে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না; ম্যাকনিলিরও ছিল না।

এ দিকে ততক্ষণে মজুমদারও এসে পড়েছিল। শিকার দেখে সেও বন্ধুকে অভিনন্দন জানাল, আর সেইসঙ্গে বোধহয় এত দিন পরে একটা সোজা কথা তার বোধগম্য হল যে, তার নিজের মতো ম্যাকনিলিরও একটা শখ আছে এবং তাকেও সেই শখ মেটাবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ফলে পরের দিন থেকে যে যার প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিজের নিজের সুবিধামতো পথে বেরোতে শুরু করল। মজুমদারের সঙ্গে থাকত একজন কি দুজন পথপ্রদর্শক আর ক্যামেরা। ম্যাকনিলি সঙ্গে নিত তীরধনুক আর ওন্‌ডিকে।

চওড়া ফলার তীর ম্যাকনিলির সঙ্গে খুব বেশি ছিল না। তবে যে ক'টা ছিল সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই দিন কয়েকের মধ্যে সে শিকার করেছিল একটা সম্বর হরিণ, দুটো চিতা আর অনেকগুলো বুনো কুকুর। কিন্তু ভারতের বনে যে সব কুলীনদের বাস তাদের মুখোমুখি হতে গেলে আরেকটু শক্তিশালী হাতিয়ারের প্রয়োজন। ম্যাকনিলি ইস্পাত আর কাঠের তৈরি দুটো মজবুত ধনুক বিলেত থেকে আনিয়ে নিল। এই দুটো ধনুকেরই গুণের টান ছিল আগেরটার তুলনায় পঁচিশ পাউন্ড বেশি, অর্থাৎ পঁচাত্তর পাউন্ড।

পরের বছরের বসন্তাগত দিনগুলোতে ম্যাকনিলি ছুটি কাটাল গাড়োয়াল আর কুমায়ূনের মাঝের পর্বতমালার ঢালে। তুষারমৌলি নন্দাদেবীর কোলে শিকারের খোঁজে ঘুরে এবার তার ভাগ্যে জুটল বড় পাহাড়ি ভালুক আর চিতাবাঘ। সুতরাং, আর কী চাই? চাই নিশ্চয়ই— এখনও বাকি ভারতীয় অরণ্যভূমির একচ্ছত্র অধিপতির সঙ্গে মোলাকাত —ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ!

কিন্তু রাজদর্শন তো আর সহজে মেলে না, তার জন্য ধৈর্য ধরতে হয়। ম্যাকনিলিও সুযোগের অপেক্ষায় রইল। অবশেষে সে সুযোগ এল প্রায় ছ'সাত মাস বাদে, সে বছর নভেম্বর মাসে।

শিকারের অপেক্ষায় একটা জলাশয়ের পাড়ে পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুকটায় তীর জুড়ে অপেক্ষা করছিল ম্যাকনিলি। উদ্দেশ্য, যদি রাতে খাবারের টেবিলে কোনো সুস্বাদু মাংসের ব্যবস্থা করা যায়।

এমন সময় ওন্‌ডি দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিল—'বাঘ, সাহেব বাঘ! ওই নালাটার মধ্যে ঢুকেছে।'

ওন্‌ডির কথায় নেমে এসে দেখল ম্যাকনিলি। হ্যাঁ, বাঘই বটে। ভুল হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। নালার মুখে বিরাট গোল গোল নিখুঁত পায়ের ছাপগুলোর দিকে একবার তাকিয়েই অভিজ্ঞ শিকারি ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধা হল না যে, বাঘটা শুধু পূর্ণবয়স্কই নয়, রীতিমতো স্বাস্থ্যবানও বটে। কিন্তু পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুকে বাঘ মারা যায় না, তাঁবুতে ফিরে গিয়ে উপযুক্ত হাতিয়ার নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু ততক্ষণ বাঘটা কি আর এখানে থাকবে?

ওন্‌ডিকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তার মুখে আরও গোটাকয়েক
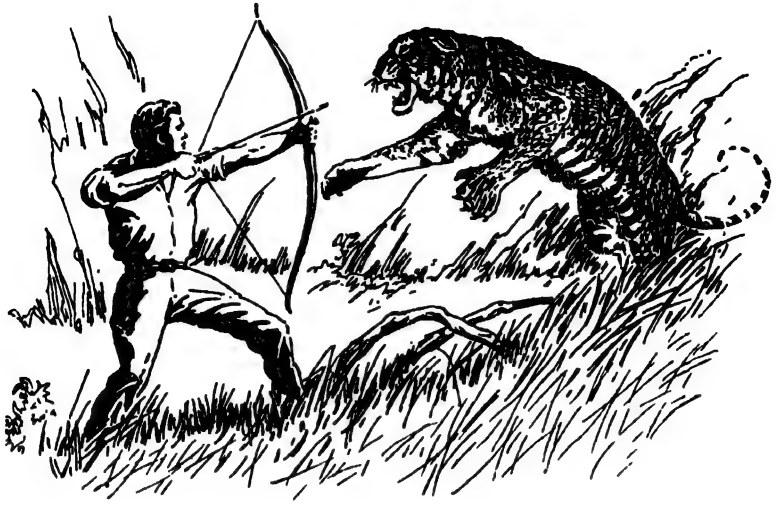
ভাঁজ পড়ল। একটু চিন্তা করে সে বলল—'আমার মনে হয় বাঘটা এখন ঘুমুবে, তাই খেয়ে দেয়েই নালার মধ্যে ঢুকেছে।'

ওন্‌ডির কথায় ভরসা করা যায়। দেরি না করে ম্যাকনিলি সঙ্গে সঙ্গে ছুটল তাঁবুর দিকে। হিমালয়ের ঢালে নানা রঙের বাহারী ফুলের মাঝে টানটান করে বাঁধা সাদা তাঁবু। সামনের ফাঁকা জমির উপর দাঁড়িয়ে মজুমদার একটা হেলিকপ্টারকে হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছিল। এই হেলিকপ্টারটা ডাকের চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া করে। ম্যাকনিলিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে তাঁবুর মধ্যে ঢুকতে দেখে সে একটু অবাক হল—'কি ব্যাপার! কি হল আবার...'

'একজনের সাথে জরুরি দেখা করার কথা। তাই একটু তাড়াতাড়ি করছি।' উত্তর দিল ম্যাকনিলি।

'দেখা করার কথা? এখানে? কার সাথে?' মজুমদার বেশ কিছুটা অবাক।

'মানে, ওই একটা বাঘের সঙ্গে আর কি...' খুব স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেওয়ার মাঝেই কাজ করে যাচ্ছিল ম্যাকনিলি। হাতের ধনুকটা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে সে পঁচাত্তর পাউন্ডের ধনুকে গুণ পরাতে বসল। আগেই বলেছি, পঁচাত্তর পাউন্ডের দুটো ধনুক ছিল ম্যাকনিলির। তার মধ্যে ইস্পাতেরটা সে আনিয়েছিল সুইডেন থেকে, আর কাঠের

ধনুকটা সে বানিয়েছিল তার পছন্দমতো অর্ডার দিয়ে ইংল্যান্ডের এক পাকা কারিগরের কাছ থেকে। রাজসন্দর্শনে যেতে হলে সব দিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া ভালো। তাই এখন সে তার প্রিয় কাঠের ধনুকটাই বেছে নিয়ে গুণ পরিয়ে নিল।

নালার কাছে পৌঁছে একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে নিল ম্যাকনিলি। এতটা পথ দৌড়ে যাওয়া-আসা করে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। এখন কিছুটা দম নিয়ে নেওয়া দরকার। বাঘের মুখোমুখি হতে গেলে প্রথমেই দরকার ঠান্ডা মাথা, শান্ত স্নায়ু। উত্তেজনার লেশমাত্র যে কোনো সময়ে মারাত্মক বিপদ ঘটাতে পারে।

দম নিয়ে তৈরি হওয়ার পর ম্যাকনিলি এবার ওন্‌ডিকে বিদায় দিল, 'ঠিক আছে, এবার তাহলে তুমি যেতে পারো ওন্‌ডি।'

ওন্‌ডিকে সঙ্গে না নেওয়ার কারণ আছে। পথ প্রদর্শক হিসাবে ওন্‌ডি যতখানি ওস্তাদ, বন্দুক ছোঁড়ায় সে ততটাই আনাড়ি। আর মজার কথা হল, ওন্‌ডি নিজেও এ কথাটা জানত। তাই ম্যাকনিলির কথায় কোনো প্রতিবাদ করল না সে। শিকারের সময় আনাড়ি লোক সঙ্গে রেখে অযথা বিপদের ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ কি?

এবার ধীরে ধীরে নালার পাশে এসে দাঁড়াল ম্যাকনিলি। নালার দুটো পাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে—দু-দিকেই ঝোপঝাড় ভরতি। ফলে বাঘের পালাবার পথ বন্ধ। মুখোমুখি লড়াইয়ে তাকে নামতেই হবে।

নালার জল বরফের মতো ঠান্ডা। দুরন্ত স্রোত, কিন্তু কোথাও খুব একটা গভীর নয়। পায়ের গোড়ালির বেশি ডোবে না। নালা পেরিয়ে অপর পারে গিয়ে ম্যাকনিলি একটা পাথরের টুকরো তুলে নিল। নালার প্রান্তে একটা বড় ঝোপ। ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধা হল না যে ওই ঝোপের মধ্যেই বিশ্রামের আয়োজন করেছে বাঘ। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সে এবার পাথরের টুকরোটা ছুড়ে দিল ঝোপ লক্ষ্য করে, আর ঠিক সেই সময়ে ঝোপের দিক থেকে বয়ে আসা একঝলক বাতাসে তার নাকে এসে লাগল বাঘের গায়ের উগ্র গন্ধ। পাথরটা গিয়ে পড়ল ঝোপের মধ্যে। ততক্ষণে পিঠের থেকে তীর টেনে নিয়ে ধনুকে জুড়ে ফেলেছে ম্যাকনিলি।

ঝোপের মধ্যে বাঘ একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছিল। ম্যাকনিলির

ছোড়া পাথরের টুকরো তার সেই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বিরক্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তার রাজত্বে ঠিক এই ধরনের বেয়াদবি সহ্য করতে সে অভ্যস্ত নয়। মৃদু গর্জনে বিরক্তি প্রকাশ করে সে বেরিয়ে এল ঝোপের বাইরে। বেরিয়ে এসে একটা অতিকায় বেড়ালের মতো সামনের দু-পা ছড়িয়ে প্রথমে শরীরের আড়মোড়া ভাঙল, মাটি আঁচড়াল বার কয়েক, তারপর মাথা তুলে তাকাল। অত্যন্ত ধীর স্থির ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি বরফেব মতো ঠান্ডা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ম্যাকনিলি তাকিয়ে দেখল যে ধনুকে সে ভুল তীর জুড়ে বসে আছে!

মাত্র কুড়ি গজ দূরে দাঁড়িয়ে জান্তব মৃত্যু। ম্যাকনিলি সাধারণত ওই কুড়ি গজ দূরে একটা সিগারেটের প্যাকেট রেখে তার মধ্যে দিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে পরপর ছ'টা তীর চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে একটু অন্যরকম।

যে তীরটা ম্যাকনিলি জুড়ে বসেছে, এটা পঞ্চাশ পাউন্ডের ধনুক থেকে ছোড়ার পক্ষে একটা আদর্শ তীর সন্দেহ নেই, কিন্তু পঁচাত্তর পাউণ্ডের ধনুক থেকে ছুড়লে এ তীর ধাক্কা সহ্য করতে পারবে না; কেঁপে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। আর এখন তীর পালটাবার প্রশ্নই ওঠে না, বাঘ এসে পড়েছে কুড়ি গজের আওতায়। ম্যাকনিলির সমস্ত শরীর বেয়ে বয়ে গেল একটা আতঙ্কের শিহরণ। তবু সেই আতঙ্কের মাঝেই ধনুকে আকর্ণ গুণ আকর্ষণ করল ম্যাকনিলি। তীরের ফলা চেপে বসল তার প্রসারিত বাঁ-হাতের মুঠোর উপর, ছিলার দুপাশ থেকে বেরিয়ে আসা লেজের পালকগুলো এসে ঠেকল তার গালের পাশে।

বাঘের আক্রমণের ধারাটা জানা ছিল ম্যাকনিলির। পারতপক্ষে বাঘ সোজাসুজি আক্রমণ করে না, সবসময় চেষ্টা করে ঘুরে গিয়ে পিছন থেকে শত্রুকে কাবু করতে। এখানে সে সুযোগ নেই, তবু একটু ঘুরে এসে সে গুঁড়ি মেরে বসল। আক্রমণের পূর্বাভাস বলতে ওইটুকুই। আর কোনো সংকেত নেই—নেই লেজের আন্দোলিত আস্ফালন, নেই দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা হিংস্র দাঁতের সারি, নেই অবরুদ্ধ গলার চাপা গর্জন। এক কথায় এই বাঘটা যেন অস্বাভাবিক রকমের ঠান্ডা। ঠান্ডা মানে শান্ত নয়, পেশাদার খুনির মতোই

ভাবলেশহীন।

ম্যাকনিলিও ঘুরে গিয়ে বাঘের মুখোমুখি হল। মুহূর্তমাত্র! পরক্ষণেই হলুদ-কালোয় ডোরাকাটা একটা বিদ্যুৎ উড়ে এল ম্যাকনিলির দিকে। ওই উড়ন্ত বিদ্যুতঝলকের মাঝে লক্ষ্য স্থির রাখা সোজা কথা নয়। তবু ম্যাকনিলির চোখে পলকের জন্য ধরা দিল হলুদ-কালোর মাঝখানে একফালি সাদা অংশ—বাঘের বুক আর পেট! সেই অংশটুকু লক্ষ্য করেই তীর ছেড়ে দিল ম্যাকনিলি, আর সেই সঙ্গে ডান দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাঘের উদ্যত আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য। তবু শেষরক্ষা হল না। চকিতের জন্য ম্যাকনিলি অনুভব করল, যেন একটা কঠিন রবারের প্যাডের উপর বসানো কয়েকটা ধারালো ছুরির ফলা তার কপাল ছুঁয়ে গেল—বাঘের থাবার স্পর্শ! ছিটকে পড়ল সে মাটির উপর। মাটিতে শুয়ে প্রতিমুহূর্তে ম্যাকনিলি অপেক্ষা করছিল মৃত্যুর জন্য; এখনই যে কোন সময়ে বাঘের নখ আর দাঁতের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তার দেহ...।

কিন্তু কই, আঘাত তো এল না। ধীরে ধীরে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাকনিলি। সারা দেহ তার অক্ষত ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে যেন ঝুলছে একটা পরদা; পরিষ্কারভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। ম্যাকনিলির বুঝতে অসুবিধা হল না ওই পরদার উৎস কোথায়? বাঘের থাবা তার কপালের উপর ক্ষতচিহ্নের সৃষ্টি করেছে।

পরীক্ষা করার জন্য হাত দিয়ে ক্ষতস্থান স্পর্শ করতেই অসহ্য যন্ত্রণার একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ ভেদ করে; এক ঝটকায় মাথাটা পিছন দিকে সরিয়ে নিল সে। আর চোখের সামনে কালো পরদাটাও সরে গেল তখনি, অবশ্য দু-এক সেকেন্ডের জন্য, তারপরই আবার নেমে এল পরদা। কিন্তু ম্যাকনিলি এবার বুঝতে পারল ক্ষতটা কি ধরনের। আসলে বাঘের থাবার ওই অল্প একটু আঁচড়েই তার কপালের বেশ খানিকটা চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে দুটো চোখের উপর। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করে ম্যাকনিলি সেই ঝুলে পড়া চামড়াটাকে হাত দিয়ে চেপে ধরল যথাস্থানে। এবার পরিষ্কার দেখতে পেল সে—

একটু দূরেই পড়ে আছে বাঘ—নিস্পন্দ, মৃত। কাত হয়ে পড়ে থাকা

তার শরীরের মধ্যে আমূল বিঁধে রয়েছে তীরটা। শুধুমাত্র পালকগুলো ছাড়া তীরের আর কোনো অংশই দেখা যাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে নালাটা পার হল ম্যাকনিলি। কিন্তু বরফের মতো ঠান্ডা জল এবার তার মধ্যে কোনো অনুভূতিই জাগাল না—তার সমস্ত শরীর-মন জুড়ে তখন শুধু এক তীব্র যন্ত্রণার স্বাদ।

কিছুদুর গিয়েই ওন্‌ডির দেখা মিলল। 'বাঘটা মরে পড়ে আছে, তুমি আমার ধনুক আর তীরগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে এসো,' এর বেশি আর কোনো কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না ম্যাকনিলির।

তাঁবুতে যখন ম্যাকনিলি ফিরল তখন হিমালয়ের কোল ঘেঁষে সন্ধ্যা নেমে আসছে। তাঁবুতে ফিরে দেখা হল মজুমদারের সঙ্গে।

'শেষ পর্যন্ত তীর দিয়েই বাঘটাকে মারলাম, বুঝলে মজুমদার,' বলল ম্যাকনিলি, 'তবে ওটা ভুল তীর ছিল।'

ওই একটিমাত্র কথা, তারপরই তার চেতনাকে লুপ্ত করে নামল মূর্ছার অন্ধকার।

পরে নিজের জীবনের এই কাহিনি কোনো বন্ধুকে বলতে বসলে ম্যাকনিলি বলত, 'আমার এই গল্পটা থেকে একটা শিক্ষা অন্তত নেওয়া উচিত—তা হল একান্তই যদি কখনো তীর-ধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করতে হয় তবে নিদেনপক্ষে তীরটা একবার ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া বড় দরকার। নয়তো, চরম মুহূর্তে আমার মতো ঘটনা ঘটলে, ভাগ্য ছাড়া তোমাকে আর কেউ যে নতুন করে পৃথিবীর আলো দেখাবার বন্দোবস্ত করতে পারবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

পা র্ব তী

'আমার বোধহয় একটু তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল, বাহাদুর সিং-এর হাতের চাপে চমকে উঠলাম।

খড়ের গাদার ঠিক পেছনেই গজ কয়েক দূরে, যেন একটা মৃদু শব্দ! কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কানে এল একটা ক্ষীণ গর্জন—এবার আমাদের পাঁচ-ছ'গজের মধ্যেই একেবারে।

'জন্তুটা তবে কি আমাদের আবিষ্কার করতে পেরেছে?' কথাটা মনে হওয়ার সাথে একটা ঠান্ডা স্রোত যেন নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। প্রশ্নের উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, পরের মুহূর্তেই গাদাটার ঠিক উপরে অনুভব করলাম একটা ভারী শরীরের শব্দহীন চলাফেরা, সেইসঙ্গে একটা উগ্র বুনো গন্ধ! মাথার উপরেই সাক্ষাৎ মৃত্যু!

'লাফিয়ে পড়ো বাহাদুর সিং!' চিৎকার করে উঠলাম আমি আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের কঠিন পাথুরে মাটির উপরে। পরক্ষণেই একটা বিরাট কালো থাবার আঘাতে

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আমাদের এক মুহূর্ত আগের বাসস্থানের উপরের খড়গুলো।

ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে বাহাদুরের হাতের টর্চ। সেই আলোর রশ্মিতে দেখা গেল খড়ের গাদার উপর যেন খানিকটা অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে আর সেই জমাট-বাঁধা আঁধারের মাঝখানে মৃত্যুর শীতলতা নিয়ে জেগে আছে দুটো সবুজ চোখ। ব্ল্যাক প্যান্থার! কালো চিতা!

খানিকটা সম্মোহিতের মতো যেন গুলি ছুড়লাম আমি। পরপর দুটো। দুটো গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, তার উপর যথেষ্ট সতর্ক না থাকার জন্য রাইফেলের ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম কঠিন মাটিতে।

জীবনটাও বাঁচল সেইজন্য। কারণ শুয়ে শুয়েই বেশ লক্ষ্য করলাম যে একটা বিরাট শরীর শূন্য দিয়ে উড়ে চলে গেল আমাকে টপকে—দাঁড়িয়ে থাকলে আর রক্ষা ছিল না।

সম্বিত ফিরতে উঠে দাঁড়ালাম। বাহাদুরের টর্চও আবার জ্বলে উঠেছে। বন্দুক আবার 'লোড' করে শুরু হল খোঁজাখুঁজি। কিন্তু সামনে নিরেট আঁধারের বুক ঘুরে ঘুরে চক্র দিয়ে আলোর রশ্মি কিছুই আবিষ্কার করতে পারল না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করার পরই বুঝলাম—আজ আর তাকে পাবার নয়, প্যান্থারটা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে।'

এতক্ষণ যে বিবরণটুকু আমরা শুনলাম তার কথক হলেন একজন বিদেশি শিকারি—ডেভিস সাহেব। বৃটিশ শাসনের আমলে আরও বহু সাহেবের মতো তিনিও একটা 'শিকার অভিযানে' এসেছিলেন সেবার হিমালয়ের কোলে। এই ধরনের ছোট সাদামাটা 'শিকার-অভিযান' যাওয়ার চলটা তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ হাতি-ঘোড়া, লোক লস্কর নিয়ে জঙ্গল খেদিয়ে নয়, বরং এক-দুজন সঙ্গী কি পথপ্রদর্শক সাথে করে বেরিয়ে পড়া। তাতে ঝুঁকি বেশি কিন্তু আনন্দ প্রচুর। ডেভিস সাহেবের নিজের ভাষায় বলতে গেলে—

'সেবার স্যুটিং-ট্রিপে গেছিলাম হিমালয়ের সানুদেশে একটা ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে। সবুজ উপত্যকার মাঝখানে হঠাৎ একগুচ্ছ বাহারী ফুলের মতো গ্রাম এই 'ওয়ান'। আমার ছোট দলটার মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত আর ওস্তাদ শিকারি ছিল বাহাদুর সিং। জাতে নেপালি, ভালো পথপ্রদর্শকও বটে। বন্দুক, রাইফেল ছাড়াও বাহাদুরের শিকারের

আরেকটি প্রিয় অস্ত্র হল তার 'কুকরি' বা ভোজালি।

ওয়ান গ্রামে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল। ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর ছুঁইছুঁই। তাঁবু খাটিয়ে সবে একটু চায়ের আয়োজন করছি, এমন সময় কয়েকজন গ্রামবাসী এসে হাজির। বিশেষ প্রয়োজনে নাকি তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বাধ্য হয়ে দেখা করতে হল বিশ্রামে ইস্তফা দিয়ে।

লোকগুলো খুবই উত্তেজিত। তাদের সেই এলোপাথারি কথাবার্তা থেকে যা বোঝা গেল, তার মর্মার্থ ঃ ক'দিন ধরে একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ তাদের গ্রামের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, এবং গত দু-দিনে তার শিকার হয়েছে দুটি স্থানীয় যুবক। ফলে গভীর আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে গোটা গ্রামটার উপরে। এখন সাহেব যদি বাঘটাকে মেরে তাদের উদ্ধার করেন এই আশায় তারা ছুটে এসেছে তাঁর কাছে।

শরীর সায় দিচ্ছিল না বটে, কিন্তু বিবেকের দায়েই খানিকটা, বাহাদুরকে সঙ্গী করে আমি গ্রামবাসীদের, অনুসরণ করলাম।

ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর এসে পৌঁছলাম একটা পার্বত্য অধিত্যকার বুকে। অধিত্যকার পাদদেশ বেষ্টন করে চলে গেছে খরস্রোতা এক পাহাড়ি নদী। অধিত্যকার উপরে এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা মাটির ঘর। বুঝতে দেরি হল না, এই সেই জনপদ—'ওয়ান' গ্রাম। গ্রাম না বলে বরং ক'টা ঘর বললেই ভালো হয়।

'ওই খানে বাঘটা প্রথম লোকটাকে মেরেছিল।'—গ্রামের প্রান্তে একটা মাঠ দেখিয়ে বলল একজন অধিবাসী। ওটাই গরু মোষ চরাবার জায়গা।

সে রাতটা কোনোরকমে কাটালাম একটা নড়বড়ে দোচালা ঘরে। বাঘটা সম্বন্ধে সেদিন আর বিশেষ কিছুই করার নেই, কারণ হিমালয়ের কোল ছুঁয়ে তখন রাত্রি নেমে এসেছে।

পর দিন সকালে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে জানতে পারলাম যে, বাঘটার প্রথম শিকার এক রাখাল।

মাত্র দুদিন আগেকার ঘটনা। অন্য দিনের মতো সেদিনও ছেলেটা ছাগল চরাতে মাঠে গিয়েছিল। পিছনদিকের একটা টিলার উপর থেকে বাঘটা কখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে টেরও পায়নি। মারা

যাওয়ার আগে বড় জোর একটা মৃদু চিৎকার করতে পেরেছিল ছেলেটা, কিন্তু ছাগলগুলো তাতেই সাবধান হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়ে।

দ্বিতীয় ঘটনা ঘটে তার পর দিন, অর্থাৎ গতকাল রাতে। গরু-ছাগলগুলো পাহারা দিতে প্রতি রাতের মতো গতকালও দুজন গ্রামের লোক মাঠে মোতায়েন ছিল! আগের দিনের ঘটনার জন্য দুজনেই বেশ সতর্ক হয়ে পাহারা দিচ্ছিল। মাঝরা:তে তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ যেন একটা হালকা গর্জনের শব্দ শুনতে পায়, কিন্তু সঙ্গীকে সাবধান করে দেওয়া দূরে থাক সে নিজেও আর সাবধান হওয়ার সুযোগ পায়নি। বাঘটা আক্রমণ করে একজনকে টেনে নিয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে।

এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর গ্রামজুড়ে প্রচণ্ড ত্রাস আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই। ফলে এখন পাহারা দেবার জন্য চারণক্ষেত্রে যেতে আর কেউ রাজি নয়।

গ্রামবাসিদের বিদায় দিয়ে সবে আমরা একটু শোওয়ার উদ্যোগ করছি, এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল মেয়েলি গলার আর্তনাদ। রাইফেল তুলে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি, বাহাদুর আগেই

উঠে বসেছে। দুজনে তাড়াতাড়ি খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, কিন্তু বাইরে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু মনে হল, দূরে একটা গর্জন যেন ক্রমশ ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হয়ে শেষে মিলিয়ে গেল।

নীচের থেকে স্ত্রীলোকটির আর্তনাদ কিন্তু তখনো ভেসে আসছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দুজন মিলে নেমে গিয়ে দেখলাম যে, দরজা বন্ধ একটা ঘরের ভেতর থেকেই আসছে আওয়াজটা। বিস্তর ধস্তাধস্তিতে যখন দরজা খুললো না, তখন দরজা ভেঙেই ঘরে ঢুকতে হল। ঘরে ঢুকে কিন্তু আমরা অবাক! ধারণা ছিল, চিতাবাঘটা বোধহয় আরেকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে ভোজ লাগাতে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু কোথায় কি? ঘরে সেরকম কোনো কিছুর চিহ্নমাত্র নেই। আসল ঘটনাটা বুঝলাম পরে।

বাঘটা এসেছিল ঠিকই, তবে শুধু দরজায় আঁচড় কেটে আর দু-একটা চাপা গর্জন করেই ক্ষান্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে। বাঘেরও নেহাত দোষ দেওয়া যায় না, কারণ চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনেই ভেতর থেকে যেরকম তারস্বরে আর্তনাদ শুরু হয়ে গেছিল তাতে পৃথিবীর যে কোনো বাঘেরই কান ঝালাপালা হয়ে যেত, রণে ভঙ্গ দিয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে তাই স্থানত্যাগ করেছে এই বাঘটাও। যা হোক, বাকি রাতটুকু পাহারা দেব বলে অভয় দিয়ে আমরা চলে এলাম। বাকি রাতটুকু জেগে কাটল।

পর দিন সকালে গত রাতের ঘটনাস্থল আর গ্রামের আশপাশটা ভালো করে দেখে শুনে নেওয়ার জন্য ঘরটার কাছে হাজির হয়ে দেখি, কাছেই মাটির উপর বাঘটার পায়ের ছাপ বেশ পরিষ্কার ভাবেই চেপে বসেছে। বাহাদুর সিং খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল পায়ের ছাপগুলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাঘটার বাঁ-পায়ে জখম আছে বাবুজি, ওই দেখুন ছাপটা কত হালকা। রাতে ওই জন্যই গোঙাচ্ছিল।' জঙ্গলের ভাষা পড়তে বাহাদুরের বিশেষ ভুল হয় না। বাঘটার নরখাদক হওয়ার কারণ এবার বোঝা গেল।

খানিকক্ষণ বাদেই জনাকয়েক গ্রামবাসীর সঙ্গে গরু-ছাগল চরাবার মাঠটার উপর এসে পৌঁছলাম। মাঠটার তিন দিক বেড় দিয়ে পাঁচিল

তৈরি করেছে ঝোপঝাড়ের ঘন জঙ্গল, বড় গাছের অবশ্য দেখা মিলল না একটাও আওতার মধ্যে। অন্যদিকে একটা ছোট পাথরের টিলা খাড়া দাঁড়িয়ে। টিলাটার পাশ দিয়ে একখণ্ড পাথর শূন্যে ঝুলে রয়েছে আর তার প্রায় দুশো ফুট নীচে ভীমগর্জনে বয়ে চলেছে প্রবলগতি পাহাড়ি নদী। মাঠটার প্রান্তে একটা খড়ের ঘর চোখ পড়ল, এই ঘরটিই বোধহয় রাখালদের রাতের আশ্রয়। বেশ মজবুত বলেই মনে হল ঘরটাকে। ঘরটার ঠিক পাশেই কিছু খড় গাদা করে রাখা।

বাহাদুর সিং সেই গাদার পাশে মাটির উপর কিছু একটা এতক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করছিল বেশ মনোযোগ দিয়ে। আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যেতে বললে, 'বাঘটার পায়ের ছাপ। এইখানেই শিকার ধরেছিল জন্তুটা।' আমিও দেখলাম, মাটির উপর টাটকা প্রায় চারজোড়া থাবার ছাপ। বড়জোর দিন দুয়েকের পুরোনো, কিন্তু এখন বেশ স্পষ্ট।

আশেপাশের অবস্থাটা বুঝতে গিয়ে এবার একটু বিপাকে পড়লাম। আগেই বলেছি জায়গাটার চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়, কিন্তু মাচা বাঁধার মতো একটা মাঝারি গোছের গাছেরও খোঁজ পাওয়া গেল না। তবে কি মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকার করতে হবে? অসম্ভব। তাহলে উপায়? আমার অবস্থাটা বোধহয় বাহাদুর বুঝতে পেরেছিল। সে বললে, 'বাবুজি, ওই খড়ের গাদার ভিতরটা ভালো জায়গা নয়?'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। গাদাটা প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু, চওড়ায় চারফুটের মতো। আমাদের দুজনের পক্ষে যথেষ্ট। আর তাছাড়া উপায়ই বা কি? সুতরাং মনস্থির করে গ্রামের দিকে ফিরলাম।

রাত জাগতে হবে বলে দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু বিছানায় গড়িয়ে নিয়েছিলাম। বিকেলে যখন চারণভূমির কাছে পৌঁছলাম তখন পশ্চিমের আকাশ লাল করে আস্তে আস্তে সূর্যটা ডুবে গেল। একটু পরেই লাল আভাটুকু মিশে গিয়ে নেমে আসবে রাত্রির কালো ওড়না। বাতাসে শীতের ছোঁয়া লেগেছে এর মধ্যেই। ছাগলগুলো এদিক-সেদিক চরে বেড়াচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে কখন সেই ছাগলগুলোর কাছে গিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ চমকে উঠলাম ভীষণভাবে!

প্রকাণ্ড একটা কালো পাহাড়ি ছাগল আমার দিকে তেড়ে আসছে শিং বাগিয়ে। কেন যে সে আমাকে তার শত্রু ঠাহর করে নিল বুঝতে পারলাম না, আর বুঝবারও সময় তখন আর নেই, কোনোরকমে লাফ দিয়ে একপাশে সরে জন্তুটার জোড়া সঙিনের মতো প্রকাণ্ড শিং-দুটোর নাগাল এড়ালাম। লাগলে আর রক্ষা ছিল না, একেবারে শিকে গাঁথা কাবারের মতো অবস্থা হত।

সঙ্গে যে গ্রামের লোকগুলো ছিল, ততক্ষণে তারা ধাতস্থ হয়েছে। তাদেরই একজন ছাগলটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অপর একজনের মুখে শুনলাম ক'দিন আগেই এই ছাগলটার বাচ্চা হয়েছে, তাই সবসময়

বাচ্চা আগলে আগলে থাকে। কেউ বাচ্চার কাছাকাছি গেলেই বিশ্রী ভাবে তেড়ে আসে। যাক্, তবু স্বস্তি। কারণটা অন্তত বোঝা গেল; নইলে বাঘের চেয়ে এইরকম একপাল বুনো ছাগল অনেক বেশি বিপজ্জনক বলেই আমার ধারণা।

অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হয়ে নামছে। ছাগলগুলোকে রেখে গ্রামের লোকগুলো বিদায় নিয়ে চলে গেছে প্রায় মিনিট দশেক হতে চলল। বাহাদুরকে বললাম, 'আর বোধহয় খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না, কি বল? চলো, এবারে খড়ের গাদাটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে বসা যাক।'

আমার সঙ্গে রয়েছে দোনলা বন্দুক আর বাহাদুরের কাছে একটা জোরালো টর্চ। সঙ্গের অস্ত্র বলতে তার শুধু কুকরি।

খড়ের গাদার ভিতরে পাশাপাশি শুয়ে আছি আমরা। অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, ছাগলগুলোকে আর স্পষ্ট দেখা যায় না। যেন কতগুলো ছায়া নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে শুধু। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বোধহয় একটু তন্দ্রার ঘোর এসে থাকবে। বাহাদুর সিং-এর হাতের চাপে সেই ঘোর কেটে গেল। পিছনে একটা অস্পষ্ট মৃদু শব্দ...।

এরপরের ঘটনা আমরা প্রথমেই শুনেছি। শুনেছি কীভাবে কালো চিতাটা শিকারিদের টর্চ আর বন্দুককে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে পড়েছে গাঢ় অন্ধকারের বুকে। তারপর? তাহলে আবার ফিরে যাই ডেভিস সাহেবের বিবরণে।

'... নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু তার মধ্যে বাহাদুরের হাতের টর্চ জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। বুঝলাম, এই অবস্থায় ফাঁকা মাঠের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। চিতার চোখ মানুষের চেয়ে ধারালো। বাহাদুরকে লক্ষ্য করে চাপা গলায় বললাম, 'শিগগির টিলার দিকে চলো।' দুজনে খুব সতর্ক হয়ে এগোলাম টিলাটার দিকে।

টর্চ তখনো জ্বলছে। হঠাৎ টর্চের আলো টিলাটার গায়ে একটা চক্র দিয়ে ঘুরে এসেই স্থির হয়ে গেল। স্থির হয়ে গেলাম আমরাও। আলোর আওতার মধ্যে পরিষ্কার চোখে পড়ছে একটা বিরাট কালো দেহ। আক্রমণের উদগ্র আগ্রহে সেই দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে, মাথাটা

ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। না, কালোচিতা নয়, সেই ছাগলটা।

কিন্তু তার আক্রমণের লক্ষ্য কে? আমরা যে নই, সেটা ভঙ্গি দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায়। উত্তর পেতে দেরি হল না। বাহাদুরের টর্চ ছাগলটাকে পেরিয়ে খানিকদূর এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারলাম।

ঝুলন্ত পাথরটার একেবারে শেষ প্রান্তে একজোড়া সবুজ চোখ জ্বলছে। গুঁড়ি মেরে বসা শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশি যেন ঠেলে উঠেছে কালো চামড়ার মধ্যে দিয়ে। লাফ দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে চিতাবাঘ।

এক মুহূর্ত দেরি না করে বন্দুক তুললাম। কিন্তু গুলি আর ছোঁড়া হল না। বন্দুকের ট্রিগার টানবার আগেই বিদ্যুতের মতো আর একটা দেহ যেন উড়ে গেল বাঘটার দিকে। পরক্ষণেই কানে এল দুটো ভারী শরীরের সঙঘর্ষের শব্দ। তারপর আবার সব চুপচাপ!

কী ব্যাপার? প্যান্থারটা আবার কোথায় লুকোলো? অথচ লুকোবার জায়গাও তো নেই ধারে কাছে। টর্চের আলোতে ছাগলটাকে দেখা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাঘটা?

প্রশ্নের উত্তর ভেসে এল আরও খানিকক্ষণ বাদে নীচে নদীর বুক থেকে—ঝপাস! এবার আর সন্দেহ নেই—মা-ছাগল তার বাচ্চাকে ঠিকমতোই আগলেছে বটে।

পর দিন সকালে গ্রামবাসীদের নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে কিন্তু নিরাশ হতে হল। নিরাশ হওয়ারই কথা, ততক্ষণে পাহাড়ি নদীর দুরন্ত স্রোত বাঘের মৃতদেহ কোথায়, কতদূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কে জানে?

'শ্যুটিং ট্রিপ' শেষ করে ফিরে এসেছি, সঙ্গে বয়ে এনেছি স্মৃতি। হিমালয়ের কোলে পর্বতবাসিনী পার্বতীর সেই রুদ্ররূপ আমার মনে চিরদিন গেঁথে থাকবে। বাহাদুর সিং-এর একান্ত অনুরোধে আমি সেই মা-ছাগলটিকে তার বাচ্চাসমেত কিনে নিয়েছিলাম গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ওরা এখন বহাল তবিয়তে বাহাদুরের জিম্মায়।'

ইস্‌বর্ণ!’

‘আমেরিকার ছয় শিকার।’

শিকারিদের মধ্যে চালু কথা। কিন্তু ওই কথা পর্যন্তই, না হলে বৈঠকখানার দেওয়ালে পরপর ওই ছয় কুলীনের গায়ের চামড়া কি ফ্রেমে-আটকানো মাথা টাঙিয়ে রাখার সৌভাগ্য হয়েছে খোদ আমেরিকারই বা ক'জন শিকারির। তিন-চারটে অবধি সংগ্রহ করে তারপর বাকি দুটোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেও আর হয়নি, এমন লোকের

সংখ্যা প্রচুর। আবার শুরুতেই মন্দভাগ্য—পৃথিবীর আলো আর দেখা হয়ে ওঠেনি, এমন লোকের খোঁজও কম মিলবে না।

এই ছ'জনের প্রত্যেকেই নিজের নিজের পরিবারের কর্তাব্যক্তি—হরিণ পরিবারের 'মুজ', ফোঁটা-কাটা বাঘেদের পরিবারে 'জাগুয়ার', ভেড়া আর ছাগল পরিবারের দুই পাহাড়ি সভ্য আর সবশেষে ভালুক পরিবারের বিশিষ্ট দুজন—'মেরুভালুক' আর ভয়ংকর 'গ্রিজলী'।

এদের মধ্যে কেউই বন্দুকের নিশানার মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অভ্যস্ত নয়। স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়েও এদের কাউকে নিরীহ, শান্তশিষ্ট বলে সার্টিফিকেট দেওয়া চলে না। আস্তানাও এদের দুর্গম সব অঞ্চলে। এই তিন গুণের ত্র্যহস্পর্শে তাই এরকম ছ'টা শিকার এক জীবনে করে ওঠা দুষ্কর। তবে একবার করে ফেললে আর কথা নেই। নিজের বন্দুকটাকে তখন পৃথিবীর প্রথম সারির শিকারিদের বন্দুকগুলোর পাশে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে নিশ্চিন্তে।

রে এট্‌কিন্‌সের হয়েছিল চারটে। বাকি ছিল জাগুয়ার আর মেরুভালুক। জাগুয়ারের খোঁজ মেলে আমেরিকায়, তাছাড়া জাগুয়ার শিকারে ঝামেলা বেশি; তাই সেটা ছয় নম্বরে তুলে রেখে পাঁচের খোঁজে বেরিয়েছিল এট্‌কিনস্।

জন্মসূত্রে টেক্সাসের বাসিন্দা, কিন্তু উত্তর আমেরিকার পাহাড়ের ঢালে নীল মেঘের মতো পাইন গাছের বনে বন্দুকের গুলিতে বিরাট এক গ্রিজলীকে শুইয়ে দেওয়ার পর থেকেই এট্‌কিন্‌সের খোঁজ শুরু হয়েছিল পাঁচ নম্বরের জন্য। গ্রিজলী ছিল চারের বাজি!

আলাস্কায় বেশ কিছু ঘোরাঘুরি করে খবর যা পাওয়া গেল, তা সুবিধের নয়। সাদা বরফের মতো তুষারভালুক প্রায় নিপাত্তা হতে বসেছে এ অঞ্চল থেকে। কপাল ঠুকে যদি বা এক-আধটার দেখা মেলে তো তার জন্যে স্লেজগাড়িতে ঘুরতে হবে হন্যে হয়ে। ঘুরলেও যে খোঁজ মিলবে এমন কথা হলপ করে বলবে না কেউ, অথচ চেষ্টার ক্রটি রাখলেও চলবে না—এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ঘুরে মরা।

দেখে শুনে যখন হাল ছেড়ে দেবার অবস্থা, তখনই মুশকিল আসান করতে এসে পৌঁছল বেনেট ট্র্যাভেল ব্যুরোর চিঠি। সম্ভব-অসম্ভব যত জায়গা রয়েছে হাতের কাছে, এট্‌কিন্‌স্ তো আর খোঁজ করতে বাকি

রাখেনি কোথাও—ট্র্যাভেল ব্যুরোর চিঠি তারই ফলশ্রুতি। চিঠির ভাষা পরিষ্কার—আগামী সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে একটা সাদাভালুক শিকার-অভিযানের বন্দোবস্ত করেছে বেনেট কোম্পানি। যেতে হবে অবশ্য একটু দূরে—প্রায় হাজার ছয় মাইল পাড়ি দিয়ে উত্তর ইয়োরোপে; নরওয়ের প্রান্তসীমায়। তবে শিকারের ব্যাপারটা প্রায় হাতের মুঠোয়—স্পিট্‌স্‌বারগেল দ্বীপমালায় তুষারভালুকের নাকি গাদাগাদি ভিড়। অভিযাত্রীদের মাথাপিছু ভাড়া একহাজার ডলার।

মনস্থির করতে এক সেকেন্ডও লাগল না।—হাতের কাজগুলো কোনোরকমে সেরে নিয়েই এট্‌কিন্‌স্‌ চড়ে বসল প্লেনে।

নরওয়ের রাজধানী অসলো-য় নেমে ট্রমসোতে যেতে হয়। ট্রমসো হল উত্তর মেরুবৃত্তের প্রায় দুশো মাইল ভেতরে। ট্রমসো থেকে যাত্রা শুরু জলপথে।

একটা ডিমকে লম্বালম্বি আধখানা করলে যা হয়, সাতান্ন ফুট লম্বা জলপোত 'হাভেলা' দেখতে ঠিক সেইরকম। কারণ, ঝোড়ো হাওয়ায় বরফের চাঙড় ভেসে এসে যদি দুপাশ থেকে জাঁতাকলের মতো ছোট্ট জাহাজটাকে চেপে ধরে তাহলে ভেঙে চুরমার হওয়ার বদলে যেন বরফের উপরেই সেটা পিছলে উঠে যায়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। ইঞ্জিন ছোটখাটো দেখতে হলেও জোরালো। ডিজেলে চলে।

কার্ল নিকোলিয়েসন বলে যে চালকটিকে 'হাভেলা'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, বরফের চাঁই-ভাসা সমুদ্রের সে একজন দক্ষ নাবিক। মেরুর প্রচণ্ড তুষারবাত্যায় যখন ছোটখাটো পাহাড়ের মতো হিমশৈল চারিদিক থেকে ভেসে আসে কিম্বা গোটা সমুদ্র জমে বরফের প্রান্তরে পরিণত হয় তখন তার মধ্যে দিয়ে সরু সরু গলির মতো খাঁড়ি খুঁজে জাহাজ চালাতে গিয়ে সাধারণ নাবিক থই পায় না। তার জন্য চাই বরফের রাজ্য টুঁড়ে আসা মানুষ। কার্ল ছিল সেই মানুষ।

যাত্রা শুরু করার দুদিন বাদেই এল ঝড়। দূরবীনে চোখ রেখে কার্ল তাকিয়ে ছিল খাঁড়ির দিকে—হঠাৎ তার কপালে ফুটে উঠল উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ভাঁজ। সর্বনাশ! হাওয়ার তোড়ে দুপাশের বরফ ভেসে আসছে খাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিতে। একবার এর মাঝে আটকে পড়লে আর রক্ষা নেই—হতাশ হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে হবে যতদিন বরফ

না সরে। কবে সে বরফ সরবে তাও কেউ জানে না, আর ততদিনে রসদ যদি ফুরিয়ে যায় তো চমৎকার! একেবারে সোনায় সোহাগা।

আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে পূর্ণশক্তিতে জাহাজ ছোটাল কার্ল। থরথর করে কাঁপতে লাগল গোটা 'হাভেলা'। চারদিন ধরে ছুটল জাহাজ, বরফের পাহাড়ের গা ঘেঁষে, পাড় ছুঁয়ে, সরু খাঁড়ির মধ্যে দিয়ে মাছের মতো পথ করে।

শেষে পাঁচ দিনের মাথায় থামল ঝড়। ভালো করে রান্নাবান্না, খাওয়া-দাওয়াও হল সে দিন। কেবিনে গিয়ে গা এলিয়ে দিতেই এট্‌কিন্‌স্ ডুবে গেল ঘুমের গভীর অতলে।

ঘুম ভাঙল যখন, দূর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে বলে মনে হল এট্‌কিন্‌সের। একটু ধাতস্থ হতে অস্পষ্ট আওয়াজটা ক্রমে একটা শব্দে পরিণত হল। কেউ যেন বারবার বলে চলেছে ইস্‌বর্ণ্! ইস্‌বর্ণ্!

চোখ খুলল এট্‌কিন্‌স্। না, দূরে কোথাও নয়—তার কেবিনের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যাগে; অ্যাগে রাভোল্ট। জাতে নরউইজিয়ান। ক্রমাগত বলে চলেছে সেই—ইস্‌বর্ণ্! ইস্‌বর্ণ্!

কিন্তু এই ইস্‌বর্ণ্ পদার্থটা কি? একবিন্দু মাথায় ঢুকছে না এট্‌কিন্‌সের। না ঢোকারই কথা অবশ্য। কারণ অ্যাগে একবর্ণ ইংরেজি জানে না, এট্‌কিন্‌স্ জানে না নর্স্‌ভাষার ক-অক্ষর।

তবু ভাবভঙ্গি বুঝে পিছন পিছন বাইরে বেরোল এট্‌কিন্‌স্। 'হাভেলা' দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে—শান্ত, স্থির। ডেকের উপর এসে দূরবীণটা হাতে তুলে নিল অ্যাগে। সেই দূরবীনে চোখ রেখে অ্যাগের নির্দেশমতো তাকিয়ে প্রথমে সাদা বরফের রাজ্যের মাঝে কয়েকটা কালো পাহাড়ের গা ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না বটে কিন্তু দূরবীনটা তারপর এক জায়গায় স্থির রাখতে ব্যাপারটা নজরে এল। কালো পাহাড়ের গায়ে একটা সাদা বিন্দু নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে যেন! এতক্ষণে ইস্‌বর্ণ্ এর মানে বুঝল এট্‌কিন্‌স্—নরওয়ের ভাষায় তুষারভালুক হল ইস্‌বর্ণ্।

জনাকয় নাবিককে নৌকা নামাতে বলে এট্‌কিন্‌স্ তখনি কেবিনে ছুটল বন্দুক আর ক্যামেরা নিয়ে আসতে।

কালো পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এক এক জায়গায় জমে আছে সাদা পেঁজা তুলোর মতো বরফ। গত চার দিনের দুরন্ত ঝড়ের পর হাওয়া আজ পড়ে এসেছে, সমুদ্রও স্থির।

হাওয়া চলাচল স্বাভাবিক হলে পাথরের খাঁজ থেকে বাইরে আসে 'সীল'-এর দল আর তার পিছনে শিকারের জন্য দেখা দেয় মেরুভালুক। ছোট-বড় সব পাথরের চাঁই ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে; তারই আড়ালে গা-ঢেকে শুধু বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ শুঁকে এগিয়ে আসে ভালুক।

এই চারদিন যেভাবে ঝড় চলেছে তাতে একটা সীল-এরও দেখা মেলেনি। তাই পাঁচদিনের দিন শ'খানেক গজ দূরে দু-দুটো প্রকাণ্ড সীল-এর দেখা পেয়ে বাতাসে গন্ধ শুঁকে এগোল বিরাট স্ত্রী-ভালুকটা। হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে থমকে দাঁড়াল ভালুক। সীল তো এভাবে ডাকে না কখনো। কিন্তু শুধু আওয়াজে ঘাবড়াবার পাত্রী নয় মেরুরাজ্যের মহারানি—সামলে উঠে তখনি সে আবার এগোল সামনের দিকে।

সীল দুটো ও দিকে তখন মুভি ক্যামেরা চালিয়ে ভালুকের ছবি তুলতে ব্যস্ত। আওয়াজটা ওই ক্যামেরার। প্রায় আশি গজের আওতায় যখন এসে পড়েছে ভালুক, তখন ক্যামেরা নামিয়ে রাইফেলটা তুলে নিল এট্‌কিন্‌স্‌। অ্যাগে রাভোল্ট আগেই তৈরি হয়েছিল কোমরের পিস্তল খুলে নিয়ে চরম মুহূর্তের জন্য—যদি রাইফেলের গুলি ফসকায়!

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। একটাই গুলি, তাতেই কেল্লা ফতে! সামনে গিয়ে শিকার দেখে খুশিই হল এট্‌কিন্‌স্‌। মাঝারি আকারের স্ত্রী-ভালুক একটা।

কিন্তু আনন্দ করার সময় বিশেষ পাওয়া গেল না—বেশ কিছুটা দূরে একটা কিছুর নড়াচড়া ডান চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করল রে এট্‌কিন্‌স্‌। বন্দুকে গুলি ভরে ফিরতে হল সেই দিকে।

আরেকটা তুষার ভালুক! আকারে রীতিমতো দশাসই। পাথরের চাঁই-এর আড়াল নিয়ে এ দিকেই এগোচ্ছে সে।

সম্ভবত বন্দুকের আওয়াজ তার কানে গিয়ে থাকবে, তাই এই কৌতূহল। এখানকার ভালুকগুলোর অনেকেই জীবনে মানুষ দেখেনি,

বন্দুকের আওয়াজ শোনা তো দূরের কথা। অপরিচিত আওয়াজ বা আকার দেখলে তাই খাবার জিনিস বলেই তারা ঠাহর করে একমাত্র।

বেশ রয়ে-সয়ে এটারও ছবি তুলল এট্‌কিন্‌স্‌, তারপর একটি গুলির তো মামলা! খানিকক্ষণ বাদে আর একটা ভালুক—এটা ছোটখাটো, নেহাতই নাবালক গোছের।

মোটামুটি ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে গোটা একটা তুষারভালুকের পরিবার শিকার করে পরিতৃপ্ত মনে জাহাজে ফিরল রে এট্‌কিন্‌স্‌। বেনেট কোম্পানি ধাপ্পা দেয়নি। আসতে হয়েছে তাকে অনেকটা পথ বটে, নইলে বৈঠকখানায় বসে বই পড়ার মতোই সহজে হয়েছে শিকার।

পাঁচ নম্বরের বাজি জিতে খুশি হয়েছিল এট্‌কিন্‌স্‌। ভাগ্যবান মানুষ হিসাবে ছ'নম্বরও একদিন জুটেছিল তার কপালে। টেক্সাসে সম্ভবত এট্‌কিন্‌স্‌ প্রথম মানুষ যার বৈঠকখানায় ঝুলেছিল ছ'ছটি মূল্যবান শিকারের স্মৃতি।

কিন্তু উলটোদিকের কথাটাও একটু জানা দরকার। এই দিকে এট্‌কিন্‌সের মতো শৌখিন মানুষ, অন্য দিকে তুষার ভালুকের চামড়া ও বাচ্চা চড়াদামে বেচে যারা প্রচুর টাকার ব্যবসা করছে তাদের দৌলতে পৃথিবীর বুকে এই অপূর্ব সুন্দর জন্তুটি আর কতদিন হেঁটে চলে বেড়াবে কে জানে?

মানুষের শখ আর লোভ মেটাতে এইভাবেই তো নয়-নয় করে প্রায় আড়াইশো জাতের পশুপাখি সবুজ বন আর নীল আকাশের চৌহদ্দি থেকে বিদায় নিয়েছে চিরদিনের মতো। এখন তাদের দেখা মিলবে শুধু পৃথিবীর যত বড় বড় যাদুঘরে আলোছায়া-মাখা, ঠান্ডা, নিস্তব্ধ কুঠরিতে। তুষার ভালুকও কি তাদের সাথী হতে চলেছে?

বিংশ শতাব্দীর ড্রাগন

'বোগোর' কথাটি স্থানীয়, যার আক্ষরিক অর্থ 'ছন্নছাড়া'। জাভাদ্বীপে অবস্থিত পূর্বোক্ত 'বোগোর' শহরের উপকণ্ঠে একটি চা-বাগিচা সংলগ্ন অতিথিশালা একটু নজর করলে হয়তো অনেকেরই চোখে পড়বে। ১৯৪২ সালে জাপানি আক্রমণের সময় টেরি মাইকেল ওই বাড়িটা ছেড়ে চলে আসেন। গোটা জাভাদ্বীপ জুড়ে তখন চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। কিন্তু অতিথিশালাটিকে অত সহজে ভুলতে পারলেন না মাইকেল। পরবর্তী জীবনে যখনই ওই বাড়িটা তাঁর স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে, মাইকেল অনুভব করেছেন তাঁর শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে একটা হিমশীতল আতঙ্কের স্রোত!

না, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা নয়, অতিথিশালার পূবদিকে ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো রুক্ষ খসখসে একটা চামড়াই ওই আতঙ্কের কারণ।

সর্বাঙ্গে অজস্র ছোট ছোট গুটি বসানো চামড়টা লম্বায় প্রায় বারো

ফুটের উপর; মধ্যভাগে দেহের বিস্তৃতিও নেহাত কম নয়— দুই বাহু দুই দিকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করলে একটি মানুষ কোনোক্রমে নাগাল পেতে পারে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে দেহ-সংলগ্ন চারটি পা!

কুমির বা অন্যান্য সরীসৃপদের সঙ্গে পা-গুলোর বিশেষ মিল চোখে পড়ে না, বরং প্রাগৈতিহাসিকদের নখর-ভয়াল থাবার সঙ্গেই সেগুলোর সাদৃশ্য অনেক বেশি।

যে কোনো সাধারণ মানুষই এক নজরে বলে দেবে ওটা কুমির অথবা সাপের চামড়া নয়। কিন্তু ওই অত্যাশ্চর্য দেহচর্মের সত্যিকার মালিককে আবিষ্কার করতে গেলে অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই মস্তিষ্ক হবে ঘর্মাক্ত!

তাহলে ওই অদ্ভুত সংগ্রহটির পরিচয় কী?

টেরি মাইকেলের ভাষায়, 'বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে প্রস্তরদ্বীপের বুকে ওরা আজও ঘুরে বেড়ায়—সভ্যজগতের বিস্ময় অতিকায় হিংস্র ড্রাগনের দল!'

বিস্ময়কর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনি—

পূর্ব আফ্রিকায় শিকারের পর্ব চুকিয়ে ম্যানিলা যাওয়ার পথে শিকারি টেরি মাইকেল জাভা দ্বীপে দিন কয়েকের জন্য জনৈক চা-বাগিচা মালিকের অতিথি হয়েছিলেন। চা বাগানের মালিকের নাম ভ্যান এফেন—জাতে ওলন্দাজ। আড়ে বহরে বিশাল ওই ভদ্রলোকটির চেহারা ছিল দেখবার মতো। যেদিন ভ্যান এফেন-এর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন টেরি মাইকেল, সেদিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি এফেন-এর সঙ্গে কফি পান করতে করতে সেখানকার দ্বীপপুঞ্জগুলির বন্য জীবন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। স্থানীয় প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে দিয়ে এফেনই কথাটা বললেন।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে তাবৎ পৃথিবীর জীবতাত্ত্বিকরা জীবজগতের সমস্ত জাতি এবং প্রজাতিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। যদিও কিছু কিছু বিশেষ ধরনের পাখি অথবা অজানা কীটপতঙ্গ কিংবা ছোটখাটো সাপ-টাপ নতুনভাবে আজও আবিষ্কৃত হচ্ছে, কিন্তু শতাব্দীর প্রথম দশকে বৃহৎকায় প্রাণীদের কোনো বিশেষ

গোষ্ঠী আর অনাবিষ্কৃত ছিল না—বৈজ্ঞানিকদের দল সারা পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান প্রায় সব কয়টি বৃহৎ প্রাণীকেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন।

যদিও ওই সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের 'ফ্লোরস' দ্বীপমালার নিকটবর্তী স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে 'ড্রাগন' নামক একধরনের অদ্ভুত প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে 'গুজব' চালু ছিল, কিন্তু উক্ত অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের কাছে প্রসঙ্গটি অবসর বিনোদনের সময় হাসির খোরাক জোগানো ছাড়া আর কোনো গুরুত্বই পেত না। 'ফ্লোরস' দ্বীপমালাটির ভৌগোলিক অবস্থান ছিল জাভার পূর্বদিকে বালিদ্বীপ ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে 'টিমর' দ্বীপের কাছাকাছি। জাভার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বপ্রান্তে একটি দ্বীপমালা গঠিত হয়েছে 'বালিদ্বীপ', 'ফ্লোরস' প্রভৃতি ছাড়া বেশ কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টিতে—মানচিত্রে ওই ছোট ছোট ভূখণ্ডগুলোর প্রায় কোনো হদিসই মেলে না।

ওই অখ্যাত ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির একটির নাম 'কোমোডো'। স্থানীয় জনশ্রুতিতে এই দ্বীপটিকেই অতিকায় মাংসাশী ড্রাগনদের মূল বাসভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

গুজব, জনশ্রুতি, লোককথা ইত্যাদি অত্যন্ত সংক্রামক। আর সেই সংক্রমণের প্রভাবেই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পূর্বে উল্লিখিত দ্বীপগুলিতে সত্যি সত্যিই একটি অনুসন্ধান দল পাঠানো হয়।

দিন কয়েকের মধ্যেই কোমোডো এবং তার আশেপাশের ছোট ছোট ভূখণ্ডগুলিতে পরিক্রমা শেষ করে ফিরে এলেন অভিযাত্রী বৈজ্ঞানিকদের দল। সঙ্গে নিয়ে এলেন এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর তথ্য। সেই তথ্যের সারমর্ম হল যে, 'কোমোডো' এবং তার প্রতিবেশী ছোট ছোট দ্বীপগুলির বুকে দলে দলে বিচরণ করছে বিচিত্র একধরনের প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ এবং যার কোনো খবরই আধুনিক জীববিজ্ঞান রাখে না।

ফলে, ১৯১৪ সালে জীবতত্ত্বের তালিকায় বারো ফুট দীর্ঘ, দুশ পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের এক দানব গিরগিটির পরিচয় লিপিবদ্ধ হল। বিজ্ঞানীরা নামকরণ করলেন 'Giant Monitor' বা 'অতিকায় গো-সাপ'।

বর্তমান পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সরীসৃপগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রজাতি।

এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ প্রাক্-ইতিহাস যুগের এই দুর্লভ গোষ্ঠিটিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য সচেষ্ট হলেন। কারণ, পেশাদার অথবা সখের শিকারিদের হাতে প্রাণীগুলোর জীবনসংশয় ঘটার যথেষ্ট কারণ ছিল।

শেষ পর্যন্ত, বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুনরায় একটি অভিযাত্রী দলকে কয়েকটি 'জীবন্ত ড্রাগন'-এর নমুনা সংগ্রহের জন্য কোমোডো দ্বীপে প্রেরণ করা হয় এবং বহুকষ্টে কয়েকটি অতিকায় সরীসৃপকে ধরা সম্ভব হয়। জন্তুগুলো এখন আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের বিস্ময় উৎপন্ন করছে।

ভ্যান এফেন চুপ করলেন। ঘরের জানালাপথে দূরে দৃশ্যমান রত্নমালার মতো আলো ঝলমলে 'বোগোর' শহর। এফেন-এর দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ। কফির পেয়ালা হাতে ভ্যান এফেনের বিরাট দেহটা এক রহস্যময় ছায়ামূর্তির মতো মনে হল টেরি মাইকেলের। মাইকেলের মুখেও কথা নেই, কিন্তু তার নির্বাক অস্তিত্বের অন্তঃস্থলে শিকারি সত্তা ততক্ষণে সজাগ হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চকর এক অভিযানের গন্ধ পেয়ে।

পৃথিবীর বুকে প্রস্তরদ্বীপের অন্তরালে আজও বিচরণ করে বেড়াচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক ভয়ংকর সরীসৃপের দল—'ড্রাগন'। যে করেই হোক অন্তত একবারের জন্য হলেও মাইকেলকে পৌঁছতে হবে তাদের আস্তানায়, তবেই সফল হবে তাঁর শিকারি জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন...।

ভাগ্য ভালো টেরি মাইকেলের। অভিযানের অনুমতি পাওয়ার জন্য তার বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল না। অবশ্য তার কারণও ছিল। মহাযুদ্ধের রণদামামা তখন বাজতে শুরু করেছে গোটা মহাদেশের বুক জুড়ে, ফলে ওই গিরগিটিগুলোর কথা চিন্তা করার মতো সময়, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে খুব বেশি ছিল না।

শুধু ক্যামেরা নয়, রাইফেল সঙ্গে নেবারও অনুমতি পেলেন মাইকেল। অবশ্য শর্ত ছিল যে, কেবলমাত্র আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করবেন।

অনুমতি পাওয়ার পর আর অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য বা ইচ্ছা কোনোটাই টেরি মাইকেলের ছিল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা

স্টিমারে চড়ে দিনকয়েকের মধ্যে তিনি এসে পৌঁছলেন 'মাও মেয়ার' উপসাগরের তীরে 'পুলো বেসার' দ্বীপখণ্ডে। এই দ্বীপটির অবস্থিতি ছিল ফ্লোরস-এর উত্তর উপকূলবর্তী অঞ্চলে। স্থানীয় অঞ্চলটির অধিবাসী বলতে মালয়ী ও পাপুরা-রাই প্রধান। কাছেই একটা গ্রাম থেকে অভিযানের সঙ্গী হিসাবে দুটি লোককে বেছে নিলেন টেরি মাইকেল।

অ্যামেসি এবং বাজোডা। বৃষস্কন্ধ, খর্বাকৃতি অ্যামেসি স্থানীয় ওলন্দাজ ভাষা বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিল। সুতরাং যা কিছু কথাবার্তা, তা হত মাইকেল এবং অ্যামেসির মধ্যেই। অপেক্ষাকৃত দুর্বল চেহারার অধিকারী বাজোডা নামক যে স্থানীয় অধিবাসীটি মালবাহকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল সে ওই ওলন্দাজ ভাষা একেবারেই বলতে পারত না।

অভিযান সম্পর্কে খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাইকেল বুঝলেন যে কোমোডোর ড্রাগন অ্যামেসি বা বাজোডা কারো কাছেই অশ্রুতপূর্ব নয়—জনশ্রুতি সম্পর্কে তারা বেশ ভাল ওয়াকিবহাল।

অ্যামেসি তবু সাহেবের হাতের ওই 'অস্ত্রটার' ভরসায় সঙ্গে থাকতে রাজি হল, কিন্তু বাজোডা সঙ্গে গেলেও দ্বীপে নামতে নারাজ। অগত্যা বাজোডাকে নৌকার রেখে তারা দুজন দ্বীপে নামবেন বলে ঠিক হল।

দুটি ভূখণ্ডের অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ খাড়ি অতিক্রম করে নৌকাটা অপর একটি দ্বীপের পাড়ে এসে ঠেকল।

কোমোডো দ্বীপ!

জলের পাড় থেকে ঘন ঘাসের জঙ্গল বিস্তৃত হয়েছে দ্বীপের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি পাহাড় বা টিলার সানুদেশ পর্যন্ত। টিলার নীচে ছোট ছোট গাছ এবং ঝোপ ঝাড় দূর থেকেই অভিযাত্রীদের চোখে পড়ল। ভূ-প্রকৃতির চরিত্র অনুধাবন করে অভিযাত্রীরা বুঝলেন যে অত্যন্ত সতর্ক হয়েই তাদের দ্বীপে অবতরণ করতে হবে। যে কোন মুহূর্তে ঘন ঘাসের জঙ্গল ভেদ করে বিপদ তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং নৌকার পাহারায় বাজোডাকে রেখে রাইফেল এবং ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে দুই শিকারি কোমোডো দ্বীপের বুকে পা রাখলেন।

চারপাশের ঘাসজঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি চলে না, উপরন্তু, কোমোডোর ড্রাগনের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—প্রতি মুহূর্তের সজাগ

সতর্কতা নিয়ে মাইকেল অগ্রবর্তী হলেন। সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করে মাইকেল লক্ষ্য করলেন, অ্যামেসির সমস্ত পেশি সংবদ্ধ হয়েছে উন্মুখ প্রতীক্ষায়, শিকারি শার্দুলের মতো লঘু পায়ে সে তার সাহেবকে অনুসরণ করছে। তার হাতে ধরা শাণিত বর্শা, কোমরে লতার বন্ধনীতে সংলগ্ন বিশাল ছুরিকা। অভিযানের উপযুক্ত সঙ্গী সন্দেহ নেই। মাইকেল বেশ খানিকটা ভরসা পেলেন।

সতর্ক পায়ে প্রায় গোটা ঘাস-জমিটা অতিক্রম করে এসেছেন দুই শিকারি, এমন সময় ঘটল প্রথম অঘটন!

শিকারিদের সম্মুখবর্তী পাহাড়ি সমতলভূমির উপর আচম্বিতে জেগে উঠল কয়েকটি হিংস্র কণ্ঠের গর্জনধ্বনি এবং একাধিক বস্তুর ঝোপঝাড় আলোড়িত করে ছুটে যাওয়ার শব্দ। উভয় শিকারিই বুঝলেন যে তাঁদের দুপাশের ঘাস জঙ্গল ভেদ করে ছুটে চলেছে একদল জান্তব অস্তিত্ব, যদিও তাদের স্বরূপ শিকারিদের কাছে অজ্ঞাত।

হঠাৎ মাত্র দশ ফুট দূরের একটা ঝোপ সন্দেহজনক ভাবে নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল মাইকেলের শিকারি স্নায়ু, হাতের আঙুল রাইফেলের ট্রিগার স্পর্শ করল।

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত...।

ঝোপের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল শাণিত কিরীচের মতো দুটি দাঁত এবং রক্তবর্ণ দুটি চোখ।

'বুনো শুয়োর!'

হাতের বর্শা আনত করে অ্যামেসি প্রস্তুত হল, খর্বাকৃতি দেহটা টানটান হয়ে ঝুঁকে এল সামনের দিকে।

হিংস্র গর্জন করে ছুটে এল বন্য বরাহ। শাণিত কিরীচে খেলে গেল চকিত বিদ্যুৎশিখা। সঙ্গে সঙ্গে মাইকেলের হস্তধৃত রাইফেলের মুখে জাগল গর্জিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং ধরাপৃষ্ঠে লম্বমান হল কোমোডোর বুনো শুয়োর। বরাহ ধরাশয্যা গ্রহণ করা মাত্র কোমরের খাপ থেকে ছোরা টেনে নিয়ে অ্যামেসি ছুটে গেল এবং মৃতদেহের পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। সামান্য সময়ের মধ্যে বরাহের মৃতদেহ থেকে ছাল ছাড়ানো বড় এক খণ্ড মাংস কেটে নিয়ে হাতে তুলে ধরল অ্যামেসি—'আজ রাতের খাবার।' তারপর পরিত্যক্ত দেহটার দিকে পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে

বলে উঠল—'সাহেব! কোমোডোর ড্রাগনও বোধ হয় বুনো শুয়োরের মাংস পছন্দ করে।'

মন্দ প্রস্তাব নয়।

মাইকেলের মনে ধরল কথাটা।

শুয়োরের মাংসের টোপে মাংসাশী সরীসৃপদের প্রলুব্ধ করা কঠিন হবে না। ফলে দুজন মিলে গুরুভার মৃতদেহটাকে টেনে তুলে আনলেন টিলার উপরে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায়। গাছ এবং প্রস্তরখণ্ডের সন্নিবেশ টিলার উপরে এক জায়গায় তৈরি হয়েছে প্রাকৃতিক অন্তরাল, বুনো শুয়োরের দেহাংশ সেই আড়ালের সম্মুখবর্তী জমির উপর রেখে দিলেন শিকারিরা। উদ্দেশ্য, বরাহমাংসের টোপে প্রলুব্ধ হয়ে কোমোডোর অতিকায় সরীসৃপরা যদি এসে হাজির হয়, তাহলে ওই গাছ এবং পাথরের আড়াল থেকে মাইকেল তাঁর ক্যামেরার 'চোখ' দিয়ে ওই অদ্ভুত প্রাণীদের কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য মুহূর্ত ধরে রাখবার চেষ্টা করবেন।

টোপ সাজিয়ে রেখে শিকারিরা অরণ্য-অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করতে

বেরোলেন। একটু এগিয়েই গাছের সারির নীচে বালুকাময় জমির উপর মাইকেলের নজরে পড়ল সুদীর্ঘ নখরযুক্ত প্রকাণ্ড থাবার ছাপ এবং কোনো গুরুভার দেহকে বহন করে নিয়ে যাবার টানা দাগ। শিকারে অভিজ্ঞ মাইকেল বুঝলেন ভীতিপ্রদ ওই অজানা পায়ের ছাপের মালিক আর কেউ নয়, কোমোডোর অতিকার ড্রাগন!

পায়ের ছাপ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না শিকারিরা, এগিয়ে গেলেন সম্মুখবর্তী অরণ্যের মধ্যে। পথের মধ্যে এক জায়গায় ভেঙে পড়েছে কয়েকটি গাছ, ফলে ওই পথটুকু একরকম হামাগুড়ি দিয়েই পার হলেন তাঁরা। কিন্তু তাদের সামনে অদূরে ফাঁকা জমির উপর অপেক্ষা করছিল এক নতুন বিস্ময়!

এক বিরাট মহীরুহকে আশ্রয় করে, শূন্যে ঝুলছে একটি শক্ত মোটা লতা, আর সেই লতা-সংলগ্ন যে প্রকাণ্ড সজীব দেহটা ধীরে ধীরে পাক খুলে মাটির উপর নেমে আসছে সেটা লক্ষ্য করে বিস্ফারিত-দৃষ্টি মাইকেল এবং অ্যামেসির মুখ দিয়ে কোনো শব্দ নির্গত হল না। যদিও বস্তুটির স্বরূপ চিনতে দুজনের কারুরই ভুল হয়নি। জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী সরীসৃপ বংশের অন্যতম কুলীন—'বোয়া কনস্ট্রিকটার' বা অতিকায় অজগর!

বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে দেরি হল না মাইকেলের, পর পর কয়েকবার তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল নির্ভুল লক্ষ্যে। গাছের উপর থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল দানব-সরীসৃপের প্রাণহীন বিশাল দেহ। সাপ মরল বটে, কিন্তু রাইফেলে পুনরায় গুলি ভরতে গিয়ে মাইকেল আবিষ্কার করলেন যে তাঁর সংগ্রহে আর একটিও গুলি নেই। সম্ভবত হামাগুড়ি দিয়ে আসার সময়ই সামনের বুকপকেট থেকে গুলিগুলো নিঃশব্দে ঘাসে আবৃত মাটিতে পড়ে গিয়েছে। এখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে গুলি খুঁজতে যাওয়া অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার, বরং নৌকায় ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে আনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে বিবেচিত হল শিকারিদের কাছে।

কিন্তু নৌকায় ফিরবার পথে পূর্বে উল্লিখিত 'রাতের খাবার'-টি সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। উভয়েই ফিরলেন টিলার উপরিভাগে গাছ আর পাথরে ঢাকা আড়ালটির দিকে।

মাইকেলের হাতের রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছিল। যেখানে বুনো শুয়োরের দেহাবশিষ্ট রেখে শিকারিরা চলে গিয়েছিলেন, নির্দিষ্ট সেই স্থানটি থেকে প্রায় একশো গজ দূরে এসে অ্যামেসি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তার কোমরের লতাবন্ধনী থেকে ভারী ছোরাটা খুলে নিয়ে এগিয়ে দিল মাইকেলের দিকে। মাইকেল অস্ত্রটা সংগ্রহ করলেন, কিন্তু সঙ্গীর মুখে আতঙ্কের ছাপও তাঁর দৃষ্টি এড়াল না। মাইকেল বুঝতে পারলেন যে, আগ্নেয়াস্ত্র অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলে অ্যামেসি ভয় পেয়েছে! তার সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য মুখে দু-চারটে কথা বললেও অভিজ্ঞ শিকারির পক্ষে সঙ্গীর প্রকৃত মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হল না। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে দ্রুত গতিতে তিনি এগিয়ে চললেন।

গাছ আর পাথরে ঘেরা জায়গাটির খুব কাছাকাছি এসে পড়েছেন দুই শিকারি—আর মাত্র গজ পঁচিশেকের ব্যবধান। হঠাৎ, এক ঝটকায় অ্যামেসিকে টেনে নিয়ে মাইকেল আত্মগোপন করলেন সামনের একটা ছোট ঝোপের আড়ালে। তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত দৃষ্টিপথে ভেসে উঠেছে এক ভয়াবহ দৃশ্য!

মরা শুয়োরের দেহটার খোঁজে এসে উপস্থিত হয়েছে দুটো অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী। লম্বায় তাদের প্রত্যেকটিই প্রায় বারো ফুটের উপর। দানব গিরগিটির মতো শরীরটা আগাগোড়া রুক্ষ, অজস্র গুটিওয়ালা খসখসে চামড়ায় ঢাকা। লম্বা কুৎসিত গ্রীবার উপর বসানো কদাকার মস্তক এবং চিতাবাঘের মতো নখরভয়াল চারটে পায়ের থাবা। সব মিলিয়ে মাইকেলের মনে হল তাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে দুটো দুঃস্বপ্নের জীব!

পিছনের দুটো পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল একটা সরীসৃপ। তারপর এগিয়ে গেল অদূরবর্তী মৃতদেহটার দিকে। দন্তভয়াল মুখগহ্বরের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সাপের জিভের মতো অস্বাভাবিক লম্বা একটা বিভক্ত জিভ। পরমুহূর্তে ড্রাগনের দুটো শক্তিশালী চোয়ালের ফাঁকে বজ্রদংশনে আবদ্ধ হল শুয়োরের স্থূল দেহ। কুকুর যে ভাবে একটা ছোট খেলনা মুখে তুলে ঝাঁকানি দেয়, ঠিক সেই ভাবে ড্রাগনটা অবলীলায় দেহটাকে কামড়ে ধরে এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ফেলল।

দু-চারটে ঝাঁকানি দিতে শুয়োরের শক্ত চামড়া ভেদ করে মাংসের মধ্যে প্রবেশ করল সরীসৃপের ধারালো দাঁতের সারি। বড় এক খণ্ড মাংস গলাধঃকরণ করে শবটাকে আবার মাটিতে নামিয়ে রাখল সেই অতিকায় সরীসৃপ।

ভয়াবহ দৃশ্য!

কোমোডোর ড্রাগন সম্পর্কে অ্যামেসির যাবতীয় অভিজ্ঞতা, এত দিন পর্যন্ত জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু উপকথার জীব যে কোনোদিন বাস্তবে তার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হতে পারে, এ কথা সে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। ফলে এই প্রত্যক্ষদর্শনের প্রভাবে তার স্নায়ুযন্ত্র দুর্বল এবং অসাড় হয়ে পড়ল। ছোট ছোট ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে মাইকেলের পিছনে পিছনে সে দিশাহারা শিশুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল পাথরের আড়ালটার দিকে।

তবু শেষরক্ষা হল না!

আগেই বলেছি যে রাতের খাবারের জন্য শুয়োরের দেহ থেকে কেটে নেওয়া মাংসের খণ্ডটি আলাদাভাবে কয়েকটা পাথরের চাঁই-এর আড়ালে রেখে গিয়েছিলেন শিকারিরা, এবং ওই উপাদেয় খাদ্যবস্তুটি সংগ্রহ করতেই তাঁরা ফিরে এসেছিলেন।

মাইকেল ঝোপের আড়ালে আড়ালে এসে পড়েছেন পাথরের প্রাচীরটার কাছে। আর মাত্র কয়েক গজ অতিক্রম করলেই তাঁরা নিরাপদ। এমনকী ওই পাথরগুলোর আড়াল থেকে সুযোগমতো ড্রাগন দুটোর ছবিও তোলা যেতে পারে। কিন্তু আতঙ্কে বিহ্বল অ্যামেসির পক্ষে আর ধৈর্য ধরা সম্ভব হল না। জন্তু দুটোর সান্নিধ্য থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য হঠাৎ সে জমি ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর পাগলের মতো এক প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সম্মুখবর্তী পাথরটার অপর দিকে।

বেশ খানিকটা চমকে গিয়েছিলেন মাইকেল।

কিন্তু পরমুহূর্তে তার বিহ্বলতাকে ছাপিয়ে প্রস্তরপ্রাচীরের অপর দিক থেকে ভেসে এল অ্যামেসির ভয়ার্ত আর্তনাদ এবং তার সঙ্গে রক্তজমানো এক বিজাতীয় হিস্ হিস্ শব্দ। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে মাইকেলের দেরি হল না, হামাগুড়ি দেওয়ায় ইস্তফা দিয়ে তিনি এক

লাফে পাথরটার উপর উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে, পৃথিবীর দৃশ্যপট যেন পিছিয়ে গেল দু-কোটি বছর আগে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগে...।

শুয়োরটার দেহ থেকে সংগৃহীত মাংসখণ্ডটার গন্ধে গন্ধে প্রস্তরবেষ্টিত স্থানটির মধ্যে এসে হাজির হয়েছে তৃতীয় একটা ড্রাগন। আর ভয়ার্ত অ্যামেসি লাফ দিয়ে ওই ভোজনরত সরীসৃপের একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

মাইকেলের মনে হল আদিম পৃথিবীর এক আক্রান্ত গুহামানব প্রাণপণে লড়াই করছে প্রাগৈতিহাসিক এক দানবের সঙ্গে...।

হাতের রাইফেল অকেজো হয়ে পড়েছে। তবু সেটাকেই মুগুরের মতো বাগিয়ে ধরে ড্রাগনের কুৎসিত মস্তকের উপর প্রাণপণে আঘাত হানলেন টেরি মাইকেল। আঘাতের তীব্রতায় সরীসৃপটা মুখব্যাদান করল, দুই চোয়ালের মাঝখানে উঁকি দিল সারিবদ্ধ দাঁতের কিরীচ। পিছনের পায়ের একটা প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে অ্যামেসির ভূতলশায়ী দেহটাকে চেপে ধরে জন্তুটা তার নতুন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করল।

সতর্ক থাকলেও নিষ্কৃতি পেলেন না মাইকেল। বাঘের থাবার মতো ভয়ংকর একটা থাবা তাঁর বাঁ-কাঁধের উপর এঁকে দিয়ে গেল সুদীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন এবং পরমুহূর্তে তাঁর সমস্ত সতর্কতার বেড়া ডিঙিয়ে চাবুকের মতো একটা প্রকাণ্ড লেজ অতর্কিত আঘাতে তাঁকে ছিটকে ফেলে দিল অদূরবর্তী একটা পাথরের উপর।

অর্ধলুপ্ত চেতনার মধ্যেও টেরি মাইকেল উপলব্ধি করলেন যে, পাথরে ঘেরা ছোট্ট জায়গাটুকুর মধ্যে কোনঠাসা অবস্থায় ড্রাগনের সম্মুখীন হওয়া শুধু নির্বুদ্ধিতাই নয়, এক সাংঘাতিক ঝুঁকিও বটে।

বন্দুক হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। অস্ত্র বলতে এখন অ্যামেসির দেওয়া ছোরাটাই একমাত্র ভরসা। কটিবন্ধ থেকে ভারী ছোরাটি খুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন মাইকেল। কিন্তু অন্যদিক থেকে আক্রমণ এল না, টলতে টলতে পাথরের উপর উঠে পড়েছে দানব সরীসৃপ। মাইকেল বুঝলেন যে, বন্দুকের কুঁদোর আঘাত বেশ জোরালোই হয়েছিল। স্থানত্যাগ করতে উদ্যত ড্রাগনকে বিরক্ত করার কোনো সদিচ্ছা মাইকেলের ছিল না, কিন্তু অ্যামেসির দিকে চোখ পড়তে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন।

অর্ধলুপ্ত চৈতন্যের ঘোর কাটিয়ে অ্যামেসি তখন উঠে বসেছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে একবার দৃষ্টি সঞ্চালিত করল অদূরে প্রস্থানোদ্যত সরীসৃপটা দিকে। তারপর হঠাৎ উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে হাতের বর্শাটাকে আমূল বিদ্ধ করে দিল কদাকার জন্তুটার পাঁজরের নীচে।

ড্রাগনের কণ্ঠ থেকে নির্গত হল তীব্র হিস্ হিস্ শব্দ, বিস্তৃত মুখগহ্বরের মধ্যে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একগাছা দড়ির মতো দীর্ঘ একটা চেরা জিভ, এবং প্রকাণ্ড একটা লেজের আঘাতে অ্যামেসি ছিটকে পড়ল মাটির উপরে। তার চৈতন্যকে লুপ্ত করে নেমে এল মূর্ছার ঘন অন্ধকার।

ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো শূন্যে বাতাস কেটে আহত সরীসৃপের বিশাল দেহটা ঘুরপাক খেয়ে ছিটকে এসে পড়ল মাইকেলের সামনে।

ততক্ষণে ভয় উবে গেছে মাইকেলের মন থেকে।

হাতের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে তিনি ক্রমাগত কোপ মারতে লাগলেন জন্তুটার ঘাড়ে, পেটে এবং শরীরের অন্যান্য দুর্বল স্থানে।

তীব্র আতঙ্কে তখন তার বাহ্যিক অনুভূতি প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল। টেরি মাইকেলের কাছে তখন একটি কথাই সত্য—'হয় মারো, নয় মরো।' চরম আঘাত হানবার জন্য ছোরাটাকে শক্ত মুঠোয় তুলে ধরলেন মাইকেল। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নামিয়ে আনলেন ড্রাগনের মাথা লক্ষ্য করে।

শূন্যে বিদ্যুৎ চমকে নির্ভুল লক্ষ্যে নেমে এল শিকারির হাতের অস্ত্র। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা জীবন্ত চাবুক সশব্দে আছড়ে পড়ল মাইকেলের দেহের উপর।

প্রচণ্ড আঘাতের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে প্রস্তরশয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন মাইকেল। তারপর অ্যামেসির অর্ধ অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে সরিয়ে আনলেন নিরাপদ স্থানে। অদূরে মরণাহত সরীসৃপের গোটা দেহ পাক খেয়ে খেয়ে আস্ফালিত হয়ে উঠছে, তার একটি আঘাতে অ্যামেসির মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

নৌকা থেকে ক্ষতগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে গুলিভরা রাইফেল হাতে টেরি মাইকেল আবার দ্বীপে পদার্পণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য কোমোডো ড্রাগনের অপূর্ব গাত্রচর্মটি সংগ্রহ করা। তখনকার মতো সংগৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাইকেলের ভাগ্যে চামড়াটা জোটেনি। কারণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভ্যান এফেন মারা যাওয়ার পর সেটা আর মাইকেলের সঙ্গে নিয়ে আসা হয়ে ওঠেনি।

তা নাই বা হল, কিন্তু অভিজ্ঞতার যে স্মৃতিটুকু তাঁর মনে গেঁথে রয়েছে তার প্রভাবেই মাঝে মাঝে মাইকেলের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায় একটা হিমশীতল স্রোত। ঠান্ডা আতঙ্কের শিহরণ!
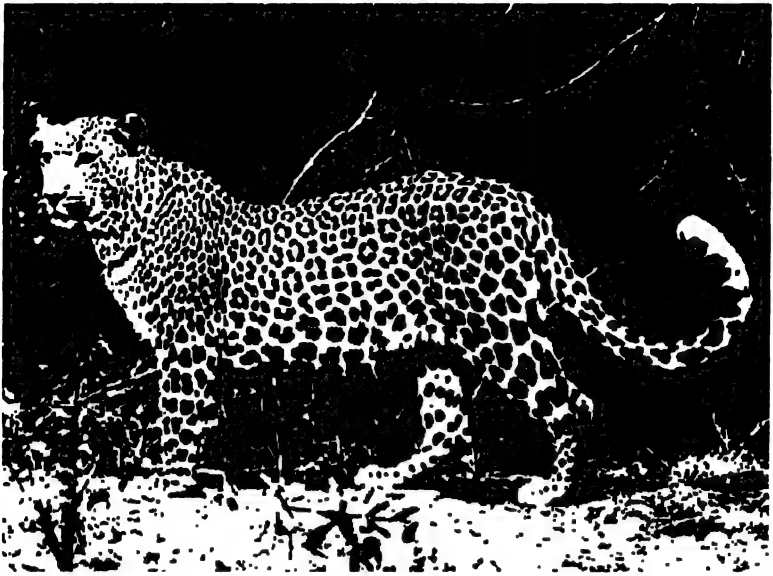
অমানুষিক মানুষ

গ্রিক পুরাণের নায়ক হারকিউলিস।
দেবরানি জুনোর চক্রান্তে মানবশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসকে বরণ করতে হয়েছিল 'আর্গোর' সম্রাটের দাসত্ব। কিন্তু ভৃত্যের মতো নতশিরে রাজাদেশ পালন করার ব্রত নিয়ে পৃথিবীর বুকে বজ্রপেশি হারকিউলিসদের জন্ম হয় না; 'আর্গোর' সম্রাটও বুঝতে পারলেন সে কথা।

কিন্তু এত সহজে হারকিউলিসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে রাজি হলেন না তিনি—আরোপ করলেন এক কঠিন শর্ত।

শর্তানুসারে, হয় সম্রাটের প্রদেয় বারোটি দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদন করে হারকিউলিস আপন দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করবেন; নচেৎ, চিরদিনের মতো তাকে হয়ে থাকতে হবে সম্রাটের আজ্ঞাবহ।

হারকিউলিস নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন সেই শর্ত—তারপর!

গ্রিস দেশের উপকথায় বর্ণিত আছে, তারপর কেমন করে হারকিউলিস

তাঁর অসীম শক্তি এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে একে একে সম্পাদিত করেছিলেন আর্গোর রাজার দেওয়া বারোটি দুরূহ কাজ। কেমন করে আপন ক্ষমতাবলে মোচন করেছিলেন আপনার দাসত্ব।

কিন্তু এ তো গেল পুরাণের কথা—তবে, হারকিউলিসদের দেখা শুধু পুরাণের পাতাতেই মেলে না।

যুগে যুগে পুরাণ বা উপকথার জগৎ থেকে হারকিউলিসের দল নেমে আসে বাস্তবের পৃথিবীতে—অসীম শক্তি এবং বুদ্ধিবলে এই বৃষস্কন্ধ মানুষগুলো জীবন সংগ্রামের বন্ধুর, কঠিন পথে রচিত করে যান আশ্চর্য সব অবিশ্বাস্য কাহিনি সভ্য সমাজের হাজারো নিয়মের মাঝখানে, যার ফলে এদের মনে হয় খাপছাড়া, বেমানান, দুর্বিনীত!

এমনই দুটি ব্যতিক্রম চার্লস কটার ও বিলি প্যারোট। আমাদের প্রথম কাহিনিটির নায়ক চার্লস কটার নামক একটি অদ্ভুত মানুষ, মানুষ না বলে বরং যাকে 'অমানুষিক মানুষ' আখ্যা দেওয়া যেতে পাবে; অন্তত কাহিনির মধ্য দিয়ে বারবার আমাদের একথাই মনে হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চার্লস কটার

বিখ্যাত শিকারি নজ হান্টারের জীবনকাহিনির পাতা থেকে আমাদের বর্তমান ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা হল—এছাড়া ছোট্ট একটি ঘটনা চার্লস কটারের পুত্র শিকারি বাড কটারের বিবরণী থেকে সংগৃহীত।

'শ্বেত শিকারির' পেশা অবলম্বন করে আফ্রিকায় জীবিকানির্বাহ করলেও চার্লস কটারের জন্মভূমি ছিল আমেরিকার ওকলাহামা প্রদেশে। এমনকী আফ্রিকায় আসার আগে বেশ কিছুদিন সে ওকলাহামা প্রদেশের শেরিফের পদেও নিযুক্ত হয়েছিল।

যে সময়কার কথা বলছি, সে সময়ে ওই অঞ্চলে যারা বাস করত তাদের মোটেই 'অত্যন্ত ভদ্র এবং সজ্জন ব্যক্তি' বলে অভিহিত করা যায় না, বিশেষ করে যখন তাদের অধিকাংশের জীবনদর্শন, মুখনিঃসৃত বাক্যের বদলে কোমরে ঝোলানো রিভলভার অথবা মুষ্টিবদ্ধ হস্তের

মুষ্টিযোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ওই চমৎকার অঞ্চলটিতে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ঠিক যে ধাঁচের মানুষ প্রয়োজন, চার্লস কটার ছিল অবিকল সেই ধাঁচের। তার জীবনদর্শনেও বিশেষ কোনো জটিলতা ছিল না, এবং স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মতে সেও ছিল সমানভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু আশ্চর্য! তা সত্ত্বেও ওকলাহামার গুন্ডারা কটারকে বিশেষ পছন্দ করত না। বরং অচিরেই তারা বুঝে নিয়েছিল যে চিতাবাঘের মতো চটপটে, ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা মানুষটা যতদিন শেরিফ রয়েছে, ততদিন একটু চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ফলে, 'শ্বেতশিকারির' পেশাকে আশ্রয় করে এবং শেরিফের পদে ইস্তফা দিয়ে চার্লস কটার যখন আমেরিকা থেকে আফ্রিকার বুকে পাড়ি জমাল তখন স্বাভাবিক কারণেই ওকলাহামার গুন্ডারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

শ্বেতশিকারির পেশায় পয়সা থাকলেও জীবনের ঝুঁকি বড় বেশি।

শিকারের নেশায় কিম্বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকনের আশায় প্রতি বছরই বহু বিদেশি বা ধনী ব্যক্তিদের আগমন ঘটে আফ্রিকার অরণ্য প্রদেশে। অরণ্যের অভ্যন্তরে অজস্র জানা-অজানা বিপদের করল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁরা নিয়োগ করেন পেশাদার দক্ষ শিকারিদের। নিয়োগকর্তার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পিত থাকে ওই পেশাদার শ্বেতশিকারিদের উপর।

কটারের কাছে এই বিপজ্জনক পেশা ছিল তার মনের মতো চাকরি।

শিকারিজীবনে একটি জানোয়ারের প্রতি কটারের তীব্র ঘৃণা ছিল এবং সেটি হল আফ্রিকা মহারণ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার—লেপার্ড বা চিতাবাঘ।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে জন্তুটার একটু পরিচয় দেওয়া যাক। হলদের ওপর কালো বুটিদার গাত্রচর্মের অধিকারী এই জন্তুটির গড় ওজন প্রায় দুশো পাউন্ডের মতো হয়ে থাকে। বিড়ালগোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে বিপুলবপুর অধিকারী না হলেও ক্ষিপ্রতা এবং আক্রমণের কৌশলগত দিক দিয়ে বিচার করলে লেপার্ড অদ্বিতীয়।

বিড়ালগোষ্ঠীতে বুটিদার জানোয়ারের সংখ্যা একাধিক। শুধুমাত্র লেপার্ড-ই নয়, জাগুয়ার, প্যান্থার এবং 'চিতা'-র গায়েও রয়েছে হলদে-

কালোর নামাবলী।

প্যান্থার এবং লেপার্ডের মধ্যেকার পার্থক্য জীবতত্ত্বের নিখুঁত গবেষণার বিষয়, যা অজ্ঞাত থাকলেও আমাদের আপাতত খুব বেশি ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটবে না। জাগুয়ার দক্ষিণ আমেরিকার বাসিন্দা, আকৃতিগত দিক দিয়েও লেপার্ডের সঙ্গে জাগুয়ারের বৈসাদৃশ্য অনেক। সাঁতারে সুদক্ষ জাগুয়ারের মুখটা গোল হাঁড়ির মতো, লেপার্ডের তুলনায় সে খানিকটা উঁচুও বটে। কিন্তু ভারতবর্ষে 'লেপার্ড' প্রধানত চিতাবাঘ নামেই পরিচিত। আর যাঁরা প্রকৃতিপড়ুয়া বা জীবতাত্ত্বিক নন, তাঁদের অনেকেই এই নামটিকে কেন্দ্র করেই 'চিতা' এবং চিতাবাঘের বা লেপার্ডের মধ্যে প্রায়শই গুলিয়ে ফেলেন।

ভারতবর্ষেও লেপার্ড বাস করে এবং তাদের আকৃতি বৃহৎ, কিন্তু 'চিতা' বা 'Cheeta' নামক যে জীবটি আফ্রিকার অরণ্যে ঘুরে বেড়ায় তার সঙ্গে লেপার্ডের কোনো তুলনাই হয় না।

দ্রুতগামী, লাজুক এবং খানিকটা ভীরু প্রকৃতির 'চিতা' বিড়াল ও কুকুর উভয় গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ। ফলে, গাত্রচর্ম বা মুখাবয়ব অতিকায় মার্জারদের মতো হলেও পেশির বিন্যাস বা পায়ের থাবা তার সারমের সদৃশ। অন্য দিকে সুঠাম গঠনের লেপার্ডের পেশিতে ও থাবায় খুঁজে পাওয়া যায় হিংস্র শ্বাপদ-ক্ষিপ্রতা। দেহচর্মের বিচারেও লেপার্ড ও চিতার পার্থক্য লক্ষণীয়—লেপার্ডের দেহকে আবৃত করে হলুদ জমির উপর রয়েছে কালো চাকা চাকা দাগের আলপনা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'রোসেট' বা 'রোজেট', পক্ষান্তরে চিতার দেহের শ্রীবৃদ্ধি করেছে অজস্র কালো কালো ফোঁটা, যার ইংরেজি পরিভাষা 'স্পট্স্'। চিতার দু-চোখের কোণ দিয়ে মুখের উপরিভাগ পর্যন্ত নেমে এসেছে দুটি কালো দাগ, যা কিনা লেপার্ডের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

সুতরাং, নামের জন্য ভুল হলেও, আকৃতি বা প্রকৃতির দিক দিয়ে 'লেপার্ড এবং চিতা' দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জানোয়ার। কিন্তু তা বলে এই লেপার্ডের উপর কটারের তীব্র বিদ্বেষ এবং ঘৃণার কারণ কী?

কটারের অস্বাভাবিক লম্বা এবং বলিষ্ঠ দুটি নগ্ন বাহুকাণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করলেই কারণ বুঝতে দেরি হয় না। হিংস্র লেপার্ডের নখ ও দাঁতের হৃদ্যতাপূর্ণ আলিঙ্গনের ফলেই যে সুদীর্ঘ এবং গভীর

ক্ষতচিহ্নগুলির সৃষ্টি হয়েছে, অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রই সে কথা উপলব্ধি করেন।

কিন্তু এ তো হল লড়াইয়ের পরিণাম।

লড়াইয়ের বিবরণীর সন্ধান পেতে হলে আমাদের আশ্রয় করতে হবে জনৈক শ্বেতশিকারির আত্মকথা, যাঁর নাম আমরা কাহিনির প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি—

কুকুরের মাংস লেপার্ডের খুব পছন্দ। শিকারিরাও তাই মরা কুকুরের টোপ দিয়ে লেপার্ড শিকার করে থাকেন। কটারেরও অজানা ছিল না কথাটা।

তাই একদিন বনের মধ্যে একটা গাছের উপর মরা কুকুরের দেহটাকে ঝুলিয়ে রেখে কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে রাইফেল হাতে নিয়ে আত্মগোপন করে শিকারের অপেক্ষা করছিলেন কটার। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মরা কুকুরের গন্ধ ছড়িয়েছে বনের মধ্যে, আর সেই গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে একটু পরেই অকুস্থলে এসে হাজির হল একটা লেপার্ড।

কটারের খুশি হওয়ার কথা, কিন্তু জন্তুটাকে দেখামাত্রই তার মেজাজ গেল বিগড়ে। জন্তুটার গায়ের চামড়াটা মোটেই লোভনীয় নয়, কেমন ফ্যাকাসে। তার মানে বাঘটা লোকালয়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, গভীর অরণ্যের বাসিন্দাদের মতো উজ্জ্বল দেহচর্মের মালিকানা থেকে এ বঞ্চিত।

লেপার্ড কিন্তু এত সব মোটেই ভাবছে না। তার ভাবার কথাও নয়, কারণ তার নাগালের মধ্যে বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন হয়ে ঝুলছে একটি মরা কুকুরের দেহ, আর সেই লোভনীয় মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে তখন তার রসনা ক্রমেই লালায়িত হয়ে উঠছে।

কিন্তু চিতাবাঘ বড় চালাক জানোয়ার। ভালো করে চারদিক দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তবেই সে কুকুরটার দিকে চোখ দিল। ধীরে ধীরে গুঁড়ি মেরে জমির উপর বসে পড়ে সে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

ওদিকে চার্লস কটারের মেজাজ তখন ক্রমেই সপ্তমে চড়ছে। সে প্রথমে ভেবেছিল যে, হতভাগা বিড়ালটা বোধহয় একটু দেখে-টেখে

তারপর চলে যাবে, কিন্তু লেপার্ডটা যখন কুকুরের মৃতদেহটাকে গাছের উপর থেকে নামিয়ে আনতে উদ্যোগী হল তখন আর কটারের সহ্য হল না।

হাতের রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রেখে সে ছুটে গিয়ে পিছন থেকে লেপার্ডটার দুটো পা চেপে ধরল, আর তার পরই এক প্রচণ্ড আছাড়।

কটার ইচ্ছা করলে জন্তুটাকে অনায়াসে গুলি করে মারতে পারত। কিন্তু সম্ভবত জানোয়ারটার উপর প্রচণ্ড আক্রোশ পোষণ করার ফলেই সে খালি হাতে ছুটে গেছিল।

আছাড় খেয়ে লেপার্ডটা হতভম্ব হয়ে গেছিল। তার পিতৃপুরুষের কাছে কোথাও সে এই ধরনের অভিজ্ঞতার গল্প শোনেনি। এই আক্রমণের কায়দাটা তার কাছে একেবারেই নতুন, বিশ্রী।

কিন্তু আফ্রিকা মহারণ্যের সবচেয়ে বিপজ্জনক জানোয়ার লেপার্ড নিরস্ত্র মানুষের হাতে আছাড় খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র নয়।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুতের মতো সে প্রতি-আক্রমণ করল। এই আক্রমণের চকিত ক্ষিপ্রতায় শিকারি তার রাইফেল তুলবার সময় পায় না, দ্রুতগতি বেবুন বৃক্ষশাখা থেকে লুটিয়ে পড়ে ভূমিপৃষ্ঠে গরিলার চোখের উপর দিয়ে উধাও হয়ে যায় ভূমিষ্ঠ শিশু, কিন্তু এবার লেপার্ড শত্রুর নাগাল পেল না।

বজ্রের মতো দুটি অস্বাভাবিক লম্বা হাত চিতাবাঘের কণ্ঠনালী চেপে ধরল। ঝটাপটি করতে করতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই গড়িয়ে পড়ল মাটির উপর। স-নখ থাবার দ্রুত সঞ্চালনে রক্তাক্ত হয়ে উঠল কটারের দুটো হাত ও নিম্নাঙ্গ, কিন্তু তার হাতের চাপ একটুও শিথিল হল না।

মানুষের আদিমতম অস্ত্র এবং অরণ্যচারী পশুর বন্যবিক্রমের দ্বৈরথে অবশেষে চার্লস কটারই জয়ী হল।

বজ্রমুষ্টির কঠিন নিষ্পেষণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করল লেপার্ড। যুদ্ধ শেষ।

কিন্তু কটার তখন রীতিমতো আহত।

তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ছে উষ্ণ রক্তের ধারা, লেপার্ডের শাণিত নখর দেহের একাধিক স্থানে সৃষ্টি করেছে সুদীর্ঘ ও গভীর ক্ষতচিহ্নের। ফলে বাড়ি ফিরে এখনই ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, না হলে

ক্ষত বিষিয়ে যেতে পারে—তারপর আপাতত বেশ কিছুদিন টানা বিশ্রাম।

কিন্তু আমরা তো বলতে বসেছি চার্লস কটারের কথা। ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য কটারের ক্ষেত্রে সেগুলো খাটে না।

তাহলে কটার কি করল।

ক্ষতস্থানগুলোতে একটা মোটামুটি ব্যান্ডেজ মতো করে সে অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী শিকারের জন্য।

অবশ্য এবার আর তাকে হতাশ হতে হয়নি। কুকুরের মাংসের গন্ধে এবার যে লেপার্ডটা এসে আবির্ভূত হল, সেটা আকৃতিতে যেমন বড়সড়ো, তেমনি গায়ের চামড়াটিও তার ভারী সুন্দর। রাইফেলের একটি গুলিতেই শিকারপর্ব সমাধা হয়ে গেল।

জীবজগতে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। বহু ক্ষেত্রেই এ ধরনের কাহিনির খোঁজ মেলে। আমাদের পূর্বোক্ত ঘটনার বেশ কয়েক দিন পরে কটার যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেলেও তাকে প্রতিশোধ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা বলেই মনে হয়।

সে দিন জঙ্গলের পথ দিয়ে হাঁটছিলেন কটার। আচম্বিতে পিছন থেকে দুটি ছোট জাতের লেপার্ড তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জন্তুদুটো কটারের মাথার উপরে বৃক্ষশাখায় লতাপাতার আড়ালে আত্মগোপন করে ছিল। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য কটার প্রস্তুত ছিল না। সে বুঝতে পারল যে হাতের রাইফেল আর তার কাজে লাগবে না। উপরন্তু ততক্ষণে শ্বাপদের দাঁত ও নখের আক্রমণে তার সর্বাঙ্গ হয়ে উঠেছে রক্তাক্ত।

উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে কটার চকিতে পালটা আক্রমণ করল। তার আগেই সে রাইফেল ফেলে দিয়ে হাত দুটোকে মুক্ত করে নিয়েছিল। বাঘ দুটো এই দ্রুত প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, শত্রুর পায়ের কাছে জমিতে তারা ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে কটার একটা লেপার্ডের গলা চেপে ধরল। বজ্রপেষণে লেপার্ডটার চোখে তৎক্ষণাৎ রক্ত জমে গেল, কিন্তু শাণিত কিরীচের মতো তার নখগুলো নিশ্চেষ্ট রইল না। কটারের সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল রক্তাক্ত।

কটার একটা লেপার্ডের সঙ্গে লড়াই করছে, এমন সময়ে পিছন থেকে দ্বিতীয় লেপার্ডটা শত্রুর পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে লাফ দিল। মুহূর্তের জন্য লড়তে লড়তে কটার একটু ঝুঁকে পড়েছে, ফলে লেপার্ডের লাফটা ফসকে গেল। কটারের পিঠে না পড়ে সে এসে পড়ল তার আক্রান্ত সঙ্গীর পিছনের পায়ের উপর। কটারের কবলে তখন লেপার্ডটা ছটফট করছে মুক্তি পাওয়ার জন্য। স-নখ থাবার একটি আঘাতে বিদীর্ণ হয়ে গেল দ্বিতীয় চিতাবাঘটার পেট। কটার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ল না। আরেকটা হাত দিয়ে দ্বিতীয় জন্তুটাকেও প্রাণপণে চেপে ধরল জমির উপর।

কিন্তু আকৃতির অনুপাতে অনেক বেশি শক্তিশালী লেপার্ডের পেশিগুলো স্প্রিং-এর মতো মাটি থেকে ঠেলে উঠতে সচেষ্ট হল। ফলে চার্লস কটারের পক্ষেও দু-দুটো জন্তুকে চেপে ধরে রাখা সম্ভব হল না। ফলে কটারকে দাঁড়িয়ে উঠতে হল ঠিকই, কিন্তু তার লৌহ অঙ্গুলির বন্ধন জন্তুদুটোর গলার উপর এতটুকুও শিথিল হল না।

কটারের বাহু এবং কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে তখন ফিনকি দিয়ে রক্ত

ছুটছে। কিন্তু অবিরাম রক্তক্ষরণে অবসন্ন হয়ে আসার বদলে, সে যেন রক্তলোলুপ বাঘের মতোই দ্বিগুণ শক্তিতে লড়তে লাগল। দু-হাত দিয়ে দুটো লেপার্ডকে শূন্যে তুলে ধরে সে ক্রমাগত দুটোর মাথা ঠুকে দিতে লাগল। অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

কটারের সঙ্গে যে নিগ্রো সঙ্গীরা ছিল, তারা প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে তারা ফিরে এসেছে। গুলি করবার উপায় নেই, নিক্ষিপ্ত বুলেট কটারের গায়ে লাগতে পারে। বিস্ফারিত ভীত দৃষ্টিতে তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে দেখতে লাগল মহাকায় এক মানুষের সাথে দু-দুটো হিংস্র শ্বাপদের মরণপণ লড়াই। এক নিদারুণ সহ্যশক্তির পরীক্ষা।

চার্লস কটারের রক্তস্নাত দেহে অফুরন্ত শক্তির জোয়ার। একটু পরেই তার মনে হল লেপার্ড দুটো কেমন যেন অবসন্ন হয়ে আসছে। তাদের থাবার অথবা দাঁতের জোর যেন কমে এসেছে।

বিজয়ীর আনন্দে চিৎকার করে উঠল কটার।

বিদীর্ণ উদর লেপার্ডটার ক্ষতস্থান দিয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে পড়ছিল রণস্থলের ঘাসজমির উপর, শ্বাসনলীর উপর কঠিন নিষ্পেষণে অন্যটিও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

লড়াইয়ের কায়দাটা এবার একটু পালটে কটার মাটির সঙ্গে সমান্তরাল করে দুই বাহুকে সোজা করে সে দাঁড়িয়ে উঠল, ফলে লেপার্ড দুটো আর তার শরীর স্পর্শ করতে পারল না। তারপর অদূরবর্তী একটা গাছের কাছে গিয়ে গুঁড়িতে জন্তু দুটোর মাথা ঠুকতে লাগল সমস্ত শক্তি দিয়ে।

মাথার উপর প্রচণ্ড আঘাত—কণ্ঠনালিতে লৌহকঠিন নিষ্পেষণে ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল দুটি শ্বাপদ।

মৃতপ্রায় জন্তুদুটোকে মাটিতে আছড়ে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল কটার।

যুদ্ধ শেষ!

চার্লস কটার অসাধারণ মানুষ। সে নিয়মেরই ব্যতিক্রম নয়, সে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম।

চার্লস কটারের দুই পুত্র মাইক এবং বাড কটার পিতার মতোই 'শ্বেতশিকারির' পেশা গ্রহণ করেছিল। মাইক কটারের স্মৃতিচারণের

মধ্যে দিয়েই আমরা চার্লস কটার নামক নরদানবের আর একটি ছোট্ট কাহিনি জানতে পারব।

"কেপ-বাফেলো"—আফ্রিকা মহারণ্যের দুর্বিনীত, অবাধ্য সন্তান।

কালবৈশাখীর মেঘের মতো গায়ের রং, পেশিবহুল প্রশস্ত কাঁধ, বিপুল বপু—ওজনে প্রায় একটনের কাছাকাছি, মাথায় মধ্যযুগীয় যোদ্ধাদের শিরস্ত্রাণের মতো হাড়ের আবরণ (Boss of the horn), আর সেই শিরস্ত্রাণের দুই প্রান্ত শোভিত করে বিস্তৃত দুটি ভয়ংকর শিং।

এ তো গেল আকৃতি। আফ্রিকার কেপ-বাফেলোর প্রকৃতি আরো ভয়াবহ।

গন্ডার বা হাতি অতিকায় দেহের অধিকারী হলেও তাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ, পক্ষান্তরে লেপার্ড বা সিংহ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদের চোখ এবং কান অত্যন্ত প্রখর হলেও ঘ্রাণশক্তি খুবই কম। বন্যমহিষের ঘ্রাণ, শ্রবণ এবং দৃষ্টির প্রখরতায় রচিত হয়েছে মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শ। সম্পূর্ণ অকারণে আক্রমণ করে বুনো মহিষ তার হত্যালীলা মিটিয়েছে এমন ঘটনা বিরল নয়। প্রথম আক্রমণের মুখে শত্রুকে আঘাত হানতে না পেরে গন্ডার বা হাতি অনেক সময়েই ঘুরে এসে পুনরায় আক্রমণ করে না, কিন্তু কেপ-বাফেলো সে পাঠশালার ছাত্র নয়, বিদ্যুদ্বেগে তার বিশাল দেহটাকে সঞ্চারিত করে বারংবার সে শত্রুর দেহে আঘাত হানে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তার আক্রমণে ভাটা পড়ে না।

'কেপ-বাফেলো'-র বুদ্ধি কিন্তু তার দেহের স্থূলতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বুনো মহিষ অতি ধূর্ত জানোয়ার। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে সে অস্ত্রধারী মানুষকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে, তারপর একসময় অতর্কিতে ঝড়ের মতো আক্রমণ করে বসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিকারি রাইফেল তোলার অবকাশ পায় না, নিষ্ঠুর শিং-এর আঘাতে ধরাপৃষ্ঠে লম্বিত হয় তার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

চার্লস কটার খুব ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন বুনো মহিষ বা ম'বোগো (স্থানীয় ভাষা) সম্পর্কে, কিন্তু অরণ্যপথে চলতে চলতে মহিষটা যখন তাঁকে অভাবিতভাবে আক্রমণ করে বসল, তখন ওই পুস্তকলব্ধ জ্ঞান তাঁর বিশেষ কাজে লাগল না। ঝড়ের মতো ছুটে এল

মহিষ—মুহূর্তের জন্য কটারের দৃষ্টিপথে ধরা দিল এক কৃষ্ণবর্ণ জান্তব বিভীষিকা। হত্যার উদগ্র উন্মাদনায় উন্নীত দুটি বিশাল শৃঙ্গ। বন্দুক তুলে নিশানা করার সময় পেলেন না কটার, কোনোক্রমে ট্রিগারে চাপ দিলেন।

গুলি মহিষের মর্মস্থানে কামড় বসাল না—লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পরক্ষণেই প্রচণ্ড আঘাতে কটার ছিটকে পড়লেন।

নিশ্চিত মৃত্যু।

আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শিং ও খুরের নিষ্ঠুর আঘাতে পিষ্ট হয়ে যাবে তাঁর দেহ। আফ্রিকার নিষ্করুণ প্রান্তরের বুকে শিকারির দুর্ভাগ্যের চিহ্ন হিসাবে শুধুমাত্র পড়ে থাকবে রক্তাক্ত এক তাল মাংসপিণ্ড এবং ছিন্নবিছিন্ন পরিধেয়। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কটার তাঁর পিঠের নীচে অনুভব করলেন তৃণভূমির ঘাসে ঢাকা জমি।

কিন্তু নিশ্চিতকে অনিশ্চিত প্রমাণ করতেই কটারের জন্ম—এত সহজে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে তিনি রাজি হলেন না।

মহিষ তখন কটারের উপর এসে পড়েছে। চরম আঘাত হানবার জন্য শূন্যে আন্দোলিত হল যমদণ্ডের মতো দুটি শিং। তারপর নেমে এল শত্রুর ভূপতিত দেহ লক্ষ্য করে। পশুরাজ সিংহের স-নখ থাবার প্রচণ্ড চপেটাঘাতে যে স্ফীত স্কন্ধদেশে সামান্য কয়েকটা আঁচড়ের বেশি কিছু কাটতে অক্ষম, 'কেপ-বাফেলো'র শৃঙ্গাঘাতের সেই উৎসশক্তি, এবার কিন্তু শিকারির দেহ স্পর্শ করতে পারল না। মহিষের শৃঙ্গ শোভিত মস্তক এবং ভূপতিত মনুষ্যদেহের মাঝখানে প্রাচীর সৃষ্টি করতে সক্রিয় হল দুটি বলিষ্ঠ পা।

মুখের উপর পড়ছে উন্মত্ত মহিষের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। দুটো প্রা মহিষের কাঁধ ও গলায় স্থাপন করে আঘাত প্রতিহত করার ফাঁকেই এক হাতে রাইফেল তুলে নিলেন কটার।

না, এবার আর ভুল হল না। একটি গুলিতেই মৃত্যুবরণ করল আফ্রিকার মহিষাসুর।

দুর্দম শক্তিধর কটার। আক্রমণোদ্যত কেপ-বাফেলোকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে আটকে রাখার কাহিনি পৃথিবীতে বিরল। হারকিউলিস, স্যামসন, ইউলিসিস বা টারজান কি কটারের চেয়েও শক্তিশালী?—

কাহিনির পাঠক পাঠিকারাই সে বিচার করবেন।

সৃষ্টিছাড়া চার্লস কটারের মৃত্যুও হয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে—একটা সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে। 'অমানুষিক মানুষ'টির কথা বলতে বসে উপসংহারে এই কাহিনিটি না বললে হয়তো অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পৃথিবীতে যে মানুষ যত গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে চলে, ভাগ্যদেবীও বোধ করি তার ললাটে ততই দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় লিপি লিখে যান। কটারের জীবনদীপ নির্বাপিত হওয়ায় কাহিনি তাই অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর।

বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রাইফেল হাতে কটার জঙ্গলে ঘুরছিলেন, উদ্দেশ্য অরণ্য জীবনের কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তকে চিরতরে ধরে রাখবার যদি কিছু সুযোগ মেলে। সোজা কথায় 'ফটো তোলা'।

ক্যামেরার যে অংশের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু বা তার প্রতিচ্ছবির প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত করা হয় তাকে বলে ভিউ-ফাইন্ডার (View-Finder)। কটারের ক্যামেরার ওই নিউ-ফাইন্ডারটা খারাপ ছিল। সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ে ক্যামেরার মালিকও বিশেষ মাথা ঘামায়নি, কিন্তু তার ফল হল মর্মান্তিক।

জঙ্গলের পথে চলতে চলতে হঠাৎ কটারের চোখে পড়ল একটা গন্ডার। আকারে বেশ বড়সড়। রাইফেল রেখে তিনি জন্তুটার ছবি তুলতে সচেষ্ট হলেন।

বদমেজাজি বলে গন্ডারের খুব অখ্যাতি নেই। কিন্তু একটা অদ্ভুত ধরনের জিনিস তাক করে ধরে কটারের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির রকমটা ভালো লাগল না তার। সে তাড়া করে এল কটারের দিকে।

ক্যামেরার যন্ত্র-চক্ষুর মধ্য দিয়ে চার্লস দেখছে। গন্ডার অনেক দূরে আছে, কিন্তু আসলে তখন জন্তুটা খুব কাছে এসে পড়েছে। কটার যখন তার বিপদ উপলব্ধি করল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। গন্ডারের খড়্গ প্রায় তার দেহ স্পর্শ করেছে।

একবার মাত্র গুলি চালাবার সুযোগ পেয়েছিল কটার। তারপরই গন্ডারের সুদীর্ঘ খড়্গ তার দেহটাকে বিদ্ধ করে দিল।

জীবনযুদ্ধের বিজয়ী সৈনিক চার্লস কটার মৃত্যুর কাছেও পরাজয় বরণ করেনি।

একটিমাত্র গুলিতেই কটারের মৃত্যুদূত ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছিল।

ওকলাহামার দুর্ধর্ষ মানুষটি অবশেষে চিরশান্তি লাভ করল আফ্রিকা মায়ের কোলে।

বিলি প্যারোট

টোয়েনকে ডিড্‌ল ওঃ! টোয়েনকে ডিড্‌ল ওঃ! টোয়েনকে ডিড্‌ল ইডল্‌ ইডল্‌ ও!

না, কোনো সাংকেতিক ভাষা নয়—বিলি প্যারোট-এর প্রিয় গানের ছত্রের দুটি লাইন। গান বহুজনেরই প্রিয় এবং প্রত্যেকেরই দুটি বা একটি বিশেষ গান অপেক্ষাকৃত বেশি প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু বিলি প্যারোট নামক খর্বাকৃতি মানুষটা যখনই অন্যমনস্ক হয়ে এই গানটার কলি মনে মনে গুণ গুণ করে গাইত—তখনই সম্ভবত তার মনে ভেসে উঠত এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা—বাঁকুড়া জেলার নিবিড় অরণ্যানীর পটভূমিতে এক হিংস্র শ্বাপদ ও একটি দরিদ্র, মিষ্টভাষী, খর্বাকৃতি মল্লযোদ্ধার মধ্যে সংঘটিত বিচিত্র এক দ্বৈরথের কাহিনি।

অরণ্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাস, রক্তজমানো কাহিনির সংকলন হিসাবে যুগে যুগে লেখা হয়েছে, বৈচিত্র্যের বিচারে আমাদের বর্তমান কাহিনির স্থান অবশ্যই সেই ঐতিহাসিক সূচীপত্রের উপরের ভাগে।

এখন, কে এই বিলি প্যারোট?

পাঠকের কাছে এখনও তার পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু কাহিনির সূচনায় পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া বোধ করি আবশ্যক এবং প্রসঙ্গতই হবে।

বন্ধু প্যাট-এর কাছে স্মৃতিচারণের অবসরে বিখ্যাত শিকারি জেম্‌স্‌ ইংলিশ বিলি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর বর্ণনা রেখেছেন। এইখানে বলে রাখা ভালো যে, শিকারি জেম্‌স্‌ ইংলিশ-এর মাতৃভূমি হচ্ছে সুদূর নিউজিল্যান্ড। নীলের ব্যবসা করতে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন উনিশ শতকের শেষভাগে। ব্যবসায় তিনি কতটা সাফল্য লাভ

করেছিলেন তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, কিন্তু সমকালীন ভারতবর্ষের বহু অরণ্যের পটভূমিতে ইংলিশ সাহেবের কৌতূহলী শিকারি মন যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণের অবসরে লেখা সেই সব কাহিনির বর্ণনায় আমরা কখনো হয়েছি বিস্মিত, কখনো মুগ্ধ অথবা কখনো শিহরিত। বিলি প্যারোটের সঙ্গে ইংলিশ সাহেবের পরিচয় ওই সময়েই।

বিলি জাতিতে ছিল স্কচ। পেশায় কামার। কিন্তু কোনো পেশাকেই অবলম্বন করতে তার আপত্তি ছিল না। শোনা যায়, প্রথম জীবনে নাবিক হয়ে সে বিশ্বভ্রমণ করেছিল। তারপর, সে কাজে ইস্তফা দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাইনেয় কলকাতার ট্যাঁকশালে চাকরিতে ঢোকে। পরে জনৈক 'হেনরী' নামক শ্বেতাঙ্গের মালবাহক হিসাবে মাসিক একশো পঞ্চাশ টাকা মাইনের বিলি 'তিরহাট' এসে পৌঁছোয়। শিকারি ইংলিশ সাহেবের সঙ্গে বিলির পরিচয় এই তিরহাটেই। ছোট্টখাট্ট অথচ পেশিবহুল চেহারার, মিষ্টি স্বভাবের এই মানুষটি ইংলিশ সাহেবের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু, বিলি ছিল অসীম শক্তিশালী একজন ওস্তাদ মল্লযোদ্ধা। যদিও তার চেহারার বা ব্যবহার আপাতভাবে তার কোনো ছাপই পড়তো না। শরীরে শক্তিসঞ্চয় করতে বিলি প্যারোট যে বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় নিত, তার মধ্যে একটি ছিল সত্যিই অভিনব। যেমন, বিলির একটা পোষা ভেড়া ছিল এবং মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী সেটা শিং বাগিয়ে সবেগে ছুটে এসে বিলির দেহের বিভিন্ন অংশে পাথরের মতো শক্ত মাংসপেশিগুলোর উপর প্রচণ্ড জোরে ঢুঁ মারত। এই আশ্চর্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিলি নিজের দেহে শক্তিসঞ্চয় করত এবং একই সঙ্গে দেহের মাংসপেশিগুলিকে করে তুলত আঘাতসহ।

ছোট্ট মানুষটির শুধুমাত্র একটি ব্যাপারেই দুর্বলতা ছিল, এবং সেটি হল মদ্যপানে তার প্রবল অনুরাগ। শিকারি ইংলিশ সাহেব পরিচয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেনে গিয়েছিলেন বিলির এই দুর্বলতার কথা, কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি আপত্তিকর কিছু খুঁজে পাননি। কিন্তু পরবর্তীকালে আপত্তি নয়, বিপত্তি ঘটেছিল, এবং তা হল শুধুমাত্র বিলির সুরার প্রতি তীব্র ওই আসক্তির জন্যই।

বিলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিন কয়েকের মধ্যেই ইংলিশ সাহেব

ভালুক শিকারের এক নিমন্ত্রণ পেলেন, বাঁকুড়া জেলায় বাসরত তাঁর এক বন্ধু—প্রাক্তন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর কাছ থেকে। অবশ্যই সখের শিকার। কিন্তু আয়োজনের ক্রুটিমাত্র ছিল না। বিলিকে সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন সাহেব। এছাড়া 'শিকারি' বলতে ছিলেন কলকাতা থেকে আগত দু-একজন ব্যারিস্টার, জনৈক ডাক্তার, স্থানীয় জেলা জজ এবং মিঃ ইংলিশ-এর সহযাত্রী এক বন্ধু—'পীলার'। ওই 'পীলার' নামেই সম্ভবত ভদ্রলোক বন্ধুমহলে পরিচিত ছিলেন, কারণ, ইংলিশ সাহেবও অন্য কোনো নামে তাঁর পরিচয় দেননি।

স্থানীয় পুলিশদের দিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে গাছের উপর মাচাগুলো বাঁধা হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে গজ-পঞ্চাশেকের মতো ব্যবধান রেখে। দলের মধ্যে অভিজ্ঞ শিকারি হিসাবে মিঃ ইংলিশ এবং আমাদের পূর্বপরিচিত ওই মিঃ পীলার। তারা দুজনে উঠলেন একদম ডান দিকের মাচায়। বিলি উঠল একেবারে বাঁ-দিকেরটায়। অন্যান্যরা আশ্রয় নিলেন মধ্যবর্তী মাচাগুলোয়।

'বীটার'-দের 'বীট' আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সার বেঁধে শব্দ করতে করতে তারা গোটা অঞ্চলের পশু-পক্ষী তাড়িয়ে আনছিল অপেক্ষমান শিকারিদের দিকে। যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভালুক-শিকার, কিন্তু শিকার করার ব্যাপারে কোনো পশুপাখির উপরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল না, ফলে 'বন-তাড়ুয়াদের' তাড়ায় পলায়নপর অসংখ্য পাখি, হরিণ, বনমোরগ বা খরগোশের মতো ছোটখাটো জন্তুগুলির উদ্দেশ্যে প্রায়ই শিকারিদের বন্দুক অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল। ইংলিশ সাহেব এবং তাঁর বন্ধু পীলার-এর যৌথ প্রচেষ্টায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ধরাশয্যা গ্রহণ করল একটা হরিণ, গোটাকয়েক বনমোরগ এবং ছোটখাটো আরও কিছু প্রাণী। কিন্তু ভাল্লুকের সন্ধান মিলল না।

সুতরাং, দ্বিতীয়বার 'বীট' আরম্ভ হল ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। মাচার উপর রাইফেল রেখে দিয়ে, শুধুমাত্র কোমরে ঝোলানো রিভলবার নিয়েই জেম্স্ বীট পর্যবেক্ষণ করতে গাছ থেকে নেমে মাটিতে এসে দাঁড়ালেন। বিভিন্ন দিক থেকে বিকট আওয়াজ করতে করতে বীটাররা নিকটবর্তী হচ্ছিল। হঠাৎ জেম্স্-এর সামনে একটা ঝোপ নড়ে উঠল। সেই সঙ্গে কাঠকুটো মাড়িয়ে কিছু একটা এগিয়ে আসার সন্দেহজনক শব্দও

কর্ণগোচর হল। মুহূর্তের মধ্যে নিজের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করলেন জেম্‌স্, কিন্তু বিচলিত হলেন না। কোমরের খাপ থেকে রিভলভার টেনে তৈরি হলেন যে কোনো আকস্মিক মুহূর্তের জন্য। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল—নাঃ, ভালুক নয়, বিলি প্যারোট!!!

—'শুকিয়ে চুনের ভাটি হয়ে গেলাম জেম্‌স্। এক চুমুক না হলে তো আর চলছে না।'

বিলি তার আবির্ভাবের কারণ জানাল।

—'এখন যে কোনো সময়ে ভালুক বেরোতে পারে, আর তুমি কি না গলা ভেজাতে, খালি হাতে মাচা ছেড়ে নেমে চলে এলে!'— ইংলিশ সাহেব বেশ খানিকটা বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন।

—'দুত্তোর তোমার ভালুক। আপাতত তর্ক না করে আমাকে আগে বোতলটা দাও।' বিলি যেন একটু বিরক্তই হল।

সুরাসক্ত বেঁটে মানুষটার সঙ্গে তর্ক করার পক্ষে স্থান ও কালটা ঠিক উপযুক্ত নয়, সম্ভবত এই প্রকার কিছু চিন্তা করেই মাচার উপর থেকে জেম্‌স্-এর জনৈক শ্বেতাঙ্গ বন্ধু বোতলটা নীচে বিলির উদ্দেশ্যে নামিয়ে দিল। বিলিও অহেতুক সময় নষ্ট না করে দু-তিনটি লম্বা লম্বা চুমুকে বেশ কিছুটা তরল পদার্থ গলাধকরণ করে বোতলটা ফেরত দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ-দিকের অদূরবর্তী মাচার উপর থেকে ভেসে এল স্থানীয় জেলা-বিচারপতির আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর—

'দেখুন! দেখুন! ওই যে! একটা ভালুক।'

পরিস্থিতি চিন্তা করার সময় ছিল না। চকিতে জেম্‌স্ ছুটলেন নিকটবর্তী গাছটার দিকে। বিলিও তাঁকে অনুসরণ করল।

—'আরে ওই তো শয়তানটা।' বিলিই প্রথমে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর তার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পলায়নে তৎপর মানুষ দুটির সামনে আবির্ভূত হল একটা প্রকাণ্ড ভল্লুকী। তার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করে ঝুলছে একটি ছোট্ট শাবক। মুহূর্তের ব্যবধানে রিভলভার টেনে নিয়ে গুলি চালালেন জেম্‌স্। গুলি শ্বাপদের চোয়াল বিদ্ধ করল ঠিকই কিন্তু তার গতি রুদ্ধ হল না, ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তাড়া করল

বিলি প্যারোটকে।

পলায়নে সচেষ্ট বিলি প্যারোটের উদ্দেশ্যে সাহায্যের চেষ্টায় জনৈক শ্বেতাঙ্গ শিকারি মাচার উপরে শুয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যাতে ভল্লুকীকে ফাঁকি দিয়ে বিলি গাছে উঠে পড়তে পারে।' ইংলিশ সাহেব দৌড়তে দৌড়তেই শুনতে পেলেন বিলির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উক্ত শিকারিটির সতর্কবাণী—'জলদি বিলি, জলদি। আর একটু জোরে, নইলে শয়তানটা তোমায় নির্ঘাত ধরে ফেলবে!'

কিন্তু বিলি নিষ্কৃতি পেল না। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সহযোগী শিকারিটির এগিয়ে দেওয়া হাতটি সে হস্তগত করতে পারল না। ফলে শেষ মুহূর্তে খর্ববকায় মানুষটি ঘুরে পালাবার চেষ্টা করল বটে কিন্তু সেই সঙ্গীণ পরিস্থিতিতে দুর্ভাগাক্রমে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল একটা বড় গাছের শিকড়ে পা আটকে। সঙ্গে সঙ্গেই ভল্লুকী ঝাঁপিয়ে পড়ল বিলির উপর।

শ্বাপদে ও দ্বিপদে শুরু হল এক বিচিত্র মল্লযুদ্ধ। ভয়াবহ মৃত্যু-আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দুই অ-সম প্রতিদ্বন্দ্বী গড়িয়ে চলল এক নিশ্চিত পরিসমাপ্তির দিকে। হ্যাঁ, 'নিশ্চিত পরিসমাপ্তি' কথাটা বলা হল এই কারণে যে, একটি অতিকায় ভল্লুকীর সঙ্গে নিরস্ত্র একটি মানুষের দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরিণাম যে কি হতে পারে শিকারিদের সে সম্পর্কে সম্যক ধারণাই ছিল। বন্দুক হাতে মিঃ ইংলিশ এবং তাঁর বন্ধুরা তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন এক বিস্ময়কর দ্বৈরথের করুণ পরিণতি। গুলি চালানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ নিক্ষিপ্ত গুলি ভল্লুকী ও বিলি দুজনের যে কাউকেই আঘাত করতে পারে। সুতরাং, নিশ্চেষ্ট হয়ে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভূমিকা তাঁদের ছিল না।

ভল্লুকীর দাঁত বড় সাংঘাতিক অস্ত্র। কিন্তু জেমস্-এর রিভলভার থেকে নিক্ষিপ্ত গুলি তার নীচের চোয়াল উড়িয়ে দিয়েছিল, ফলে বিলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার সে অস্ত্র তখন হয়ে পড়েছিল অকেজো। কিন্তু দাঁতই ভালুকের একমাত্র অস্ত্র নয়। তাই বিলির শরীরকে ছিন্নভিন্ন করতে নিয়োজিত হল ভল্লুকীর মারাত্মক নখরযুক্ত থাবা। পাথরের মতো কঠিন উইটিবি যে নখের আঘাতে নরম মাটির স্তূপে পরিণত হয়, মানবদেহের

পরিণতি সেই সারিবদ্ধ কৃপাণের সান্নিধ্যে এলে কি হতে পারে তার ধারণা সম্ভবত বিলির চিন্তাতেও এসেছিল, তাই তার শক্তিশালী দুই পায়ের নিপুণ প্রয়োগকৌশলে ভল্লুকীর পিছনের পা এবং থাবা দুটোকে সে করে দিয়েছিল সম্পূর্ণ অকেজো। অন্যদিকে, শত্রুর মুখের তলায় নিজের বাঁ-হাতটাকে এক অদ্ভুত কৌশলে স্থাপন করে সে ভল্লুকীর মুখে, পাঁজরে এবং অন্যান্য দুর্বলস্থানে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রয়োগ করে চলেছিল তার মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের শক্তিশালী মুষ্টিযোগ। সেই সঙ্গে উপযুক্ত সংগতে তার মুখ থেকে অবিরাম নির্গত হচ্ছিল ইংরেজি, স্কচ এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় যাবতীয় অকথ্য গালিগালাজ।

ইংলিশ সাহেব বিলির এই অদ্ভুত আচরণে স্থান-কাল ভুলে হেসে উঠলেন হো হো করে। যুদ্ধরত বিলির কানেও সম্ভবত সেই হাস্যধ্বনি গেছিল; কারণ, মুহূর্তের জন্য সে গালাগালি দেওয়া বন্ধ করল। তারপর আবার শুরু করল অবিরাম ধারায়, এবং এবারের লক্ষ্য আর কেউ নয়, স্বয়ং জেম্‌স্ ইংলিশ। বলা বাহুল্য, বিলির উচ্চারিত শব্দগুলি একজন ভদ্রলোকের পক্ষে আদৌ সম্মানজনক ছিল না, ফলে অচিরেই জেম্‌স্ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন।

ক্রমাগত গড়াতে গড়াতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহ এগিয়ে চলেছিল নিকটবর্তী একটা খাদের দিকে। আর মাত্র যখন ফুট কয়েকের ব্যবধান, এমন সময় স্থানীয় জেলা জজের আক্ষেপ-উক্তিতে স্থানুবৎ দণ্ডায়মান শিকারিদের যেন সম্বিত ফিরল।—'হায় ভগবান! ওর বাঁচার কোনো উপায় নেই।' একইসঙ্গে ইংলিশ সাহেবের সতর্কবাণীও উচ্চারিত হল বিলির উদ্দেশ্যে। কিন্তু আর মাত্র একটি পাক। তারপরই ভল্লুকী ও বিলির আলিঙ্গনাবদ্ধ দেহ অদৃশ্য হল খাদের গহ্বরে। উপর থেকে শিকারিরা দেখলেন বিদ্যুদ্বেগে শূন্যে অবতরণশীল একটি কালো বস্তু খাদের গায়ে একটি প্রস্তরখণ্ডে সজোরে ধাক্কা খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গভীরতর শূন্যতায়।

সবাই নির্বাক, বিমূঢ়, স্তম্ভিত! ঘটনার করুণ পরিণতি কেমন যেন অসুস্থ করে তুলেছিল পরিবেশকে। বিশেষত মিঃ ইংলিশ মনে মনে নিজেকেই দায়ী করেছিলেন এই বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য। কেন যে

তিনি বিলিকে সঙ্গে আনতে গেলেন; তখন যদি তিনি এই ধরনের ঘটনার কোনো রকম পূর্বাভাস পেতেন, তাহলে আজকে হয়তো তাঁকে এই নির্মম মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে থাকতে হত না। বিবেকের কাছে নিজেকে এখন বারবারই তাঁর অপরাধী বোধ হতে লাগল।

অস্বস্তিকর এই নীরবতাকে প্রথমে কাটিয়ে উঠলেন জনৈক শ্বেতাঙ্গ, বললেন,—'যাক্ যা হওয়ার তা হয়েছে। এখন আমাদের বোধহয় উচিত হবে, বিলির দেহটার সন্ধান করা।' কথার বাস্তবতা ও যুক্তি অনস্বীকার্য। উপরন্তু বর্তমান পরিবেশটাকে পালটানোর প্রয়োজন সকলেই বোধ করছিলেন। সুতরাং বিলির দেহ অনুসন্ধান করতে খাদের নীচে যাওয়াই সাব্যস্ত হল।

দুর্গম পাহাড়ি পথ নেমে গিয়েছে নীচের দিকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথের নিশানা হয়েছে অদৃশ্য। সেখানে অবলম্বন শুধু ঘাসের চাপড়া অথবা পাথরের খাঁজ। তারই মধ্যে শিকারিরা হরিণের পায়ে চলার একটা পথ খুঁজে বের করলেন। কিন্তু এই পথ ধরে কিছুটা নামার পরই স্থানীয় জেলা জজ এবং কলকাতাবাসী ব্যারিস্টারগণ উপলব্ধি করলেন যে, এই বন্ধুর ভ্রমণে ইস্তফা দিয়ে আপাতত আপন আপন পৈতৃক প্রাণরক্ষায় সচেষ্ট হলে হয়তো ভবিষ্যতে আরও অনেক লোকহিতকর কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিযাত্রীদলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াল দুই-এ। অবশিষ্ট রইলেন কেবলমাত্র শিকারি ইংলিশ সাহেব এবং তাঁর সহযোগী বন্ধু 'সি-'। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, ওই 'সি-' নামেই ইংলিশ সাহেব আমাদের কাছে তাঁর বন্ধুর পরিচয় দিয়েছেন।

বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করার পর শিকারি দুজন সামান্য বিশ্রামের জন্য একটি সমতল পাথরের উপর এসে দাঁড়ালেন। এমন সময়ে, অকস্মাৎ তাঁদের কর্ণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করল এক ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি।

'টোয়েনকে ডিড্‌ল্ ওঃ! টোয়েনকে ডিড্‌ল্ ওঃ...।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন দুজনে। ভুল শুনছেন না তো তাঁরা! এ কী করে সম্ভব!! অত উঁচু থেকে পাথরের উপর ছিটকে পড়ে মানুষ তো দূরের কথা, কোনো পার্থিব প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং—, কিন্তু ওই তো! ওই যে আবার সেই কণ্ঠস্বর, এবার আরও

স্পষ্ট, আরও জোরালো। পথের শেষ বাঁকটুকু ঘুরতেই চোখ-কানের বিবাদ মিটল। এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! ভল্লুকীর তালগোল পাকানো বিশাল মৃতদেহের উপর জাঁকিয়ে বসে গান ধরেছে বিলি প্যারোট—'টোয়েনকে ডিড্‌ল্ ওঃ!...।'

বিলির দেহ ছিল প্রায় অক্ষত। শুধু মল্লযুদ্ধের সময় মারাত্মক নখ তাঁর কাঁধে ও বাহুতে এঁকে দিয়েছিল কয়েকটি গভীর ক্ষতচিহ্ন। এ ছাড়া জানুর কাছে অপর একটি দীর্ঘ ক্ষতও অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছিল।

প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিলিকে ব্র্যান্ডি এবং দুধ খাইয়ে দেওয়া হল।

পরে বিলির মুখেই শোনা গেল তার এই আশ্চর্য পরিত্রাণেব কাহিনি।

প্রচণ্ড বেগে খাদের মধ্যে পড়ার সময় ভল্লুকীর দেহ প্রথমে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং মাটিও প্রথমে স্পর্শ করে। ফলে, ভাল্লুকীর দেহসংলগ্ন বিলি রক্ষা পেয়ে যায় অভাবিতভাবে।

ও রা কে উ ফে রে নি

'বুনোটা বোধহয় আরও খাবার-দাবার আনতে গেল,' নিজের পেটের উপর হাত বুলিয়ে এনে তৃপ্তির সঙ্গে কথাটা বলল মোজানো। কিন্তু বাতিস্তা কোনো উত্তর দিল না, আসলে মোজানোর কথা তার কানেই যায়নি। তার কান তখন অন্যদিকে।

পূর্ণিমার রাত। আকাশে প্রকাণ্ড রূপোর থালার মতো চাঁদ। সমস্ত জঙ্গল আর গ্রামটাকে ঘিরে যেন বয়ে চলেছে সেই বনজ্যোৎস্নার স্রোত। একটু দূরে রিও কাট্রিমানি নদীর বুকেও সেই রূপোগলা ঢল নেমেছে। মাঝে মাঝে একটানা পোকার গুঞ্জন আর রাত চরা পাখি কি ছোটখাটো বাঁদর জাতীয় প্রাণীর দুয়েকটা ডাক ছাড়া আর কিছু সেই অদ্ভুত পরিবেশের মাঝে কানে শোনার নেই। বাকিটা শুধু দেখার।

রূপকথার প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো আকাশছোঁয়া গাছগুলো সেই চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে আছে ভুতুড়ে ছায়া ফেলে। তার ফাঁকে বেশ কিছুটা দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে এক একটা পাতায় ছাওয়া কুটীর। গোটা গ্রামটা ছড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। গ্রামের এককোণে ওইরকম পাতায় ছাওয়া একটা কুটীরে আপাতত বাতিস্তাদের থাকবার ব্যবস্থা।

ঘরের মেঝে মাটির। ঠান্ডা একটু বেশি ঠেকে। নইলে আর কোনো অসুবিধে নেই। খাবার-দাবারের ঢালাও ব্যবস্থা, যে যত খুশি খাও। অমন যে পেটুক মোজানো, সেও খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। অবশ্য একা মোজানোর দোষ দিয়ে লাভ নেই, অন্যরাও এই ক'দিন গোগ্রাসে গিলেছে—যেন দুর্ভিক্ষের পল্টন। আর খাবে নাই বা কেন? রবারগাছের জঙ্গল খুঁজতে খুঁজতে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল সে আজ কমদিন হল না, তারপর থেকে ভয়ংকর ব্রাজিলের জঙ্গলে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে দিশেহারা হয়ে।

পৃথিবীর এমন কোনো বিপদ নেই যার খোঁজ এ অঞ্চলে মেলে না। প্রাণের ভয় একদিকে আর অন্যদিকে একটুকরো খাবারের খোঁজে গোটা দলটাকে ঘুরতে হয়েছে হন্যে হয়ে। শেষপর্যন্ত 'আমেরিকার বাঘ' জাগুয়ারের কবলে পড়ে কি তার চেয়েও হিংস্র অসভ্য উপজাতিদের হাতেই প্রাণটা খোয়াতে হত, নয়তো যেত ক্ষিদের জ্বালায়—কিন্তু এভাবে মৃত্যু বোধহয় তাদের কপালে নেই, তাই শেষ পর্যন্ত কাট্রিমানি উপজাতির একটা ছোট দল তাদের দেখতে পায়। দলটা বেরিয়েছিল শিকারের খোঁজে। তারাই ন'জন মুমূর্ষু মানুষকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে। সেই থেকে থাকা-খাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা। সুতরাং এই ক'টা দিন লোকগুলো যে গা এলিয়ে দিয়েছে সেটা স্বাভাবিক।

সর্দার ত্সুরা নিজে বসে এতক্ষণ খাওয়ার তদারকি করছিল। একটু আগে উঠে বাইরে গেছে। খাবার আনতে নিশ্চয়ই নয়, কারণ খাবার অনেক রয়েছে, তবে পানীয় প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মধু দিয়ে এরা যে বেশ কড়াধাতের একটা পানীয় তৈরি করে, তার পাত্রটায় আর শুধু তলানিটুকু পড়ে আছে। সম্ভবত তাই নিয়ে আসতে বেরিয়ে গেল ত্সুরা। অবশ্য মোজানোর তাতে বিশেষ উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নেই,

তার পেটে এখন এককুচো সুপুরিও ঢোকানো মুশকিল। তাই পরিতৃপ্ত ভুঁড়িটার ওপর একটু হাত বুলিয়ে এনে সে বাতিস্তার উদ্দেশ্যে একটা কথা নিছকই ছুড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাতিস্তার দিক থেকে সে কথার কোনো উত্তর এল না। বাতিস্তা অর্থাৎ অ্যালেজো বাতিস্তা, ন'জনের এই ছোট্ট দলটার নেতা তখন কান খাড়া করে একটা অন্য শব্দ শোনার চেষ্টা করছিল।

দূর থেকে জঙ্গলের হাওয়ায় ভর করে ভেসে আসছে একটানা অদ্ভুত করুণ এক বাঁশির সুর। সে সুর কোনো মানুষের পৃথিবীর নয়, কোনো জীবিত প্রাণীকে সে সুর কাছে ডাকে না, অমানুষিক কোনো অশরীরী পৃথিবী জেগে ওঠে সে বাঁশির মূর্ছনায়। প্রেতলোকের ওপার থেকে সব অপার্থিব অতিথিরা এসে সারি বেঁধে দাঁড়ায় সে ডাকে। প্রকাণ্ড অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে সে বাঁশির সুর উদারা, মুদারা হয়ে তারায় আছড়ে পড়ছে বিচিত্র এক শিহরণ তুলে। বহুক্ষণ ধরে বাঁশি বাজছিল। তারপর একসময় সেই সুরে তাল মিলিয়ে ভেসে আসতে লাগল জংলি ঢাকের শব্দ—দ্রিম্, দ্রিম্, দ্রিম...।

'বোধহয় কোনো উৎসবের ব্যবস্থা হচ্ছে।' মনোযোগ সরিয়ে এনে বলল বাতিস্তা।

'একবার ঘুরে এলে হয় না? জংলিদের উৎসব দেখার সুযোগ তো বড় একটা জোটে না।' উত্তর করল প্যাট্রিজ।

'কথাটা মন্দ নয়', মনে মনে ভাবল বাতিস্তা। সর্দার ত্সুরার কথামতো আর দু-চারদিনের মধ্যে জলপথে রিও কাট্রিমানি ধরে তাদের আমাজনের দিকে যাত্রা করার কথা। তার জন্য একটা 'কয়ূকা'র ব্যবস্থাও করে দেবে বলেছে ত্সুরা। 'কয়ূকা' হল রেড ইন্ডিয়ানদের তৈরি একধরনের ছোট কাঠের নৌকা। ফলে, উৎসব দেখার সুযোগ যে আর পাওয়া যাবে না, এ কথা ঠিক।

ওদিকে জুয়ান প্যাট্রিজ কিন্তু এতসব ভাবেনি, ততক্ষণে সে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসেছে কুটীর থেকে। কুটীরের বাইরে অনেকটা খালি জমি, তারপরে প্রকাণ্ড সব গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে পথ। জ্যোৎস্না আর ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলোর ছায়ায় মিলেমিশে আলো-আঁধারী এক ভূতুড়ে পরিবেশ। জঙ্গলে রাত্তিরে ঘোরাফেরা করার অভ্যস্ত চোখ নয়

প্যাট্রিজের, তবু পূর্ণিমার রাত বলেই বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। কুটীরের সামনে উঠোনটুকু পেরিয়ে এসে গাছের সারির মধ্যে ঢুকতেই তার ডানদিকে একটা ছায়া নড়ে উঠল। দৈত্যের মতো একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ত্সুরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল এই সুযোগের জন্য। প্যাট্রিজ তাকে পেরিয়ে যাওয়া মাত্রই পিছন থেকে সে আঘাত করল। অভ্রান্ত লক্ষ্য। তার ডানহাতের ভারী ছোরা চাঁদের আলোয় একবার ঝিকমিকিয়ে উঠে নেমে এল প্যাট্রিজের ঘাড় লক্ষ্য করে; আবার যখন উঠল তখন তার ফলায় আর চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে না—রক্ত! প্যাট্রিজের ধড়টা গাছের তলাতেই গড়িয়ে পড়ল। মুণ্ডুটা একটু দূরে।

পরের শিকার হল ফ্রেডরিক। প্যাট্রিজের খানিক বাদে বেরিয়ে ক'পা এগোতেই তার নজরে পড়ল সামনে আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে বড়সড়ো পুঁটলির মতো কি একটা পড়ে আছে। পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসল ফ্রেডরিক। আর উঠল না। পুঁটলির মতো গুটিয়ে পড়ে থাকা প্যাট্রিজের মৃতদেহের পাশে তার দেহটাও গড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে। চওড়া তলোয়ারের গায়ে লেগে থাকা রক্ত ফ্রেডরিকের শার্টেই মুছে ত্সুরা আবার মিলিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

পরপর আরও পাঁচজনের একই পরিণতি হল এক ঘণ্টার মধ্যে। একে একে তারা বেরিয়ে এসেছে কুটীরের বাইরে আর গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সর্দার ত্সুরা নিঃশব্দে তার কাজ করে গেছে একের পর এক। এত নিঃশব্দে, এত দ্রুতগতিতে আর এত চকিতে যে মরবার আগে টুঁ শব্দ পর্যন্ত কারো মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

কুটীরের মধ্যে বসে বসে পানীয়ের বাকি তলানিটুকু এতক্ষণে শেষ করল বাতিস্তা। তারপর উঠে দাঁড়াল—'চলো হে মোজানো, বাইরে একটু ঘুরে আসা যাক। এরা তো সব জংলিগুলোর নাচ-গান দেখতে গেছে বেশ খানিকক্ষণ হল। এখনো ফিরছে না যখন, তার মানে মজার কোনো ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে, দেখে আসলে মন্দ হয় না, কি বলো?'

'চলো'। উঠে পড়ল মোজানোও।

হালকা, ফুরফুরে মেজাজেই ঘর থেকে বেরোল দুজনে; কিন্তু অসাধারণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি মোজানোর। এতদূর থেকেই তার চোখে পড়ল

সঙ্গীদের ছড়িয়ে পড়ে থাকা দেহগুলো। তা সত্ত্বেও মোজানো মারাত্মক ভুল করে বসল। আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে সে প্রাণপণে দৌড় দিল সামনের দিকেই। ত্সুরা গাছের আড়ালেই অপেক্ষা করছিল। পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে 'ম্যাচেট' চালাল। মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ল তৎক্ষণাৎ কিন্তু দৌড়বার গতিতে মুণ্ডহীন ধড়টা আরও কয়েক পা ছুটে গিয়ে তারপর মাটিতে পড়ল। পুরো ঘটনাটাই ঘটল বাতিস্তার চোখের সামনে।

দৃশ্যটা ভালো নয়। বোকার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাটা আর সুবিধের বোধ হল না বাতিস্তার। সে ঘুরে দৌড়ল পিছনের ঘন জঙ্গলের মধ্যে, ত্সুরার আয়ত্তের বাইরে। অবশ্য বেশিদূর যেতে হল না। কুটীর ঘিরে প্রতিটা গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে এক-একজন কাট্রিমানি যোদ্ধা। ভারী একটা কাঠের মুগুর সজোরে নেমে এল বাতিস্তার মাথার উপর। কাটা কলাগাছের মতো সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান।

বাতিস্তার জ্ঞান ফিরে এল যখন, তখন তার অবস্থা সঙ্গীন। হাত-পা এতটুকু নাড়াবার উপায় নেই। ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো আড়াআড়ি ভাবে আটকানো কাঠের খুঁটিতে তার হাত-পা টানটান করে বাঁধা। সামনে জ্বলছে প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ড, আর সেই কুণ্ড ঘিরে উন্মত্তের মতো নেচে চলেছে কাট্রিমানি নারী পুরুষের দল। অনেকক্ষণ আগেই শুরু হয়েছে নাচ, কারণ মানুষগুলোর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ছে। বাজনার তালে তালে নাচতে থাকা তাদের সেই ঘাম-চকচকে শরীরের উপর কেঁপে কেঁপে নাচছে অগ্নিকুণ্ডের আভা। নিজেকে ধাতস্থ করতে বেশ খানিকটা সময় লাগল বাতিস্তার। সে যে সত্যিই বেঁচে আছে, প্রথমে একথাটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছিল না। মনে হচ্ছিল, তার সামনে একসঙ্গে সাত-সাতটা নরকের দরজা কেউ এক ধাক্কায় খুলে দিয়েছে।

হঠাৎ থেমে গেল জংলি ঢাক। থেমে গেল বাঁশির সুরও। যেন কোনো যাদুমন্ত্রে বোবা হয়ে গেছে সবাই। অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করতে লাগল গোটা জায়গাটা জুড়ে। তারপর সেই নীরবতার মাঝে পাতায় হাওয়া খেলে যাওয়ার মতো একটা চাপা ফিসফিসানি শোনা

গেল—'ওয়েসোলি! ওয়েসোলি! 'বাতিস্তা তাকিয়ে দেখল অন্ধকার থেকে আলোর কুণ্ডর আওতায় এসে দাঁড়িয়েছে এক অপরূপা নারীমূর্তি।

নারীমূর্তির মাথায় রং-বেরংয়ের লম্বা লম্বা পালকে তৈরি সুন্দর শিরস্ত্রাণ, আর সেই শিরস্ত্রাণের দু-প্রান্তে শোভা পাচ্ছে মোষের শিংয়ের মতো দুটো প্রকাণ্ড কাঠের শিং। তবে তার গলার হার, হাতের কঙ্কণ আর পায়ের নূপুর দেখে আতঙ্কে হিম হয়ে গেল বাতিস্তা। গয়নাগুলোর সবক'টাই তৈরি মানুষের গলার হাড় দিয়ে।

দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে সেই নারীমূর্তি আগুনের কুণ্ডকে বেড় দিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল বাতিস্তার দিকে। জংলিসমাজ নিয়ে বিশদ পড়াশোনা নেই বাতিস্তার, কিন্তু ওই দৃপ্ত ভঙ্গি আর অন্য স্ত্রী-পুরুষদের শ্রদ্ধা মেশানো ভয়ের চাউনি দেখে নারীমূর্তির স্বরূপ চিনতে তার দেরি হল না—ডাকিনীবিদ্যার প্রধান বিদ্যেধরী, ওঝা ওয়েসোলি! দুর্ধর্ষ যোদ্ধা সর্দার ত্‌সুরা পর্যন্ত যার কথা অমান্য করতে সাহস করে না, যার নির্দেশ হল এ সমাজের একমাত্র আইন।

বাতিস্তার সামনে এগিয়ে এসে তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ওয়েসোলি। সেই দৃষ্টিতে সাদা মানুষের উপর যে ভয়ঙ্কর ঘৃণা ফুটে উঠছিল আধো-অচেতন ঝাপসা চোখেও সেটা বুঝতে কষ্ট হল না বাতিস্তার; ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সে। এবার মাথার পিছন থেকে শিরস্ত্রাণে গোঁজা লম্বা ছুরির মতো এক টুকরো জাগুয়ারের হাড় খুলে আনল ওয়েসোলি। শুরু হল এক নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর্ব।

অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসকের মতোই পাকা হাত ওয়েসোলির। তফাত শুধু এই যে চিকিৎসকের ছুরি রোগীর ক্ষত নিরাময় করে আর ওয়েসোলির হাতের হাড়ের টুকরো বন্দির সারা দেহে সৃষ্টি করে চলেছিল একের পর এক গভীর ক্ষতচিহ্ন। তার মুখ ভাবলেশহীন, দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ। শুধু তার অভ্যস্ত হাত আর আঙুলগুলোর সামান্য নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণায় যখন বন্দির গলা থেকে ঠেলে বেরোচ্ছিল অমানুষিক চিৎকার, তখন তার দুটো ঠোঁটের ফাঁকে জেগে উঠছিল এক অদ্ভুত হাসি। নারী যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে বাতিস্তার ধারণা ছিল না। তবু ভাগ্য ভালো বলতে হবে, বেশিক্ষণ এই যন্ত্রণা তাকে

ভোগ করতে হয়নি, খানিক বাদেই সে জ্ঞান হারাল।

সর্দার ত্সুরা কিন্তু কথার খেলাপ করেনি। কয়েকদিন বাদে ব্রাঙ্কো নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দুজন রেড ইন্ডিয়ান জেলে একটা ছোট্ট ডিঙি ভেসে আসতে দেখে। সেই ডিঙি থেকে তারা অ্যালেজো বাতিস্তাকে উদ্ধার করে—সঙ্গে তার আটজন সঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড। বাতিস্তা তখনো বেঁচে, কিন্তু এর থেকে না বাঁচাই বোধহয় ছিল ভালো। ক'খানা চামড়ায় মোড়া হাড় ছাড়া তার শরীরে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। চোখের দৃষ্টি শূন্য। অনবরত প্রলাপ বকছে বিড়বিড় করে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল ঠিকই, কিন্তু তার সমস্ত জীবনশক্তি ততদিনে নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। বাতিস্তা বাঁচল না।

আমাজনের পাড়ে মোয়েরি গোরস্থানে একটা পাথরের ফলকের তলায় আজ চিরশান্তিতে ঘুমিয়ে আছে অ্যালেজো বাতিস্তা। তার পাশেই কবর দেওয়া হয়েছে তার আটজন সঙ্গীকে...না, ভুল বলা হল, আসলে আটজনের কাটা মুণ্ডুকে। তবে শুধু ওই আটটা মুণ্ডুই নয়, আশেপাশের কবরখানা খুঁজলে এইরকম আরও নরমুণ্ডের খোঁজ পাওয়া যাবে। যেমন মানাউ কবরখানায় এইভাবেই মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে জুয়ান বিয়েনভেনিডোস আর তার দুই সঙ্গীর ছিন্নমুণ্ড। এরা সবাই কাট্রিমানি উপজাতির শিকার। তবে লেফটেন্যান্ট বিয়েনভেনিডোসের কাহিনি শোনার আগে বোধকরি পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম আর ভয়ঙ্কর এই উপজাতিটি সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানা প্রয়োজন।

একদিকে কুরুপুরা পাহাড়ের শ্রেণি দাঁড়িয়ে আছে পাঁচিল তুলে, অন্যদিকে রিও কাট্রিমানি ছুটে চলেছে সীমানা বেঁধে দিয়ে, আর এই দুই নদী-পাহাড়ের মাঝে জলে-জঙ্গলে দুর্ভেদ্য এক লক্ষ আশি হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে একটি মাত্র রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি। কাট্রিমানি নদীর অববাহিকায় বহুদিন ধরে এদের বাস, তাই বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন কাট্রিমানি উপজাতি। এই নাম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায়ও অবশ্য নেই। গত চারশো বছর ধরে এই দুর্ধর্ষ উপজাতির একটা মানুষকেও ধরে সভ্যজগতে আনা যায়নি যে তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার কি আদব-কায়দার আন্দাজ পেয়ে নৃতাত্ত্বিকরা অন্য কোনো নাম ঠিক করতে পারেন। ওই অঞ্চলে পা দিয়ে আজ

পর্যন্ত ক'জন ভাগ্যবান মানুষ কাঁধের উপর মাথাটাকে আস্ত রেখে লোকালয়ে ফিরতে পেরেছে, তাদের বিবরণ খুবই ভাসা-ভাসা, অস্পষ্ট। আসলে কাট্রিমানিদের হাত থেকে মাথা বাঁচিয়ে পালাবার তাগিদে কেউ আর তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করার জন্য সময় ব্যয় করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেনি।

নিষিদ্ধ পৃথিবীর এই গোপন অন্তঃপুরে প্রথম যে সভ্য মানুষ পা দিয়েছিল বলে জানতে পারি, তার নাম ক্যাপ্টেন লোপো। পেরুর বাসিন্দা। সময়টা ছিল আজ থেকে চারশো বছরেরও আগে, ১৫৬০ সাল।

গোটা ইয়োরোপ আর আমেরিকা জুড়ে ভাগ্যান্বেষী মানুষের চোখে তখন এক স্বপ্ন। সে স্বপ্ন সোনার শহর 'এল ডোরাডোর'। দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম বনের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে সেই বিরাট সোনার ভাণ্ডার। যে স্বর্ণভাণ্ডারের মালিক হতে পারলে গোটা পেরুকেই কিনে নেওয়া যেতে পারে।

আশিজন সঙ্গী সমেত ক্যাপ্টেন লোপো সেই পথে যাত্রা শুরু করল। সঙ্গী না বলে বরং তাদের সৈন্যই বলা উচিত। এই সৈন্যদের তদারকের জন্য সে নিজে ছাড়া আরও দুটি মানুষ ছিল। এরা হল ফার্ণিনান্ড গুসমাও আর পেড্রো উরসুয়া।

আমাজনের অববাহিকায় পৌঁছে ফার্ণিনান্ড লক্ষ্য করল যে এই বিশাল সমতলভূমিটি একেবারেই বেওয়ারিশ। শুধুমাত্র কিছু রেড-ইন্ডিয়ান উপজাতি ছাড়া সভ্য মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। এই অববাহিকা জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন করতে সে হল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। পেরুর রাজপুত্র 'প্রথম ফার্ণিনান্ড' নামে সে নিজেকে ওই অঞ্চলের সম্রাট বলে প্রচার করতে শুরু করল।

কিন্তু ক্যাপ্টেন লোপো পাণ্ডববর্জিত এলাকায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার ছেলেমানুষি পরিকল্পনা নিয়ে এতদূর আসেনি। 'ভালো পাগলের পাল্লায় পড়া গেল'—মনে মনে ভাবল লোপো, কিন্তু পাগলামি নিয়ে সময় নষ্ট করতে সে রাজি হল না। খুব তাড়াতাড়ি সে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলল এবং এক রাত্তিরে যখন সবাই ঘুমোচ্ছিল তখন সে একইসঙ্গে 'রাজপুত্র' আর সঙ্গী পেড্রো উরসুয়াকে হত্যা করে ঝামেলা

চুকিয়ে দেয়। লোপো জানত, যে বেপরোয়া মানুষগুলোকে সাথী করে সে এ পথে পা বাড়িয়েছে তারা মনের ক্ষোভটুকু সামান্যতম সুযোগ পেলেই মিটিয়ে নিতে দ্বিধা করবে না। ফলে কোনোরকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো।

আমাজনের তীর ধরে এবার ঝটিকাবাহিনীর মতো এগিয়ে চলল ক্যাপ্টেন লোপো আর তার দলবল। বাধা যে এল না তা নয়, কিন্তু বর্বর রেড ইন্ডিয়ানদের সেই বর্শা আর তীরের বাধা তাদের বন্দুকের সামনে ঝড়ের মুখে কুটোর মতোই উড়ে যেতে লাগল। যাত্রাপথের চারদিকে অকৃপণ ভাবে পরিবেশিত হল মৃত্যু—জঙ্গলের বাতাস ভারী হয়ে উঠল রক্ত আর বারুদের গন্ধে।

সভ্য মানুষের এই লোভ আর চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা বোধহয় এতক্ষণে মহাবিচারককে রুষ্ট করেছিল। তাই ক্যাপ্টেন লোপো যখন তার দলবল নিয়ে কাট্রিমানিদের এলাকায় পা দিল তখন তাদের এত দিনের দেনা-পাওনা চুকোবার দিন এল।

পাওনা যে ভালোমতোই চুকেছিল তার প্রমাণ, লোপো যখন তার অভিযানে দাঁড়ি টেনে ভেনিজুয়েলায় সভ্যজগতের সংস্পর্শে আবার ফিরে আসে তখন তার সঙ্গে ছিল মোটে সাতজন সঙ্গী। কিন্তু লোকালয়ে এসেও সে নিস্তার পায়নি। এবার তার দায়িত্ব নিল দেশের আইন। ফার্ণিনান্ড আর পেড্রোকে খুন করার অপরাধে লোপোর মৃত্যুদণ্ড ধার্য করা হয়।

কিন্তু এ তো গেল লোপোর কথা। বাকি তিয়াত্তর জন সঙ্গীর কি হল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু কৌতূহল থেকে যায়। মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়ার আগে যে ক'দিন ক্যাপ্টেন লোপো নির্জন কারাকক্ষে কাটিয়েছিল, সেই সময়ে রাজার কাছে লেখা এক চিঠিতেই সেই বিবরণ জানিয়ে দিয়ে যায় সে।

মান্যবরেষু,

আপনাকে আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, কাট্রিমানি নদীর পাড়ে যে উপজাতিটি বাস করে, তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে আপনার গোটা সেনাবাহিনীও যথেষ্ট কিনা সন্দেহ। প্রমাণ হিসাবে

আমার অভিজ্ঞতাই ধরুন।

আমাজনের শাখা নদী পার হয়ে আমি যখন দলবল সমেত ওই অঞ্চলে পা দিলাম তখনই ওরা আমাকে বাধা দিতে এল। সংখ্যায় ওরা নেহাত কম ছিল না, কিন্তু এর আগে বহুবার এরকম অসম যুদ্ধে আমরা জিতেছি। ফলে কিছুক্ষণ অস্ত্র-বিনিময় হওয়ার পরই ওরা রণে ভঙ্গ দিয়ে যে যেদিকে পারল জঙ্গলের মধ্যে পালাল। আমার লোকজনও তৎক্ষণাৎ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওদের তাড়া করল। কিন্তু এটাই হল মারাত্মক ভুল, আমরা ওদের ফাঁদে পা দিলাম। তবে ভুল বুঝলেও তখন আর প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ নেই। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যেই আমাদের লোকেরা ওদের পিছনে তাড়া করে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল, অমনি চারদিক থেকে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাট্রিমানি যোদ্ধারা। সেই ঘন জঙ্গলে দিনের বেলা পাঁচ হাত দূরে চোখ চলে না, তারই সুযোগ নিয়ে ঝোপ-জঙ্গলের আড়াল থেকে আশপাশ, উপর-নীচ সব দিক দিয়ে আক্রমণ চালাল তারা। যে তিয়াত্তর জন ওদের পিছনে তাড়া করে গিয়েছিল তাদের একজনও ফিরল না। গতিক সুবিধের নয় বুঝে অবশিষ্ট যে সাতজনকে নিয়ে আমি নৌকো পাহারা দিচ্ছিলাম, তাদের সাথে নিয়ে কোনোক্রমে পালিয়ে এসেছি প্রাণ বাঁচিয়ে।

আমার মতে, যত রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি আমি জীবনে দেখেছি তারমধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্করই শুধু নয়, সবচেয়ে ধূর্ত উপজাতিও হল এই কাট্রিমানিরা। আর গণ্ডগোলটা সেখানেই।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
লোপো

চিঠির প্রয়োজনীয় অংশটুকুর বয়ান এইরকম। আর তারপর প্রায় দুশো বছর ধরে যে সব আমেরিকা, ব্রিটিশ, ডাচ, পর্তুগিজ এবং স্প্যানিয়ার্ড পর্যটকেরা আমাজন কি তার অসংখ্য শাখানদীর কোনো কোনোটা ধরে অভিযান চালিয়েছে, ক্যাপ্টেন লোপোর স্বীকারোক্তি

মাথায় রেখে তারা কেউই আর কাট্রিমানি উপজাতির ধারে-কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করেনি।

কিন্তু তবু কেউ কেউ চিন্তা করে। তাই ১৭৭২ সালে এক জেসুইট পাদ্রী অগাস্টিনোর কানে এই উপজাতিটির কথা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন যে এদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে সভ্য জগতের সংস্পর্শে নিয়ে আসবেন। পাদ্রী অগাস্টিনো শুধু সাহসীই ছিলেন না, ধর্মপ্রচারের কাজেও তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। মানাউ-এ পৌঁছবার পর স্থানীয় মানুষজন তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু অগাস্টিনো তাদের কথায় কর্ণপাত করেননি। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করে শয়তানকেও হিংসা থেকে বিরত করা যায়। ফলে মোয়েরিতে পৌঁছে তিনি স্থানীয় দুজন রেড ইন্ডিয়ান সঙ্গী জোগাড় করে নদী-পথ ধরে কাট্রিমানি এলাকার দিকে যাত্রা করেন।

একথা মনে রাখতে হবে যে, প্রথমে কোনো লোকই পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর বক্তৃতার জোরেই তিনি শেষে ওই দুটি লোক জোগাড় করে ফেলেন। এটা নেহাত কম কৃতিত্বের কথা নয়।

পুরোপুরি একমাসও কাটেনি, তার মধ্যেই ব্রাঙ্কো নদীর জলে ভেসে আসা আরেকটা 'কয়ূকা'-র মধ্যে পাওয়া যায় তিনটি ছিন্নমুণ্ড। তার মধ্যে একটি পাদ্রী অগাস্টিনোর, বাকি দুটো তাঁর দুই সঙ্গীর। সেগুলোকে তখন মুণ্ডু না বলে খুলি বলাই ভালো—জঙ্গলের বড় বড় ডেঁয়ো পিঁপড়ে মাংস আর চামড়ার কিছু অবশিষ্ট রাখেনি।

এবার সরকারি কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। যেহেতু কাট্রিমানিদের এলাকায় যারাই গেছে, তাদের ছিন্নমুণ্ড ছাড়া আর কোনো দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি, কর্তৃপক্ষের ধারণা হল যে এই উপজাতিরা নিশ্চয়ই নরখাদক এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত অভিযাত্রীদের ওই অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়। পরে অবশ্য জানা যায় যে, কাট্রিমানিরা নরখাদক নয়, কিন্তু তার জন্য সরকারি নোটিশের কোনো তারতম্য ঘটেনি। কারণ, ঘাড়ের উপর থেকে মাথাটা যদি নিতান্তই স্থানচ্যুত হয় তাহলে ধড়টা কবরখানায় যাবে না রান্নাঘরে ঢুকবে তাই নিয়ে বিবাদ করার সুযোগ কোথায়!

তারপর কেটে গেছে একশো বছরেরও বেশি সময়। এই বিরাট সময় ধরে কাট্রিমানি সম্পর্কে অভিযাত্রীদের মনে আতঙ্কও কমে এসেছে ধীরে ধীরে। অনেকেই ভুলে গেছে পাদ্রী অগাস্টিনোর কাহিনি কিংবা ক্যাপ্টেন লোপোর সৈন্যদলের পরিণতি। তার উপর শুরু হল 'রাবার বুম'।

কী এই 'রাবার বুম'?

উনিশ শতকের শেষাশেষি সময়ে অর্থাৎ আঠারোশো আশি সাল নাগাদ উত্তর আমেরিকা জুড়ে যেমন শুরু হয়েছিল 'গোল্ড রাশ'—রাশি রাশি সোনার খোঁজে অজস্র মানুষ ছুটেছিল পশ্চিমে নদীগুলোর পাড়ে, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু, ভেনিজুয়েলা, ব্রাজিল, ইকোয়েডরের মানুষ তখন আমাজনের অববাহিকা ধরে ছুটেছিল 'সেল্‌ভ্‌জ্‌'-এর গভীর অরণ্যে রবার গাছের সন্ধানে।

বাইরের পৃথিবীতে রবারের চাহিদা তখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 'রবার' গাছের গুঁড়ি ফুটো করে যে ঘন আঠা বেরোয় তার থেকেই তৈরি হয় রবার। ফলে ওই 'রাবার বুম'-এর সূত্র ধরেই আবার সাদা মানুষের দল পা দিল কাট্রিমানিদের গোপন অন্তঃপুরে। তবে এবার আর একজন-দুজন নয়, জনা পঞ্চাশ-ষাটের বড় বড় দলে তারা হানা দিতে লাগল রবার বনের খোঁজে। তার ফলে ফারাক হল একটাই—একজন দুজনের বদলে এবার গোটা দলটাই উধাও হতে শুরু করল। তাদের কাটা মুণ্ডুগুলোও আর ফিরে আসত না। বোধহয় অতটুকু ছোট নৌকায় অতগুলো মুণ্ডু ধরে না বলেই কাট্রিমানিরা সে পাট চুকিয়ে দিয়েছিল।

মানুষের পয়সার লোভ থাকতে পারে কিন্তু প্রাণের মায়া নিশ্চয়ই আরো বেশি। তাই নরমুণ্ড-শিকারিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে ক'দিনের মধ্যেই রবার-শিকারিরা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল।

কাট্রিমানিদের সঙ্গে পরের যোগাযোগের অধ্যায় শুরু হয় তারও প্রায় ষাট বছর বাদে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

মালয় থেকে রবারের চালান তখন বন্ধ; শুধু মালয়ই বা বলি কেন, গোটা দূর প্রাচ্যের কোনো অঞ্চল থেকেই আর রবার আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে এবার সরকারি উদ্যোগে চার-চারটে দেশ

মিলে তৈরি করা হল পঞ্চাশ হাজারের এক বাহিনী।

কিন্তু সংখ্যাটাই তো আর সব জায়গায় শেষ কথা নয়। সমতলভূমিতে অথবা ছোটখাটো চড়াই-উৎরাইয়ের পথে দশ হাজারের বিরুদ্ধে এক হাজারের লড়াই দেওয়া কঠিন কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু যেখানে দিনমানে পাঁচ ফুট দূরের মানুষ চেনা যায় না সেখানে হাজারও যা দশ হাজারও তাই। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, ওই পঞ্চাশ হাজারের যে অংশটাকে প্রথমে পরিস্থিতি দেখে শুনে আসবার জন্য পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা লোকও যখন ফিরে এল না তখনই সোজা কথাটা বোঝা গেল।

সরকারি কর্তৃপক্ষ এবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তাদের দোষ নেই, কারণ এক লক্ষ আশি হাজার বর্গমাইল জুড়ে কাট্রিমানিদের ওই বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য রবার গাছ। এদিকে রবারের বাজার-জোড়া চাহিদা, অথচ জোগান দেওয়ার উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত সবাই হাত গুটিয়ে নেওয়ার পর এগিয়ে এল একজন সামরিক বাহিনীর মানুষ—কর্নেল জুয়ান বিয়েনভেনিডোস। বেশি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয় বলে কর্নেলের বিশ্বাস ছিল। তাতে না হয় কোনো কাজের কাজ, মাঝখান থেকে একগাদা লোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কর্নেল ঠিক করল, মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে সে কাট্রিমানিদের এলাকায় হানা দেবে। না, রবারের খোঁজে নয়, তারা যাবে মানুষের খোঁজে। তক্কে তক্কে থেকে একটা কাট্রিমানিকে ধরে নিয়ে আসতে পারলেই কাজ হবে। তারপর ভাবে ভঙ্গিতে কথাবার্তা চালিয়ে তাদের চলাফেরা আদব কায়দার কিছুটা বুঝতে পারলেও অন্তত পরের অভিযানগুলো অনেক নিরাপদে করা যেতে পারে।

কর্নেলের পরিকল্পনায় ভুল ছিল না, সমস্যার আসল গিঁটটাকেও সে খুঁজে বার করেছিল—সত্যিই তো, যে শত্রুর সম্পর্কে কোনো তথ্যই জানা যায় না, তার সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করাও মুশকিল; কিন্তু একটা জায়গায় শুধু তার ফাঁক থেকে গেছিল। চারশো বছর আগে লেখা ক্যাপ্টেন লোপোর চিঠির শেষ দুটো লাইন বোধহয় তার মনে পড়েনি—'...যত রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি আমি জীবনে দেখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর আর ভয়ংকরই শুধু নয়, সবচেয়ে ধূর্ত উপজাতিও

হল এই কাট্রিমানিরা।’ মনে পড়লে হয়তো কর্নেল বিয়েনভেনিডোস আরো একটু সাবধান হত।

১৯৫৫ সালের গোড়ার দিকে তিনজন সঙ্গী নিয়ে কর্নেল যাত্রা করল কাট্রিমানিদের এলাকায়। ক’দিন নদীর বুকে নৌকা চালিয়ে শেষে কাট্রিমানি গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে পৌঁছে জঙ্গলের বুকে তাঁবু ফেলল তারা। সেখান থেকে পালা করে লোক পাঠিয়ে নজর রাখত গ্রামের উপর।

একদিন সকালবেলায় হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে তাঁবুতে ফিরল রবার্টো লিমন। সেদিন ছিল তার পাহারাদারী। সে এসে জানাল, আজ সকালেই গোটা গ্রামের পুরুষরা দল বেঁধে বেরিয়েছে জাগুয়ার শিকারে। থাকার মধ্যে রয়েছে জনাকয় বুড়োবুড়ী, মেয়ে আর বাচ্চারা, যদি কিছু করতে হয় তো এই সুযোগ।

সুযোগ তো বটেই! কর্নেল আর দেরি করল না। লিমনকে মালপত্র আর তাঁবুর পাহারায় রেখে দুই সঙ্গীসমেত সে গ্রামের পথে বেরোল। ‘ঘণ্টা দু-তিনেকের ব্যাপার তো হবেই, সুযোগ-সুবিধামতো একটা লোককে বন্দি করে আনা নেহাত সহজ কাজ নয়,’ এই ভেবেই লিমন তাঁবুর বাইরে একটা ক্যাম্পখাটের উপরে জাঁকিয়ে বসে বেশ আয়েশ করে চুরুটে আগুন ধরাল।

তবে দু-তিন ঘণ্টা নয়, আস্তে আস্তে গোটা দিনটাই যখন কেটে গেল, তখন লিমনের চিন্তাগুলো ক্রমে দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়েছে। পরের দিন রাতের বেলায় তাই বাধ্য হয়ে লিমন গাছের আড়াল দিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে কাট্রিমানি গ্রামের দিকে এগোল।

জঙ্গলের মধ্যে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা—মাঝখানে গ্রাম। জন্তু-জানোয়ারের উৎপাতের জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া, নইলে কাট্রিমানিদের শত্রু বলতে এই অঞ্চলে আর কোনো উপজাতি নেই।

গাছের আড়ালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতেই হঠাৎ লিমন দেখল গ্রামের প্রধান দরজাটা খুলে যাচ্ছে। তারপর তার চোখের সামনে কর্নেল আর তার দুই সঙ্গীকে পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল দশ-বারোজন নারী। না, একজনও পুরুষ কাট্রিমানি যোদ্ধা চোখে পড়ল না লিমনের। এবার শুরু হল এক

অমানুষিক অত্যাচারের পালা।

লিমন দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়, জীবনের অনেক নির্মম দিক সে দেখেছে, কিন্তু চোখের সামনে এই অত্যাচারের দৃশ্য তার বুকের রক্ত হিম করে দিল। শেষপর্যন্ত সর্দারণীর ইঙ্গিতে একে একে তিনজন বন্দিরই মুণ্ড ছিন্ন হল ধড় থেকে। লিমন তখনো জানত না যে ওই সর্দারণীই হল 'ওয়েসোলি'।

রবার্টো লিমন অবশ্য কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে; আর তারপর থেকে নদীর জলে ভেসে আসা কোনো কয়ূকা-র মধ্যে ছিন্নমুণ্ড পাওয়া গেলে তার আর দুঃখ হত না, বরং কিছুটা যেন আশ্বস্ত বোধ করত সে। কারণ, জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'কাট্রিমানিদের হাতে ধরা পড়ে তাদের অত্যাচার সহ্য করার চেয়ে মৃত্যু অনেক অনেক বেশি সুখের, আর যদি ওদের মেয়েদের হাতে বন্দি হও তাহলে তো কথাই নেই। সে অত্যাচার আমি দেখেছি, তাই আমি আশ্বস্ত হই, তুমি দেখলে তুমিও হতে।'